দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিক পত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ
গ্রন্থাঙ্ক ২১৮৬
সংখ্যা ঃ

ঊনবিংশ বর্ষ
দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮—১৩৩৯

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—

শ্রীমোক্ষদা চরণ চক্রবর্ত্তী, এম্‌. এ. বি,টি,
অধ্যাপক —আনন্দ মোহন কলেজ।
ময়মনসিংহ।

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

উনবিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ,—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮—১৩৩৯

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক—লেখসূচি

অতীত—বর্ত্তমান—ভবিষ্যৎ (গল্প)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ৭৬৭
অনামা কবি (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ২৫০
অনামি ও গোধূলি-লগ্ন (কবিতাদ্বয়)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীঅরুণরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১০৮
অভিশাপ (গাথা)—ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র শীল বি-কম ৭৩৩
অস্তাচল (উপন্যাস)—শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ, বি-এ ২২, ২২০, ৩২৫, ৪৮৯, ৬৬৬, ৮৩৯
অহল্যা ও দ্রৌপদী (পৌরাণিকী)—শ্রীবীরেশ্বর সেন ৯১৪
আগন্তুক (গল্প)—শ্রীবুদ্ধদেব বসু ১১৩
আধুনিক কাব্যলোক (সাহিত্য)—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী এম-এ ৫৮৯
আর এক দিক (গল্প)—শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় ২৬৬
আলো-আঁধারি (গল্প)—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০২
আশ্রয় (গল্প)—শ্রীঅশোকা ঘোষ ৫৮১
আহার-বিধি (স্বাস্থ্যতত্ত্ব)—কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় কবিশেখর, এম-এসসি ৯০৯
ইতিহাস (কবিতা)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ৭৯২
ইরাক (বিবরণ)—শ্রীভারতকুমার বসু ৯৬৪
কাব্যের ভূমিকা (গল্প)—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল ৪২১
গতিক (গল্প)—শ্রীবিমল মিত্র ১২৮
গলায় গলায় (কবিতা)—আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল ৫৮০
গল্প (গল্প)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ৯৯
গান (স্বরলিপি)—শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় বি-এ ৭৪৩
গীতার পরিচয় (দর্শন)—শ্রীবীরেশ্বর সেন ৬৫৭
গীতার মর্ম্মবাণী (দর্শন)—শ্রীঅনিলবরণ রায় ৩২১
গীতার মান্দ্রবর্ণিক (দর্শন)—অধ্যাপক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ ১
গোধূলি (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ৭১৮
চাঁদ্‌নি রাতের জুঁই (কবিতা)—শ্রীপ্যারীমোহন সেন গুপ্ত ৯৪০
চিরন্তনীর জয় (উপন্যাস)—কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ৪৩, ১৯৭, ৩৫৩০
চিরযাত্রী (কবিতা)—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত বি-এ ৬৮৮
ছায়ার মায়া (ছায়ালোক)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ১৩১,৩০৬,৪৫০, ৬২৬,৮১৬,৯৪১
জীর্ণ মন্দিরের কথা (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ ৪২৬
জীবন-সঙ্গিনী (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ ৪৪৩
জীব-বধূ (কবিতা)—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ১৮৫
জীবাত্মা কি দেহাতিরিক্ত পদার্থ ? (দর্শন)—শ্রীধনকৃষ্ণ দেব বিশ্বাস বি-এল ৯১১
জীবাত্মা (দর্শন)—শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল ৪৮১
জেলালুদ্দিন রুমি (জীবন-কথা)—শ্রীবিষ্ণুপদ রায় এম-এ, বি-এল ২৭২
জৈন শাস্ত্রে জড় ও জীব (ধর্ম্মকথা)—শ্রীপূরণচাঁদ সামসুখা ৯৩৮
জৈন সাধক চিদানন্দ (ধর্ম্মকথা)—শ্রীপূরণচাঁদ সামসুখা ৫২৭
ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (জীবন-কথা)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৯৯
তার পর (উপন্যাস)—ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল ৯, ১৬৮
"তোমারে বাসিয়া ভালো—" (কবিতা)—শ্রীরাধারাণী দেবী ৭৪২
ত্রিযামার দিগ্বিজয় (কবিতা)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ৬২
দামোদরের বিপত্তি (উপন্যাস)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ ৫১৫, ৭০৮, ৮৬১
দীনের দাবী (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ২৮
দ্বিতীয় সংস্করণ (গল্প)—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৭৩৪
ধনী ও দীন (কবিতা)—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সরস্বতী ৬৬৫
নক্ষত্রের বর্ণ-বৈচিত্র্য (বিজ্ঞান)—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এল ৯৪
নর ও নারীর মেধা কি সমান ? (বিজ্ঞান)—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দে ৩৯৯
নারী (গল্প)—শ্রীশিবপ্রসাদ মুস্তোফী বি-এ ৯৮১
নারী—পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দু সমাজে (সমাজ-তত্ত্ব)—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি-এ, এটর্ণী-এট-ল ৫৪
নূতন মনোবিদ্যা (মনোবিজ্ঞান)—ডক্টর শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র এম-এ, পিএইচ-ডি ৮৩৩
নৃত্য (স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান)—শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল-এম-এস ৬৪৩
নেপালের পথে (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রীশ্রীপতি ঘোষ বি-এ, বি-ই ৪৬২
পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে (জীবন-কথা)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৪৭০
পত্র (কবিতা)—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম-এ, বি-এল ডি-লিট (পেরিস) ৫১৪
পরলোকে প্রভাতকুমার ৮৩১
পারস্যে রবীন্দ্রনাথ ৯৮৩
পারের বাঁশী (কবিতা) শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় ৯৭৬
পুনরাগমন (গল্প)—শ্রীবুদ্ধদেব বসু ৩৮৫
পুরানো দপ্তর (গল্প)—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি-এল ৬১৩

পেশাওয়ার ও খাইবর পথ (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল ২১১
প্রভাতে (কবিতা)—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ৪৪৯
প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় (কাহিনী)—শ্রীহরিহর শেঠ
৮১, ২৭৯, ৪০৩, ৫৬৪, ৭৪৫, ৮৭৩
প্রাচীন মগধের ভাব-সমৃদ্ধি (ইতিহাস)—শ্রীঅমূল্যচরণ সেন এম-এ, বি-এল ৯৫
প্রাণের অর্ঘ্য (গল্প)—শ্রীকেশবনাথ রায় চৌধুরী ২৯৬
প্রিয়তমা (কবিতা)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৪২
ভারত-শিল্পে অতি-আধুনিকতার ভয় (আলোচনা)—শ্রীঅসিতকুমার হালদার ৯৭৯
ভারতবর্ষ (কবিতা)—শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় বি-এ ৪৭৩
ভারতীয় কুস্তি ও তাহার শিক্ষা (শরীর-চর্চ্চা)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ৬৫, ৫৩২, ৯১৭
ভারতে যাদব-বংশ (ইতিহাস)—অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ ৩৭১
ভারতের পঞ্চকন্যা (পৌরাণিকী)—রায় সাহেব শ্রীশ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য ৫৫৮
ভাস্কর (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ ১১২
মণিপুর রাজ্যে (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ ৫০৭
"মণির মোহে জীবন দহে…" (গল্প)—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ৫৯৫
মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ (জীবন-কথা)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৪০
মাঝুরিয়া (বিবরণ)—শ্রীভারতকুমার বসু ৬৯৭
মাধবী (কবিতা)—শ্রীগিরিজাকুমার বসু ৩৭০
মালবীয়-জয়ন্তী (জীবন-কথা)—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ ৬২৩
মুখের কথা (গল্প)—অধ্যাপক শ্রীসত্যরঞ্জন সেন এম-এ, বি-এল ৯৩০
মৌন প্রশস্তি (কবিতা)—শ্রীরাধারাণী দেবী ১৪৮
ম্যাডাগাস্কার (বিবরণ)—শ্রীভারতকুমার বসু ৪২৮
যথাস্থানে (?) (গল্প)—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ৯৭৪
যাত্রাপথ (কবিতা)—শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৯৮
যাযাবর (গল্প)—শ্রীধূর্জ্জটি অধিকারী ৯৫৮
যে জীবন দীন (গল্প)—শ্রীআশীষ গুপ্ত ৫৪০
রবীন্দ্র-জয়ন্তী (অভিভাষণ)—ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল ৩৩৪
রাইনল্যাণ্ডের একাংশ (ভ্রমণ)—ডাক্তার শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল ডি-এসসি, এম-বি, এম-আর-সি-পি ৭৯৩
রাজগৃহ ও নালন্দর ধ্বংস মাঝে (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ২৫১
রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর (জীবন-কথা)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৭৭৯
রাজেন্দ্র দত্ত (জীবন-কথা)—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ-এস-এস, এফ-আর-ই-এস ৯২৩
রাশিয়ায় নাট্যবিপ্লব (নাট্যকলা)—শ্রীশচীন ঘোষ এম-এ ২৭৭
রুদ্ধ স্রোত (গল্প)—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ ৪৪৫
রুস্তমজী কাওয়াসজী (জীবন-কথা)—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ৫৮৫, ৮৪৮
রেঙ্গুন (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রীসরলাদেবী চৌধুরাণী বি-এ ৬০৪
লিথুয়েনিয়া (বিবরণ)—শ্রীভারতকুমার বসু ১১৮
লোভী (গল্প)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ৬৪৯
বদ্‌লি মজুর (গল্প)—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৬৯
বনফুল (কবিতা)—শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ২৩৯
বন্ধুর দেশ (কবিতা)—জসীমউদ্দীন ৪২০
বহুরূপী (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৩২৪
বাংলা বানান (আলোচনা)—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ২৭১
বাংলা বানান (আলোচনা)—শ্রীবীরেশ্বর সেন ৫৫৭
বাংলা ভাষায় সংকেত-লিপি (ভাষা-বিজ্ঞান)—শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ৭২৭
বাংলা ভাষা (সাহিত্য)—শ্রীবীরেশ্বর সেন ৯০
বাঙ্গালা সাহিত্যে Romanticism (সাহিত্য)—এ, হাকিম এম-এ, বি-এল ১৬১
বাঙ্‌লা বানান (আলোচনা)—শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য বি-এ (U. S. A.) ৯১৪
বাঙ্‌লা বানান (আলোচনা)—শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কাব্যবিনোদ, বি-এ ৫৫৬
বেদুইন (কবিতা)—শ্রীপীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮৯
বে-মানান (গল্প)—শ্রীহাসিরাশি দেবী ৬১৮
বেলজিয়ম ও তাহার চিত্রসম্পদ (ভ্রমণ-কাহিনী)—ডাক্তার শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল ডি-এসসি, এম-আর-সি-পি ৩৪০
বৈষ্ণবকাব্যের রসধারা (সাহিত্য)—শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯৫
বোশেখ-বরণ (কবিতা)—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৭৬৬
বৌদ্ধ সাহিত্যে চৈত্য (ইতিহাস)—ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি ১৭
ব্রতচারী (গল্প)—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায় ৪৩৮
শক্তিশেল (গল্প)—যুবরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ৭৮২
শনি-কবচ (গল্প)—শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস এম-এ ৬৩৭
"শীতের শেষে" (কবিতা)—শ্রীরামেন্দু দত্ত ৫৮৪
শোক-সংবাদ ১৫০, ৪৬০, ৯৮৬
শ্রীগোপাল বসু মল্লিক (জীবন-কথা)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৬১৬
সংবাদ প্রভাকরে সেকালের কথা (ইতিহাস)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৫
সঙ্গীত (স্বরলিপি)—শ্রীঅসিতকুমার হালদার ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীরবীন্দ্র রায় ৩০৪
সঙ্গীত (স্বরলিপি)—শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় বি-এ ও শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক ৭৪৩
সতী (গল্প)—শ্রীরবীন্দ্রলাল রায় বি-এসসি ৮৯১
সনেট (কবিতা)—শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৩০৩
সর্পিল (গল্প)—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪০
সাঁঝের পল্লী (কবিতা)—শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৪৮৮
সাময়িকী ১৫৫, ৩১৩, ৪৭৪, ৬৫২, ৮২৭, ৯৯০
সায়াহ্নের অভিসার (কবিতা)—শ্রীরাধারাণী দেবী ৫৩১
সারনাথ—মূলগন্ধ-কুঠী বিহার (বিবরণ)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ১০৯
সাহিত্য সংবাদ ১৬০, ৩২০, ৪৮০, ৬৫৬, ৮৩২, ১০০০
সিংহভূমের তাম্রখনি (বিবরণ)—শ্রীপিণাকীলাল রায় ২৯
সুপ্তিভঙ্গে (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ৯৫৬
স্বপ্ন-রহস্য (বিজ্ঞান)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৩৯০, ৫৪৮, ৭১৯, ৮৯৯
স্বরলিপি—কাজী নজরুল ইসলাম ও শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য এম-এ ও শ্রীজগৎ ঘটক ৯৭৭
হরপ্রসাদ-স্মৃতি-তর্পণ (জীবন-কথা)—অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদশাস্ত্রী, এম-এ ১৮৬
হিন্দীভাষা ও কবি-সমাদর (সহিত্য) - শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী ৭২৯,

চিত্রসূচি

পৌষ—১৩৩৮

বৌদ্ধ চৈত্য ... ১৯
চৈত্য পূজা ... ২১
মৌভাণ্ডারের কারখানা ... ৩৩
মোষাবনির সাধারণ দৃশ্য ... ৩৪
মোষাবনির খনি ... ৩৫
শূন্যে তারের পথ ... ৩৬
মৌভাণ্ডারের কারখানা—সাধারণ দৃশ্য ৩৭
মৌভাণ্ডার কারখানার কলকব্জা ... ৩৮
মৌভাণ্ডার কারখানা · হয় ... ৩৯
"ওর" গালাইবার চিমনী ... ৪০
'ক-টাং' ... ৬৫
"খ-টাং" ... ৬৫
ধবি পট ১ম ... ৬৬
"উত্তার বা লোকান" ... ৬৬
ধবি পট ২য় ... ৬৬
"ঢাক" ... ৬৭
ঢাক "বাহাল্লী" ... ৬৭
"কুল্লা" ... ৬৮
"দো দস্তি ঢাক" ... ৬৮
বারাকপুর লাটভবন ... ৮১
হেষ্টিংসের ··· ধ্বংসাবশেষ ... ৮১
মেমোরিয়াল হল—বারাকপুর ... ৮২
লেডি ক্যানিংয়ের সমাধি ... ৮২
জন জোফানি ... ৮২
বেলভেডিয়ার ... ৮২
লাটভবনের সোপান-শ্রেণী ... ৮৩
লাট-ভবনের তোরণ ... ৮৩
ডেভিড ব্রাউন ... ৮৩
কাউন্সিল চেম্বার—লাট-ভবন ... ৮৩
সিংহাসন-কক্ষ—লাট-ভবন ... ৮৪
মারবেল দরবার-কক্ষ ... ৮৪
বেঙ্গল আর্ম্মির সৈনিক ... ৮৪
ড্রইং রুম—লাট-ভবন ... ৮৫
টিপুসুলতানের সিংহাসন—লাট-ভবন ৮৫
জয়-স্মৃতি (১ম চিত্র) ... ৮৫
হেষ্টিংস ···· প্রতিলিপি ... ৮৬
শতাধিক·····দৃশ্য ... ৮৬
ওয়ারেন ·· প্রবেশপত্র ... ৮৬
প্রাচীন কালের·· স্মৃতিস্তম্ভ ... ৮৬
জয়-স্মৃতি (২য় চিত্র) ... ৮৭
ব্যারাকপুরের সৈন্যাবাস ... ৮৭
প্রাচীন এস্‌প্ল্যানেডের এক অংশ ... ৮৭
সেনেট হাউস ... ৮৭
টালির····· সেতু ... ৮৮
কলিকাতা বন্দরের দৃশ্য—১৮৪৮ ... ৮৮
চার্লস সিলি ... ৮৮
এলিজা ফে ... ৮৮
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীমান্ অরুণরঞ্জন ১০৮
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ... ১০৮
মূলগন্ধকুঠি বিহার—সারনাথ ... ১০৯
মূলগন্ধকুঠি··· অস্থি ... ১০৯
মূলগন্ধকুঠি ····অস্থি ... ১১০
হিমালয়ের বৌদ্ধ বাদকদল ... ১১০
জৈন মন্দির—সারনাথ ... ১১১
ধামেক স্তূপ—সারনাথ ... ১১১
কৃষকের গৃহ ... ১১৮
ঘরের ভিতরে আগুনের ঘর ... ১১৮
কুমড়োর ক্ষেত ... ১১৯
"ইষ্টার"····· যাচ্ছেন ... ১১৯
ঘোড়া···হদ্ধে ... ১১৯
লিথুয়েনিয়ান্ তরুণী ... ১২০
ইহুদীর ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ... ১২০
কৃষক রমণী ... ১২১
অশ্বের বিশ্রাম ... ১২১
ইহুদীর দোকানে ... ১২২
সৈন্যদের 'ড্রিল' ... ১২২
লিথুয়েনিয়ান···জনতা ... ১২৩
দোকানদার ও ক্রেতা ... ১২৩
সমাধি-ক্ষেত্রে প্রার্থনা ... ১২৪
"এরোড্রোমের"·····করছেন ... ১২৪
গরীবের ঘরে চরকার পূজা ... ১২৫
লিথুয়েনিয়ার বীর সন্তান ... ১২৫
অনেকক্ষণ···বিশ্রাম ... ১২৬
জাতীয়···নারী ... ১২৬
গৃহহারাদের প্রান্তর-জীবন ... ১২৭
মালগাড়ী ... ১২৭
বিড়াল-তপস্বী ... ১৩১
জ্যাক ডেম্পসি ... ১৩১
এলিনোর গ্লিন্ ... ১৩২
জ্যাক্ ডেম্প্‌সি ... ১৩২
ফুটবল খেলোয়াড় 'ফ্লিন্' ... ১৩২
দি ক্যাবিনেট ক্যালিগারি ... ১৩৩
দি ক্যাবিনেট · ক্যালিগারি ... ১৩৩
দি ক্যাবিনেট···ক্যালিগারি ... ১৩৪
ব্যাট্‌ল্ শিপ—'পোটেমকিন্' ... ১৩৪
ব্যাট্‌ল্ শিপ—'পোটেমকিন্' ... ১৩৫
ব্যাট্‌ল্ শিপ—'পোটেমকিন্' ... ১৩৫
"অক্টোবর" ... ১৩৬
"অক্টোবর" ... ১৩৬
স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৫১

বহুবর্ণ চিত্র

১। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর। ২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। বুদ্ধের বৈরাগ্য ৪। সোণালি সুতা। ৫। বন্ধুর পথে।

মাঘ—১৩৩৮

স্বাধীন আফ্রীদী ... ২১৩
ইস্‌লামিয়া কলেজ ... ২১৪
খাইবর গিরিপথের প্রবেশদ্বার ... ২১৭
আলী মস্‌জিদ ... ২১৫
উটের ···· করছে ... ২১৫
আফ্রীদী গ্রাম ... ২১৬
শাগাহ তাঁবু ... ২১৬
খাইবর রজ্জুপথ ... ২১৭
লাণ্ডিকোটাল ... ২১৭
লাণ্ডিখানা ... ২১৮
শেষ সীমানা ... ২১৯
রাজগির ···· রত্নগিরি ... ২৫২
রাজগির····· দৃশ্য ... ২৫২
রাজগৃহ—ব্রহ্মকুণ্ড স্নান ... ২৫৪
সপ্তর্ষিকুণ্ড ... ২৫৪
দুইটা ধারা ... ২৫৫
ব্রহ্মকুণ্ড—ভিতর দৃশ্য ... ২৫৫
বৈভারের ·· স্থান ... ২৫৬
বৈভারগিরি-শিখর-পথে ... ২৫৭
বৈভার গিরি.....মন্দির ... ২৫৭
বৈভার.....মূর্ত্তি ... ২৫৮
রাজগৃহ ···অংশ ... ২৫৮
রাজগৃহ—সোনভাণ্ডার ... ২৫৯
নালন্দ—খনন স্থানের নক্সা ... ২৬০
নালন্দ ·····দৃশ্য ... ২৬১
নালন্দ··· সাধারণ দৃশ্য ... ২৬২
নালন্দ ·····গৃহাবলি ... ২৬৩
নানা ···· ধ্বংসাবশেষ ... ২৬৩
রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ... ২৮১
স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে-টি ২৮১
প্যারীচরণ সরকার ... ২৮২
বিশ্বনাথ মতিলাল ... ২৮২
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ... ২৮৩
রামতনু লাহিড়ী ... ২৮৩
রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৪
রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় ... ২৮৪
হরকুমার ঠাকুর ... ২৮৫
মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা ... ২৮৫
তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ... ২৮৬
ডাক্তার জগদ্বন্ধু বসু ... ২৮৬
রমানাথ ঘোষ ... ২৮৭
রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ... ২৮৭
রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ... ২৮৮
জয়গোবিন্দ লাহা ... ২৮৮
মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ২৮৯
মহারাজা ·· প্রাসাদ ... ২৯০
দরবার কক্ষ—প্রাসাদ ... ২৯১

এমারেল্ড বাওয়ার ... ২৯১
শ্যামাচরণ লাহা ... ২৯২
প্যারীচাঁদ মিত্র ... ২৯২
কিশোরীচাঁদ মিত্র ... ২৯৩
স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ... ২৯৪
জাল প্রতাপচাঁদ ... ২৯৫
মানানসই সজ্জা ... ৩০৬
বে-মানান সজ্জা ... ৩০৬
"জ্ঞানদেবী" ... ৩০৭
"জ্ঞানদেবী" ... ৩০৭
'কাল ও দীপশিখা' ... ৩০৮
'কাল ও দীপশিখা' ... ৩০৮
গতির অনুকূল···নক্সা ... ৩০৯
নক্সায় তোলা···চিত্র ... ৩০৯
আপেল খাওয়া ... ৩১০
বন ভোজন ... ৩১০
আরাম ও উদ্বেগ ... ৩১১
কোণা-কোণি···সমাবেশ ... ৩১২
কোণা-কোণি···সমাবেশ ... ৩১২
৺যোগেশচন্দ্র সিংহ ... ৩২০

বহুবর্ণ চিত্র

১। ডঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (নিচোল)
২। ঝরাফুলের কাহিনী ৩। অর্চ্চনা
৪। ধাত্রী পান্না ৫। স্নেহের ডাক

ফাল্গুন—১৩৩৮

পার্লামেণ্ট হাউস ও তৎসম্মুখস্থ পার্ক ৩৪১
রাজপ্রাসাদ ... ৩৪২
ব্রাবো ... ৩৪৩
শেলড্‌ট নদী ... ৩৪৪
বোটানিকেল গার্ডেন ... ৩৪৫
হাইকোর্ট ... ৩৪৫
মরুভূমিতে আগয় ও ইসমাইল ... ৩৪৬
মেষপালের গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন ... ৩৪৬
গ্রাম্য পথ ... ৩৪৭
গ্রাম্য পথ ... ৩৪৭
জলে প্রতিবিম্ব ... ৩৪৮
মাতৃমূর্ত্তি ... ৩৪৮
প্রার্থনারতা বালিকা ... ৩৪৯
আর্ট গ্যালারি ... ৩৪৯
ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্ট ... ৩৫০
খেয়া ... ৩৫০
বিচারের দিন ... ৩৫১
লেডী গড্‌ডিফা ... ৩৫১
কৃষক পরিবার ... ৩৫২
"খাদ্য বিতরণ" ... ৩৫২
গোকুলের মানচিত্র ... ৩৭১
সুরাষ্ট্রের মানচিত্র ... ৩৭২
জুনাগড়ে উপর কোট দুর্গ ... ৩৭২
শিলালিপির টীলা ... ৩৭৩
উপর কোট · দৃশ্য ... ৩৭৩
রৈবতকের মানচিত্র ... ৩৭৪
জৈন মন্দির ... ৩৭৫
মূল দ্বারকার মানচিত্র ... ৩৭৬
আনন্দকৃষ্ণ বসু ... ৪০৪
ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪০৪
রাজা দিগম্বর মিত্র ... ৪০৫
অক্ষয়কুমার দত্ত ... ৪০৫
রাজেন্দ্র দত্ত ... ৪০৬
রায় পশুপতিনাথ বসু ... ৪০৬
রায় . ...বাটী ... ৪০৭
প্রাণনাথ দত্ত ... ৪০৭
ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ... ৪০৮
ইণ্ডিয়ান ·····সায়ান্স ... ৪০৮
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ... ৪০৯
কুমার কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ... ৪০৯
দেওয়ান রামকমল সেন ... ৪০৯
মতিলাল শীল ... ৪১০
রামগোপাল ঘোষ ... ৪১০
রমেশচন্দ্র দত্ত ... ৪১১
শিবচন্দ্র দেব ... ৪১১
রসময় দত্ত ... ৪১১
গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ... ৪১২
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ... ৪১২
সংস্কৃত কলেজের প্রাঙ্গণ চিত্র ... ৪১৩
রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর ... ৪১৩
কুঞ্জবিহারী মল্লিক ... ৪১৩
রাজনারায়ণ বসু ... ৪১৪
দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ ... ৪১৪
প্রমথনাথ দেব ... ৪১৫
নন্দলাল সিংহ ... ৪১৫
আশুতোষ দেব ... ৪১৫
কালীপ্রসন্ন সিংহ ... ৪১৬
রামদুলাল দেব ... ৪১৬
হাসিমুখ ... ৪১৭
ধানের ক্ষেতে মাটী কাট্‌ছে ... ৪১৭
নৃত্য—(১) ... ৪১৮
দড়ি · বাজাচ্ছে ... ৪১৮
টুপী তৈরী করছে ... ৪১৯
নৃত্য—(২) ... ৪১৯
ধীরে-রমণী ... ৪৩০
জননী ... ৪৩০
শাকালাম্ভা জাতীয় মেয়ে ... ৪৩১
দুই সখী ... ৪৩১
মাদুর বুনছে ... ৪৩২
শিকার ·····খুলছে ... ৪৩২
পাথরের ····· ক্ষেত্র ... ৪৩৩
কেশ-বিন্যাস ... ৪৩৩
ডুলি-বাহক ... ৪৩৪
মৃৎশিল্প ও শিল্পী ... ৪৩৪
ম্যাডাগাসি মেয়ে ... ৪৩৫
যুদ্ধ-প্রিয় পাহাড়ী লোক ... ৪৩৬
কেশবিন্যাসের ফ্যাসান ... ৪৩৭
তাঁত ... ৪৩৭
আলো-ছায়ার তারতম্য ... ৪৫০
যথাস্থানে আলো ... ৪৫১
নিরপেক্ষ আলো ... ৪৫২
'লাভ প্যারেডের' একটি দৃশ্য ... ৪৫৩
'ডাঃ ফ্যুমাকুর'একটি দৃশ্য ... ৪৫৩
পক্ষপাতি আলো ... ৪৫৪
'এ্যানা-ক্রিষ্টী'র একটি দৃশ্য ... ৪৫৪
রাত্রে তোলা বহির্দৃশ্য ... ৪৫৫
সিটি লাইটে'র একটি দৃশ্য ... ৪৫৫
'সান্‌রাইজে'র একটি দৃশ্য ... ৪৫৬
'কিং অফ্‌ জাজের' একটি দৃশ্য ... ৪৫৬
'লামাঙ্কের' একটি দৃশ্য ... ৪৫৭
'এ্যালিবি'র একটি দৃশ্য ... ৪৫৭
অনেকের মাঝখানে দু'জন ... ৪৫৮
'সানি ·····দৃশ্য ... ৪৫৮
কৃত্রিম·· তোলা ·· ... ৪৫৯
রাত্রে·····যন্ত্র ... ৪৫৯
৺যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র ... ৪৬১

বহুবর্ণ চিত্র

১। পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে
২। পার্থ সারথি ৩। তরুণের স্বপ্ন
৪। বেণী-বিনোদিনী ৫। ইদের চাঁদ

চৈত্র—১৩৩৮

ব্রহ্মপুত্র ... ৫০৭
মণিপুরী নাগা ... ৫০৭
ইম্ফালের বাজার ... ৫০৮
বিষ্ণুপুর ডাকবাংলা ... ৫০৮
ক্ষেতের কাজে মণিপুরী ... ৫০৮
ঢাকা ব্রিজ ... ৫০৯
রাজপ্রাসাদ ... ৫০৯
লোক্‌টাক্‌লেকের · দ্বীপাংশ ... ৫০৯
কোহিমা ... ৫১০
পাহাড়ের কোলে মণিপুর ... ৫১০
শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দির ... ৫১০
মাও.....আছে ... ৫১১
মণিপুরী স্ত্রীলোক ... ৫১১
কুকি বালিকাদ্বয় ... ৫১২
হ্রদের ···· হাট ... ৫১২
বগলুপ ১ম ... ৫৩২
বগলুপ ২য় ... ৫৩২
বগলুপ নিকাল ... ৫৩৩
কালা জাং—১ম ... ৫৩৩
কালা জাং—২য় ... ৫৩৩
"মুচ্ছীফোটা—১ম" ... ৫৩৪
"মুচ্ছীফোটা—২য়" ... ৫৩৪
"গিরা—১ম" ... ৫৩৪
"গিরা—২য়" ... ৫৩৫
"খাপা" ... ৫৩৫

"ছিপ্পি—১ম" ... ৫৩৫
"ছিপ্পি—২য়" ... ৫৩৬
"ঘিম্বা—১ম" ... ৫৩৬
"ঘিম্বা—২য়" ... ৫৩৬
"গাঁড়সা"—·····১ম ... ৫৩৭
"গাঁড়সা"·····২য় ... ৬৩৭
"দচ্চা" ... ৫৩৭
"ইন্দিরা" ... ৫৩৮
"চরকা—১ম" ... ৫৩৮
"চরকা—২য়" ... ৫৩৮
"শোয়ারী ১ম" ... ৫৩৮
"শোয়ারী—২য়" ... ৫৩৯
"হপ্তা" ... ৫৩৯
"পেটী" ... ৫৩৯
রাজা রামমোহন রায় ... ৫৬৪
ভোলানাথ চন্দ্র ... ৫৬৫
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর ... ৫৬৫
কেশবচন্দ্র সেন ... ৫৬৬
রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর ... ৫৬৭
দ্বারকানাথ ঠাকুর ... ৫৬৭
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৫৬৮
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (যৌবনে) ... ৫৬৮
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বার্দ্ধক্যে) ... ৫৬৯
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৫৬৯
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী ... ৫৭০
রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ... ৫৭০
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ... ৫৭১
জষ্টিস্‌ চন্দ্রমাধব ঘোষ ... ৫৭১
শিশিরকুমার ঘোষ ... ৫৭২
গণেশচন্দ্র চন্দ্র ... ৫৭২
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ... ৫৭৩
মহারাজা নন্দকুমারের কাশীমবাজারের বাটী ৫৭৩
সারদাচরণ মিত্র ... ৫৭৪
নীলকমল মুখোপাধ্যায় ... ৫৭৪
ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র ... ৫৭৫
প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫৭৫
প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৫৭৬
নলিনবিহারী সরকার ... ৫৭৬
পাগোডা ও উদ্যান ... ৬০৪
রায় ষ্ট্রীটের অপর দৃশ্য ... ৬০৫
রায় ষ্ট্রীট ... ৬০৫
সরকারী হ্রদ ... ৬০৬
বৌদ্ধ পুরোহিত ... ৬০৭
ব্রহ্মদেশীয়া মহিলা ... ৬০৭
কবরীর ফুলসাজ ... ৬০৭
ব্রহ্মদেশীয়া . ...করিতেছে ... ৬০৮
ব্রহ্মসুন্দরী ... ৬০৮
সুবেশা ব্রহ্ম মহিলা ... ৬০৯
বীণ-বাদক ... ৬০৯
রেঙ্গুনের হস্তী (২) ... ৬১০
রেঙ্গুনের হস্তী (১) ... ৬১১
কার্য্যনিরত হস্তী ... ৬১১
কার্য্যনিরত হস্তী ... ৫৩৫
জাহাজে হাতী-তোলা ... ৬১৩
পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ... ৬২৫
মুখে রং মাখা ... ৬২৭
চোখের পাতায় রং মাখা ... ৬২৭
ঠোঁটে রং মাখা ... ৬২৭
হাই লাইট্‌ মেক-আপ্‌ ... ৬২৭
লো-লাইট্‌ মেক্‌আপ্‌ ... ৬২৭
নাক (লো-লাইট্‌ মেক্‌ আপ্‌) ... ৬২৭
নাক (হাই লাইট্‌ মেক্‌ আপ্‌) ... ৬২৭
মোটা নাক সরু করা ... ৬২৭
আঁখি-পল্লব আঁকা ... ৬২৭
নকল আঁখি-পল্লব ... ৬২৭
স্বাভাবিক চোখের রূপসাজা ... ৬২৮
ছোট চোখ বড় করা ... ৬২৮
বুড়ো রসিকের চোখ ... ৬২৮
থুঁৎনি এবং নাক ... ৬২৮
থুঁৎনি এবং গাল ... ৬২৮
স্বাভাবিক ঠোঁট ... ৬২৮
বড়ো ঠোঁট ছোট করা ... ৬২৮
ফুর্ত্তিবাজের ঠোঁট ... ৬২৮
দুঃখীর ঠোঁট ... ৬২৮
যৌবনের জরায় রূপান্তর ... ৬২৮
ক্রেপ্‌ চুলের পাটখোলা ... ৬২৯
ক্রেপ চুল আঁচড়ে নেওয়া ... ৬২৯
ক্রেপ চুল ছাঁটা ... ৬২৯
স্পিরিট গাম্‌ দিয়ে · আঁটা ... ৬২৯
দাড়ি ছাঁটা ... ৬২৯
সুসম্পূর্ণ দাড়ি ... ৬২৯
স্পিরিট গাম্‌ দিয়ে গোঁফ আঁটা ... ৬৩০
দু'চার দিন ··অবস্থা ... ৬৩০
রাগী লোকের ভ্রূ ... ৬৩০
উদ্ধত অহঙ্কারীর ভ্রূ ... ৬৩০
তোবড়ানো কাণের সরঞ্জাম ... ৬৩০
নাকের রূপান্তর ... ৬৩০
থুঁৎনির রূপান্তর ... ৬৩০
ফোগ্‌লা দাঁত ... ৬৩০
সুন্দরের ভ্রূ ... ৬৩০
শয়তানের ভ্রূ ... ৬৩০
ডাকাতের ভ্রূ ... ৬৩০
লনচ্যানী ... ৬৩১
শ্রীমতী ফাজেন্দা ... ৬৩২
জ্যাক্‌ ডাফী ... ৬৩৩
বেন টার্পিন ... ৬৩৩
চেষ্টার কঙ্কলীন ... ৬৩৪
স্নাব পোলার্ড ... ৬৩৫
এ্যাল জন্‌সন্‌ ... ৬৩৬
স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মিত্র ... ৬৫৪

বহুবর্ণ চিত্র

১। শ্রীগোপাল বসু মল্লিক (নিচোল)
২। সতীর দেহত্যাগ ৩। যোধপুরের বাজার
৪। জুম্মা রাতে ৫। গোপনচারিণী

বৈশাখ—১৩৩৯

মাঞ্চুরিয়ান শ্রমিক ... ৬৯৭
সেতু ... ৬৯৭
পথ ... ৬৯৮
বাজারের পথ ... ৬৯৮
বাজার ... ৬৯৮
দৃশ্য দেখাবার যন্ত্র ... ৬৯৯
ভাল্লুক-খেলা ... ৬৯৯
বন্দরে মাল-বহন ... ৭০০
চীনা তরুণী ... ৭০০
ভিক্ষুক ... ৭০০
কৃষাণী জননী ... ৭০১
রসায়নাগারে ছাত্রদের শিক্ষা ... ৭০১
সাড়ম্বর পোষাক-পরিহিত চীনা ... ৭০১
পাশ্চাত্য প্রথায় চীনা ছাত্রীদের শিক্ষা ৭০২
কয়লা খনির রেলপথ ... ৭০২
চীনা বালক ... ৭০৩
লক্ষ্য-বেধ শিক্ষা ... ৭০৩
মাথার...আঁকছে ... ৭০৩
যান ... ৭০৪
বালক-ছাত্র ... ৭০৪
দোকানদার ... ৭০৫
ক্রীড়া ... ৭০৫
ঠাকু'মা ও নাতি ... ৭০৬
ধীবর-রমণী ... ৭০৬
গ্রাম্য তরুণী ... ৭০৭
রামকৃষ্ণ পরমহংস ... ৭৪৫
রাণী রাসমণির রৌপ্য-রথ ... ৭৪৬
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ... ৭৪৬
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ... ৭৪৭
রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক .. ৭৪৭
রাজা রাজেন্দ্র·····হাউস ... ৭৪৮
শিবনাথ শাস্ত্রী ... ৭৪৯
নবাব সিরাজদ্দৌলা ... ৭৪৯
ওয়াট্‌সের...মীরণ ... ৭৫০
নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুর ... ৭৫০
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ... ৭৫১
কৈলাসচন্দ্র বসু ... ৭৫১
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭৫১
বটকৃষ্ণ পাল ... ৭৫২
রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর ৭৫২
শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৭৫৩
শম্ভুনাথ পণ্ডিত ... ৭৫৩
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭৫৪
ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ ... ৭৫৪
কাশীপ্রসাদ ঘোষ ... ৭৫৫
স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭৫৬
গঙ্গাধর কবিরাজ ... ৭৫৬
তারানাথ তর্কবাচস্পতি ... ৭৫৭
মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব ... ৭৫৭
মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর .. ৭৫৮
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৭৫৯

মনোমোহন ঘোষ ... ৭৫৯
নরেন্দ্রনাথ সেন ... ৭৬০
তারকনাথ পালিত ... ৭৬০
রাইন নদীতীরস্থ কলোন ... ৭৯৩
রাইন নদীর .... সেতু ... ৭৯৪
কলোনের .... অভ্যন্তর ... ৭৯৫
রাইন নদীর .... সেতু ... ৭৯৬
বোন বিশ্ববিদ্যালয় ... ৭৯৭
গোড়স্বার্গ .... সপ্ত পর্ব্বত ... ৭৯৮
রাইন নদীর .....খেয়াঘাট ... ৭৯৯
রাইন নদী......দৃশ্য ... ৮০০
স্বরতরঙ্গের ছায়াছবি ... ৮১৭
অভিনয় মণ্ডপে (স্বর সঙ্কলনের যন্ত্রাদী) ৮১৭
স্বর বিবর্দ্ধক যন্ত্র ... ৮১৮
স্বর ধর যন্ত্র ... ৮১৮
সম্মিলিত শব্দ ও ছায়াধর যন্ত্র ... ৮১৯
ছায়া ও শব্দপট ... ৮১৯
ছায়াধর যন্ত্র কুঠি ... ৮২০
আমার মর্ম্মগীতি ... ৮২০
সামুদ্রিক ক্যামেরা ... ৮২১
ধাতুপট্টাবৃত কক্ষ ... ৮২১
তাপ দীপ ... ৮২২
বৈমানিক ক্যামেরা ... ৮২২
প্লাবন-দীপ ... ৮২৩
স্বর-সম্প্রসারক যন্ত্র দণ্ড ... ৮২৩
শব্দও চিত্রপট একত্র মুদ্রিত করিবার যন্ত্র ৮২৪
মুখর-চিত্রের অভিনয়-মণ্ডপ ... ৮২৪
মুখর দ্বিজ চিত্র ... ৮২৫
স্বর-চিত্র সম্পাদন যন্ত্র ... ৮২৫
শব্দ-সংরোধক ... ৮২৬
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৮৩১

বহুবর্ণ চিত্র

১রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর ২। দিনের শেষ। ৩ ।সূচী-শিল্প ৪। অন্তরীপ ৫। ক'নে বিদায়

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৯

রুস্তমজী কাওয়াসজী ... ৮৪৯
স্বামী বিবেকানন্দ ... ৮৭৩
ভগিনী নিবেদিতা ... ৮৭৩
কাপ্তেন রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার ... ৮৭৪
সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস ... ৮৭৪
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮৭৫
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ... ৮৭৫
নবকৃষ্ণ ঘোষ ... ৮৭৬
রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ... ৮৭৬
লালমোহন ঘোষ ... ৮৭৭
রাজকৃষ্ণ রায় ... ৮৭৭
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৮৭৮
সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী ... ৮৬৮
রজনীকান্ত গুপ্ত ... ৮৭৯
রাজা শ্রীনাথ রায় ... ৮৭৯
এ, আপ কার ... ৮৮০
জেনসেট্ জি ফ্রেমজি ম্যাডান্ ... ৮৮০
রস্তমজী ধান্জিভাই মেটা ... ৮৮১
হিরজিভাই মানক্জী রস্তমজী ... ৮৮২
রায় বদ্রীদাস বাহাদুর ... ৮৮৩
কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ... ৮৮৪
বিহারীলাল গুপ্ত ... ৮৮৫
শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ... ৮৮৬
জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বাটী ... ৮৮৭
রমাপ্রসাদ রায় ... ৮৮৭
গৌরীশঙ্কর দে ... ৮৮৮
ডায়াগ্রাম নং ১ ... ৯১৫
ডায়াগ্রাম নং ২ ... ৯১৬
ডায়াগ্রাম নং ৩ ... ৯১৬
"রুম" ১ম ... ৯১৭
"রুম" ২য় ... ৯১৭
"উখাড়" ... ৯১৮
"মতিচূর" ... ৯১৮
"ঘোর পালংয়ে টাং—১ম ... ৯১৯
"ঘুটনা"—১ম ... ৯১৯
"ঘোর পালংয়ে টাং—২য় ... ৯১৯
"ঘুটনা" — ২য় ... ৯২০
"ছটু পটু — ১ম" ... ৯২০
"ছটু পটু—২য়" ... ৯২০
"ধড়—১ম" ... ৯২১
"ধড়—২য়" ... ৯২১
"গাধালেট" ... ৯২২
লেপক ... ৯২২
উপচিত্র ... ৯৪১
বিরাট চিত্র ... ৯৪২
নাট্য-চিত্র ... ৯৪২
চখের ভাবা ... ৯৪৩
কথা-চিত্র' ... ৯৪৩
উপ-চিত্র ... ৯৪৪
কারু-চিত্র ... ৯৪৪
কাব্য-চিত্র ... ৯৪৫
ঐতিহাসিক চিত্র ... ৯৪৫
ধর্ম্মমূলক চিত্র ... ৯৪৬
ধর্ম্মমূলক চিত্র ... ৯৪৬
নাট্যচিত্র ... ৯৪৭
শিক্ষা-চিত্র ... ৯৪৭
শিক্ষা-চিত্র ... ৯৪৮
নিছক্ চিত্র ... ৯৪৮
অসীমের রূপ ! ... ৯৪৯
পিছলিয়ে বাড়ী যাওয়া ! ... ৯৫১
তুঙ্গ শৃঙ্গের চিত্র ... ৯৫১
বিরাট চিত্র ... ৯৫৬
আরব অভিজাত ... ৯৬৪
বাগ্দাদের জু-মহিলা ... ৯৬৫
স্বর্ণকারের দোকান ... ৯৬৫
তরুণী ... ৯৬৬
মুচির কাজ ... ৯৬৬
বাগ্দাদের পথ ... ৯৬৬
টাইগ্রিস......সেতু ... ৯৬৭
নোমাদ্ জাতীয় পরিবার ... ৯৬৮
কাঠের কাজ ... ৯৬৮
চুবড়ী নৌকা ... ৯৬৮
টিনের..... দোকান ... ৯৬৯
তাঁত ... ৯৬৯
কাফিখানার···সেবন ... ৯৭০
ইতিহাস···তীর্থযাত্রী ... ৯৭০
পথের···কাজ ... ৯৭১
খেজুর···করছে ... ৯৭১
সত্ত তৈরী·· যাচ্ছে ... ৯৭২
মৃৎ-শিল্প ... ৯৭২
হাওয়ায়·· যাচ্ছে ... ৯৭৩
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৯৮৫
স্বর্গত মহিমানাথ ভট্টাচার্য্য ... ৯৮৬
স্বর্গীয় বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৯৮৭
স্বর্গীয় অধ্যাপক পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় ৯৮৮
স্বর্গীয় রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৯৮৯
শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় (মেয়র) ... ৯৯০
শ্রীযুক্ত এস, এম, ইয়াকুব(ডেপুটী মেয়র) ৯৯১
শ্রীমতী পুষ্পরাণী ঘোষ ... ৯৯৩
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সান্যাল ... ৯৯৩

বহুবর্ণ চিত্র

১। রাজেন্দ্র দত্ত (নিচোল) ২। অতীত ও বর্ত্তমান ৩। ভিক্ষুক ৪। চাষার বাড়ী ৫। উর্ব্বশী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

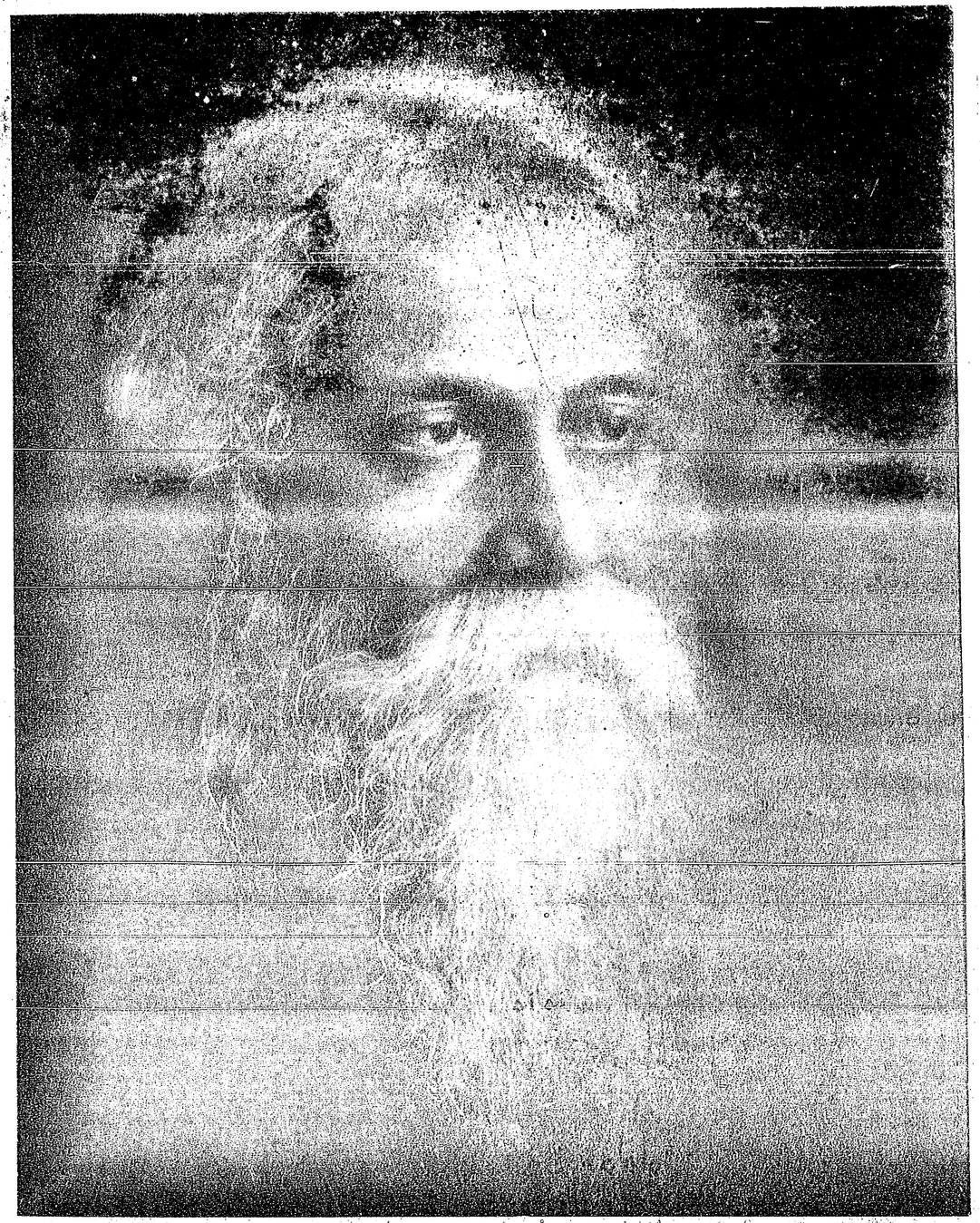

কলিকাতা-মিউনিসিপাল গেজেটের সৌজন্যে

Bharatvarsha Printing Works.

শ্রীমোক্ষদা চরণ চক্রবর্ত্তী, এম্.এ. বি,টি,
অধ্যাপক—আনন্দ মোহন কলেজ।
ময়মনসিংহ।

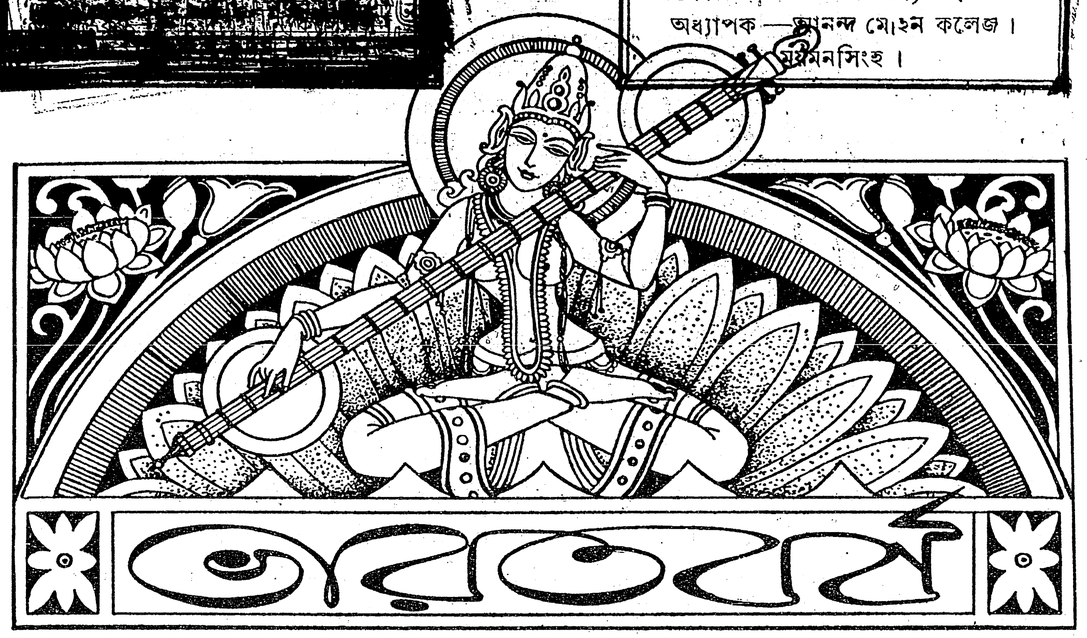

ভারতবর্ষ

পৌষ—১৩৩৮

দ্বিতীয় খণ্ড } ঊনবিংশ বর্ষ { প্রথম সংখ্যা

গীতার মান্ত্রবর্ণিক

অধ্যাপক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ

কর্ম্মযোগ

মান্ত্রবর্ণিক, অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগ শিক্ষা দিতেছেন। কুরুক্ষেত্র হইতে অর্জ্জুন পিছাইয়া আসিতে চান, কি মুস্কিল! তাঁহার মনে ভাবান্তর আসিয়াছে—স্বজনবধে সিংহাসনের কি প্রয়োজন, এমন সাধে বাজ পড়ুক—কায নাই রাজত্বে, রাজ্যে,—বনের পথ ঢের ভাল! বাসুদেব আত্মবিস্মৃত অর্জ্জুনকে কর্ম্মক্ষেত্রে ধরিয়া রাখিতে চান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য শুনাইয়া দেন। অমৃত ভাষণ শুনিয়া অর্জ্জুনের মনে ঔষধ ধরিয়া আসিয়াছে। আরও শুনিতে চান, আরও স্পষ্ট করিয়া কথাগুলিকে ধরিতে চান। যে কথা বলা হইয়াছে তাহার পুনরুক্তি চান। বাসুদেব অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রের গণ্ডীতে গাণ্ডীব করে, কর্ম্মময় পুরুষ রূপে, দেখিতে চান। তাই ২য় অধ্যায়ে, ৪০ হইতে ৫৩ পর্য্যন্ত শ্লোকে কর্ম্মযোগ শুনাইয়াছেন। ৫৩ হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞভাষণ শুনাইয়াছেন,—কর্ম্মযোগীর পক্ষেই একমাত্র স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া সম্ভব। তাই ইহাকে কর্ম্মযোগের শেষে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' গোছের পরিসমাপক করিয়াছেন। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানযোগেরই একরূপ নামান্তর। জ্ঞানের মাত্রা এতটা চড়িয়া উঠিল যে কর্ম্মযোগ চাপা পড়ার উপক্রম হইল। অর্জ্জুনের কাণে কর্ম্মের ক্ষীণ মূর্চ্ছনা বাজিতেছে; আর এ-দিকে শ্রীকৃষ্ণ 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ'

শুনাইতেছেন। অর্জ্জুনের নিকট যেন কেমন বিরোধ-বিরোধ ঠেকিতে লাগিল—কর্ম্মের আসন যেন অনেক নীচু হইয়া গেল, জ্ঞান যেন অনেক উঁচু হইয়া উঠিল। তবে কোন্ পথে যাই? এই দ্বিধার মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের উদ্ভব।

'হে জনার্দ্দন, হে কেশব—যদি কর্ম্ম হইতে বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হয় তবে কর্ম্মে কি প্রয়োজন? কখনও কর্ম্মের কখনও জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছ, মিছামিছি কেন মিশ্র বাক্-চাতুর্য্যে আমার মনকে দিশাহারা করিতেছ? কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ সেইটি বল। ১, ২।

এমনি করিয়া অর্জ্জুন, জ্ঞান ও কর্ম্মের সন্ধিস্থলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এদিকে ওদিকে উদ্বেগাকুল মন ফিরাইতেছেন;—প্রশ্ন উঠিতেছে কোন্‌টি ভাল? শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তরে কর্ম্মযোগের পাঠ সুরু করিলেন। পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছি যে, গীতার ঐতিহাসিক ভিত্তি স্বধর্ম্ম,—স্বধর্ম্মের কাঠামই কর্ম্মযোগ। কুরুক্ষেত্রে রণবিমুখ অর্জ্জুনকে দাঁড় করাইতে কর্ম্মযোগের দীপক রাগের যত প্রয়োজন, এমন আর কিছুরই নহে। তাই কর্ম্মযোগাধ্যায়টি গীতার একরূপ প্রাথমিক সোপান।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে কহিলেন,—'হে অর্জ্জুন, দুই প্রকার যোগ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; সাংখ্যমতে জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মিদের মতে কর্ম্মযোগ। ৩।

প্রারম্ভ শ্লোকোক্ত 'বুদ্ধি' ও 'কর্ম্ম' শব্দের ব্যাপকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। 'বুদ্ধি' শব্দের উল্লেখ ২য় অধ্যায়ে এইরূপ—'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধি' (৩৯)। ইহার সহিত বর্ত্তমান শ্লোক 'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্' মিশাইলে, বুদ্ধি অর্থে যে জ্ঞানযোগ বুঝিতে হইবে, তৎসম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কি গভীর সম্বন্ধ বিদ্যমান তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে 'বুদ্ধি' শব্দের ব্যাখ্যায় দেওয়া হইয়াছে। বুদ্ধি যখন আত্মসমাহিত তখন ইহা জ্ঞানযোগ; যখন সেই আত্মস্থ বুদ্ধি কর্ম্মে অভি-নিবিষ্ট তখন ইহা কর্ম্মযোগে দাঁড়ায়। যে-কর্ম্মের পশ্চাতে স্বানুমোদিত বুদ্ধির চালনা নাই, সে কর্ম্ম ফলযুক্ত, যোগযুক্ত নহে। সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠান সহজ নহে, গুরুতর। স্ববিৎ না হইলে কর্ম্মে অধিকারী হওয়া যায় না; স্ববিৎ না হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য পালনেও কোন উপকার দর্শে না। অতএব সর্ব্বাদৌ স্ববিৎ হওয়া বিধেয়। তাই ২য় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগ সর্ব্বপ্রথম বিবৃত করিয়াছেন।

'হে অর্জ্জুন, কর্ম্মের একদা অনুষ্ঠান ছাড়িয়া দিলেই যে কর্ম্মাতীত হইবার সুবিধা হইবে এমন নয়, আর সন্ন্যাস লইলেই যে মোক্ষ সহজলভ্য হইবে এমনও নয়। ৪।

ইহার কারণস্বরূপ বলিতেছেন—

'কেহ কখনো কর্ম্মহীন হইয়া ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না, প্রকৃতিজ ত্রিগুণ সকলকেই অলক্ষ্যে থাকিয়া কর্ম্ম করাইবেই করাইবে। মানুষের কর্ম্ম না করিয়া উপায়ান্তর নাই। ৫।

ইহার অর্থ কি? গৃহী যেমন গৃহকে ভুলিয়া গৃহে বাস করিতে পারে না, অনুক্ষণ গৃহকে উঠিতে বসিতে শুইতে, এমন কি স্বপ্নেও এড়াইয়া চলিতে পারে না—গৃহের প্রভাব নিদ্রা ও জাগরণে মানিয়া চলে, তেমনি প্রকৃতি মানবের জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মগৃহ—প্রকৃতির্নাম পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-সংস্কারো বর্ত্তমান জন্মাদৌ অভিব্যক্তঃ (শঙ্কর)। ইহাকে এড়াইয়া চলা পূর্ব্ববৎ অসম্ভব। জলে সাঁতার কাটিতে কাটিতে জলকে অস্বীকার করা কি সম্ভব? এখন এই ৪র্থ শ্লোকটিকে একটু বিচার করা চলে। যে-ব্যক্তির মধ্যে কর্ম্মগৃহ মজুত রহিয়াছে তাহার পক্ষে 'নৈষ্কর্ম্ম্য' কিরূপে সম্ভব, আর এমতাবস্থায় সন্ন্যাসমাত্রই বা সিদ্ধি-লাভের কি ভরসা? 'জ্ঞানম্ উৎপদ্যতে, পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ,' 'পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ'—যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুণ্যপাপের সমষ্টিভূতা প্রকৃতি একেবারে না বিলোপ পাইয়াছে, ততক্ষণ জীব নির্ম্মল হইয়া নিরঞ্জনকে পায় না। সুতরাং কামাত্মক প্রকৃতি-রূপ কর্ম্মগৃহে বাস করিয়া জীব যখন নৈষ্কর্ম্ম্যব্রত অথবা সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়া 'বাহিরে কর্ম্মেন্দ্রিয়কে বাসনাসুখ হইতে বিরত রাখিয়া মনে মনে সেই সব ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখের অনুশীলন করে—সে নিতান্তই কপটাচারী ও ভণ্ড।' ৬।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—তবে কর্ম্ম করার কি বিধি থাকিতে পারে? কর্ম্মগৃহরূপা প্রকৃতির মধ্যে যখন বাস করিতেই হইবে, তখন 'বিধূয় নিরঞ্জনঃ' হইবার কি পন্থা থাকিতে পারে? তাই শ্রীকৃষ্ণ নিরঞ্জন হইবার জন্য কর্ম্মযোগ আদেশ করিতেছেন,—

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের আসক্তি নিরোধ করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়-

অর্থাৎ হস্তাদি করণ দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠাতা হইবে, তাহার কর্ত্তব্য-পদ্ধতি কর্ম্মযোগসংজ্ঞা লাভ করিবে। ৭।

কর্ম্মযোগের আসন হইল মনে—মন হইতে তন্মাত্রযুক্ত আসক্তি একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, মনের রাজা বুদ্ধি; সেই বুদ্ধি যখন মনের লাগাম ধরিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ হইতে ইহাকে টানিয়া লয়, তখনই ফলবিযুক্ত কর্ম্ম করা সম্ভব হয় এবং তদবস্থায় 'বুদ্ধিযুক্তো জাহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে' এমন যে কর্ম্মানুষ্ঠান, ইহাকেই কর্ম্মযোগ কহে। বুদ্ধি যখন স্ব-যুক্ত হয় তখনই জ্ঞানযোগ—কারণ 'জ্ঞ এবাত্মা'। সেই স্ব-যুক্ত বুদ্ধি যখন কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হয় তখনই ইহা কর্ম্মযোগ, কেন না সেই বুদ্ধিতে ইন্দ্রিয়াসক্তি থাকিতে পারে না। এতদনুযায়ী শ্লোক ২য় অধ্যায়ের কর্ম্মযোগাংশে আমরা পাইয়াছি—যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি ২।৪৮; 'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ' ২।৪৯—এইরূপে কর্ম্মযোগের প্রথম সূত্র পাওয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ তাই বলিতেছেন—ঈদৃশ বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম নিয়ত করিবে, নৈষ্কর্ম্ম্যের চেয়ে ইহা ঢের ঢের ভাল। যদি হাত পা করণাদি গুটাইয়া বসিয়া থাক তবে প্রাণ রক্ষাই ত দুষ্কর! ৮।

এই পর্য্যন্ত আমরা কর্ম্মযোগের প্রথম ছেদ পাইতেছি। দ্বিতীয় ছেদ ৯ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত। ১ হইতে ৮ পর্য্যন্ত প্রকৃতি-প্রভাবান্বিত কর্ম্মের অপরিহার্য্যতা আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ছেদে প্রাণের যজ্ঞরূপ ও অন্নের দেবভাব আলোচিত হইবে।

(২)

প্রাণের যজ্ঞরূপ

যজ্ঞ বাহিরের অনুষ্ঠান—অগ্নি ইহার প্রাণ, ইহাকে ঘেরিয়া ঋত্বিকমণ্ডলী হবন করেন। বহির্যজ্ঞটিকে অন্তর্লোকে লইয়া আসা অথচ হুবহু মিল রাখা যে-সে কার্য্য নহে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সেই অলক্ষিত বিষয়টিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছেন। প্রাণের যজ্ঞরূপ যাহার নয়নে সমুদ্ভাসিত হইবে, তাহার জীবনের সুর ফিরিয়া যাইবে, চেতনায় জীবনের সত্যমূর্ত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন,—

যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অপর কর্ম্ম স্বাথজ—তাহাতে জীবের কর্ম্মবন্ধনই ঘটে, কর্ম্মমোচন হয় না। সুতরাং হে অর্জ্জুন, ইন্দ্রিয়াসক্তি নিরোধ করিয়া যজ্ঞার্থ কর্ম্মে ব্রতী হও। ৯।

যজ্ঞার্থ শব্দটি 'অর্থেন চ,' সূত্রানুসারে যজ্ঞায় ইদম্ এইরূপ হইবে। এখন যজ্ঞ অর্থ কি? 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' ইতি শ্রুতি। যজ্ঞ বিষ্ণুরই নামান্তর; অভিধানেও যজ্ঞ নারায়ণের নাম—'যজ্ঞঃ স্যাদাত্মনি মখে নারায়ণ-হুতাশয়োঃ' ইতি হৈমঃ। সুতরাং এই যজ্ঞ 'স্ব'-এর সহিত অভিন্ন, দ্বিতীয় অধ্যায় একটু আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। স্ব-এর দিকে চাহিয়া কর্ম্ম করাই স্ব-ধর্ম্ম—ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ে দেখিয়াছি। এ ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ উহারই দ্বিরুক্তি করিতেছেন। যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করাই স্বানুমোদিত কর্ম্ম করা এবং উহাই কর্ম্মযোগ।

সেই স্ব-রূপ যজ্ঞাগ্নির স্ফুলিঙ্গকেই প্রাণরূপে প্রাণীতে অধিষ্ঠিত করিয়া প্রজাপতি আদেশ করিয়াছেন—'তোমরা ইহার অর্থাৎ প্রাণাগ্নি সাহায্যে উন্নতিশীল হও, ইহা তোমাদের সকল কামনা পূর্ণ করুক! ১০।

প্রাণ আত্মার একটি শিখা বিশেষ—ইহাই জীবন-যজ্ঞের হোমানল। আগুন নিভিলে যেমন যজ্ঞ থামিয়া যায়, প্রাণ নিভিলেও তেমনি জীবন-যজ্ঞ অঙ্গারে পরিণত হয়। সুতরাং এ উপমা অতি সুষ্ঠু। ছান্দোগ্য উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য ইহার পার্শ্বে বসাইতেছি, তাহা হইলে সূক্ষ্ম বিষয়টি সহজদৃষ্টিগ্রাহ্য হইতে পারে। ন চ প্রাণৈর্বিযুক্তস্য গতিরূপপদ্যতে, জীবত্বং বা। সর্ব্বগতত্বাৎ সদাত্মনো নিরবয়বত্বাৎ প্রাণসম্বন্ধমাত্রমেব হি অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ জীবত্ব-ভেদকারণমিতি, অতস্তদ্বিয়োগে জীবত্বং গতির্ব্বা ন শক্যা পরিকল্পয়িতুম্ শ্রুতয়শ্চেৎ প্রমাণম্। ৫। ১০। ১ প্রাণই জীব—কেন না যিনি প্রাণন্-প্রাণবান তিনিই জীবন্ জীবন্ত। যতক্ষণ জীবন্ ক্রিয়ায় বাধা না ঘটে ততক্ষণই জীব, যখন ইহা থামিয়া গেল তখনই নির্জ্জীব। এই প্রাণন্ ক্রিয়াটিকে ফোয়ারার ন্যায় খুলিয়া দেওয়ায় জীবের উৎপত্তি হইয়াছে—ইহা আত্মনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ। দেহে যুক্ত হওয়ায় ইহা যেমন দেহকে জীবন্ত করিয়াছে, তেমনি ইহা আত্মনরূপ মূল-অগ্নি হইতে পৃথক হইয়া জীবভেদ ঘটাইয়াছে। তাই জীব বলিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গকেই বুঝায়, কিন্তু অগ্নিকে নহে। আত্মন্ শাশ্বত অগ্নি, ইহা কাহাকেও আশ্রয় করিয়া থাকে না, কিন্তু প্রাণরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি শরীরাশ্রয়ী, সুতরাং

নিত্য চঞ্চল। যখনই শরীর-বিযুক্ত হইয়া গেল তখনই দৃশ্যতঃ ইহা যেন নিভিয়া গেল, আর জীব নির্জ্জীব হইয়া পড়িল।

দশম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ প্রাণকে যজ্ঞাগ্নিরূপে ধরিয়া লইয়া উহাতে হোম করিতে বলিতেছেন। এ যজ্ঞ অবশ্য অন্তর্যজ্ঞ। ইহার কি রূপ? বহির্যজ্ঞের অনুযায়ী অন্তর্যজ্ঞও হুবহু আকারপ্রকারভূষিত। যজ্ঞাগ্নিতে যে হবি আহুত হয়, তাহাকে যেমন সেই উদ্দিষ্ট দেবতার নিকট অগ্নি বহন করিয়া লইয়া যায়, কেন না 'বহ্নিমুখা বৈ দেবাঃ'—ঠিক তদ্রূপ প্রাণাগ্নিতেও যে অন্তর্যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার আহুতি স্বরূপী আত্মনের নিকটে যায়। বহির্যজ্ঞের হবি গব্য, প্রাণাগ্নির হবি ব্রাহ্ম। ঊর্দ্ধরেতস্সু চ শব্দে হি—বেদান্তদর্শন ৩।৪।১৭। তাই ইন্দ্রিয়-নিরোধ প্রয়োজন, নতুবা ব্রহ্মহবি ক্ষরিত হইয়া যাইবে।

এই প্রাণশক্তিতে প্রাণবন্ত হইয়া দেবতাদিগকে অর্চ্চনা কর, দেবতারাও তোমাদের অনুরাগী হউন—পরস্পরের প্রীতিবদ্ধ হইয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হও। ১১।

এইখানেই আমরা দ্বিতীয়াংশের অনুচ্ছেদ অন্নের দেবভাবে পৌঁছিতেছি। অন্নের কাহিনীর সহিত পঞ্চাগ্নিতত্ত্ব ওতপ্রোত সম্পৃক্ত। আশানুরূপ ভোগ আহুত দেবতারা তোমাকে দিবেন। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের দত্ত অন্ন যে উৎসর্গ না করিয়া খায় সে চোর। ১২।

দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ভোজন যে সাধুরা খান তাঁহারা সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, আর যাহারা শুধু নিজের পেটের উদ্দেশেই রন্ধন করে তাহারা পাপই যেন খায়। ১৩।

অন্নের এই দেবভাব কি জন্য বিহিত হইল তৎসম্পর্কে অন্নোৎপত্তি কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন—

অন্ন হইতে প্রাণী জন্মায়, মেঘ হইতে সেই অন্নের উৎপত্তি, মেঘ আসিতেছে যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম্মীর কর্ম্ম দ্বারা অনুষ্ঠিত, কর্ম্মের বিধান দিলেন বেদ, বেদ উদ্ভূত হইয়াছে অক্ষরপুরুষ হইতে। এইরূপে দেখা গেল সর্ব্বত্র স্থিতিশীল ব্রহ্মই যজ্ঞের জনক এবং পালক। ১৪, ১৫।

এইরূপ চক্র যে অনুসরণ না করে, ভোজনের দেবভাব বিস্মৃত হইয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহার আয়ু পাপপূর্ণ; ইন্দ্রিয়সেবার দাসানুদাস হইয়া তাহার জীবন সর্ব্বথা নিষ্ফল। ১৬।

ছান্দোগ্যে পঞ্চাগ্নি-তত্ত্ব-প্রসঙ্গে দেখা যায় যজমান 'অগ্নিহোত্র' নামক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রাতঃসন্ধ্যায় যে অগ্নি জ্বালেন উহাতেই হোম করেন। এই মর্ত্তলোকের অগ্নি স্বরূপ হইতেছে দ্যুলোকের আদিত্য—এ অগ্নিতে হবন হইলে, ইহার বিস্তৃতি দ্যুলোকের অগ্নিতে পৌঁছে। অগ্নিহোত্রের আহুতি হইতে ক্রমে বৃষ্টিপতনে মাটি সিক্ত হইয়া শস্যের উদ্গম ঘটায়; সেই অন্ন প্রাণাগ্নিতে আহুতি দিলে তবে জীবনরক্ষা হয়।

গীতায় এই তত্ত্বটিকে কিরূপ নিপুণতার সহিত ফোটান হইয়াছে, দশম শ্লোকেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যের অগ্নিহোত্র নামধেয় বহির্যজ্ঞটিকে গীতায় প্রথমেই অন্তর্যজ্ঞরূপে দেওয়া হইয়াছে। আমরা ইহার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। জীবনই হইতেছে যজ্ঞ, প্রাণ যজ্ঞানল। সেই প্রাণাগ্নির হবি হইতেছে অন্ন। মন্ত্রপূত হবি যেমন যজ্ঞে আহুত হয়, প্রাণাগ্নিকেও তেমনি মন্ত্রোৎসৃষ্ট অন্ন আহুতি দিতে হয়। আহুতিকালে যে যে দেবতা ইহার অনুগ্রাহক, তাঁহাদের উদ্দেশে প্রথমে অন্নকে নিবেদিত করিতে হয়। সেইজন্য অন্নারম্ভকালে ভূঃপতয়ে স্বঃপতয়েভুবঃ পতয়ে এইরূপে পঞ্চাগ্নির তিন অগ্নিকে নিবেদন করিতে হয়। তাঁহাদের কৃপায় যখন অন্নলাভ ঘটে, তখন তাঁহাদিগকে অস্বীকার করিয়া উদরম্ভরি হওয়া যে কতবড় অকৃতজ্ঞতা তাহা ত সহজেই অনুমেয়। সর্ব্বশেষ সেই অন্ন নিবেদন করিতে হয় প্রাণাগ্নিকে, যথা, প্রাণায় স্বাহা অপানায় স্বাহা ইত্যাদি। প্রাণাগ্নিতে সমর্পিত অন্ন দেহাভ্যন্তরে অক্ষরপুরুষে সর্ব্বশেষে আহুত হয়—কারণ প্রাণ হইল তাঁহারই শিখা স্বরূপ। সেই যজ্ঞরূপী অক্ষর-পুরুষে যখন আহুতি ঠেকিল, তখন যিনি এ সকল অনুগ্রাহকেরও জনক তাঁহাকে নিবেদন করিয়া অন্নাহুতি সার্থক হইল। এইরূপে নিবেদিত অন্নভোজন যেন দেবতার প্রসাদ খাওয়া।

এহেন সুপ্রতিষ্ঠিত অন্নচক্রের ক্রম যাহার জীবনে অস্বীকৃত হইয়া আছে তাহার বৃথাই জীবন। প্রাণাগ্নিতে অন্নের হবন ক্রিয়া দেখানই এখানে উদ্দেশ্য। ছান্দোগ্যের পঞ্চাগ্নিতে ইহার ফল দর্শান অভিপ্রেত—অন্নাহুতির ফলে রেতঃসঞ্চয় ঘটে। ছান্দোগ্যে ইহাকে যোষায় আহুতি দিয়া সৃষ্টি-চক্র গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কর্ম্মযোগী এই রেতোরূপ

হবিকে প্রাণাগ্নিতে হবন করিবেন; তবেই প্রকৃতির ক্রমিক তিরোধানে অক্ষরপুরুষ তাঁহার পক্ষে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবেন। নৈষ্কর্ম্ম্য বা সন্ন্যাসে যে প্রকৃতিবশ্যতা দূর করা সম্ভবপর হয় না, সেই প্রকৃতির প্রভাব এড়াইবার এই একমাত্র পন্থা।

(৩)

কর্ম্মযোগী শ্রীকৃষ্ণ

সম্প্রতি আমরা তৃতীয় ছেদে পৌঁছিতেছি। ইহার বিস্তৃতি ১৭ হইতে ২৬ পর্য্যন্ত, বিষয় কর্ম্মযোগশিক্ষায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও স্বধর্ম্ম পালন। পূর্ব্বোক্ত বিভাগ হইতে ইহা সহজ।

'হে অর্জ্জুন, যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট, তাঁহার করণীয় কিছুই নাই। ১৭।

'এ হেন যোগযুক্তের কৃত কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যসঞ্চয়ও হয় না, কোন কর্ম্ম করিতে না পারায় পাপও স্পর্শে না। এমন সিদ্ধ ব্যক্তির ইহকাল ও পরকালে আশ্রয়দাতার কোনই প্রয়োজন হয় না। ১৮।

'সেই জন্য হে অর্জ্জুন, ইন্দ্রিয়নিরোধ করিয়া কর্ম্মাচরণ কর। যাঁহার অভ্যাস এইরূপ তাঁহার পরমার্থ লাভ ঘটিয়া থাকে। ১৯।

'জনকাদি পুণ্যশ্লোক রাজর্ষিরা কর্ম্মবলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অতএব সকলকে স্বধর্ম্মে অবহিত রাখিবার জন্যও তোমার কর্ম্ম করা উচিত। ২০।

শ্রেষ্ঠজন যে যে ভাবে চলেন, অন্যান্য লোকেরাও তাঁহাকেই অনুসরণ করে, তাঁহার নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যই অপরের অনুকরণীয়। ২১।

'হে পার্থ, এই ত্রিলোকে আমার করণীয় কিছুই নাই, কেন না—না-পাওয়ার বালাই আমার থাকিবার নয়। ২২॥

'পূর্ণ বলিয়া যদি আমি কর্ম্মপথ ত্যাগ করি, তবে মানুষ আমার দেখাদেখি অলস হইয়া উঠিবে। ২৩।

'আমি কর্ম্মপথ ত্যাগ করিলে লোক সকল স্বধর্ম্মবিহীন হইয়া উৎসন্ন হইয়া যাইবে। স্বধর্ম্মত্যাগহেতু সমাজে বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হইবে এবং এই বিপ্লবের জন্য আমি দায়ী হইব। ২৪।

স্বধর্ম্মপালনে অর্জ্জুনকে নিয়োগ করিতে অভিলাষী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এমনিভাবে নিজকে স্বধর্ম্মপালনশীল কর্ম্মযোগী রূপে ফুটাইতেছেন, যাহাতে অর্জ্জুনের মনে স্বতঃই লজ্জার উদয় হয়। গীতার অধ্যায়গুলিতে নিরবচ্ছিন্ন দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্ববিচার নাই, ইহাদের ফাঁকে ফাঁকে গীতার ঐতিহাসিক ভিত্তি 'স্ব-ধর্ম্ম' বিষয়ক উদ্দীপনা আছে। কুরুক্ষেত্রের অভিমুখী হইয়া গীতা চলিতেছে, সুতরাং গীতা পাঠে কুরুক্ষেত্রকে ভুলিলে ত চলিবে না। এখানে 'বর্ণসঙ্কর' কথাটি অর্জ্জুনের ক্ষণিকবৈরাগ্যের মোহে ক্ষাত্রধর্ম্মবিস্মৃতি সম্পর্কে প্রযুক্ত; বর্ণসঙ্কর অর্থ বর্ণধর্ম্মবিভ্রাট—যাহার যে ধর্ম্ম, বর্ণগত নহে সে ধর্ম্মে আকৃষ্ট হওয়া। অর্জ্জুনের ধর্ম্ম বর্ণগত ক্ষাত্র, অথচ অর্জ্জুন ব্রাহ্মণ্য তপোধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতেছেন। এইরূপে সকলেই যদি স্ব স্ব বর্ণ-ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া পর বর্ণ-ধর্ম্ম আলিঙ্গন করে তবে বর্ণপ্রাণ সমাজ টিকিবে কেন? বর্ণগত ধর্ম্ম যেখানে উপেক্ষিত হয়, সেখানে বর্ণভেদ কি বর্ণসঙ্করে ঠেকিয়া নিজস্বরূপ হারাইবে না?

'আসক্তচিত্তে অজ্ঞানীরা যেমন কর্ম্মতৎপর হয়, অনাসক্তচিত্তে কর্ম্মযোগীরাও তেমনি স্বধর্ম্মবিষয়ে লোকশিক্ষা হেতু কর্ম্মপরায়ণ হয়েন। ২৫।

'আসক্তকর্ম্মীদের নিকট বুদ্ধিতত্ত্ববিচার নিষ্প্রয়োজন, কেন না তাহা গ্রহণযোগ্য হইবার নয়। কর্ম্মযোগী স্বয়ং যোগযুক্ত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে অজ্ঞানকে আকর্ষণ করিয়া ঐ পথে টানিয়া লইবেন। ২৬।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন যে তিনি কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা করিয়া নিষ্কামকর্ম্মে জনসাধারণকে টানিয়া আনিতে চাহেন না; পরন্তু এ ক্ষেত্রে স্বকর্ম্মবলে পরকে রাস্তা দেখানই সমীচীন মনে করেন।

কর্ম্মযোগ-শিক্ষার ধারা শেষ হইল, চতুর্থ ছেদ সুরু হইতেছে। ২৭ হইতে ৩৫ শ্লোক পর্য্যন্ত দার্শনিক তত্ত্ব—প্রকৃতির প্রভুত্বে পরতন্ত্র জীবও স্বরাট মান্ত্রবর্ণিক বাসুদেব।

কর্ম্মতত্ত্ব বড়ই কঠিন। কর্ম্মগৃহ প্রকৃতির প্রভাব এড়াইয়া কিরূপে ইহার পরিহার সম্ভব এবং নূতন কর্ম্মের উপচয়ও নিরস্ত হয় সেই প্রসঙ্গ তুলিতেছেন। ৫ম শ্লোকের প্রতিধ্বনি ইহাতে লাগিয়া আছে।

'প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারাই সকাম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়; অথচ জীব ত্রিগুণের কর্তৃত্ব না বুঝিয়া আপনাকেই কর্ত্তারূপে মনে করিয়া থাকে। ২৭।

সাংখ্যদর্শনের 'অহঙ্কারঃ কর্ত্তা পুরুষঃ' সূত্রটির ৬।৫৪ কি সুন্দর পুনরুক্তি পাওয়া যাইতেছে। ছান্দোগ্যের শঙ্করভাষ্যে উক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিজকে অগ্নি মনে করিয়া প্রভু সাজিয়া বসিল। জীবরূপী স্ফুলিঙ্গ আত্মাভিমানে এত ফুলিয়া উঠিল যে অগ্নিরূপী আত্মন্ ইহার নিকটে ক্রমে অস্বীকৃত হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

'যে কর্ম্মগৃহ প্রকৃতির সগুণতত্ত্ব জানে, সে তাহার সত্তাকে প্রকৃতি ও ত্রিগুণের প্রভাব বিমুক্ত করিবার পন্থা জানে। ২৮।

ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া কর্ম্মযোগে প্রবেশ কিরূপে সম্ভব? যখনি বিষয়ের দিকে ইন্দ্রিয়ের লিপ্সা তপ্ত হইতে থাকে তখনি সে মনকে পরখ করিয়া জানে ইহার কতখানি তাহার 'স্ব' হইতে আসিতেছে। পরখ করিবার যন্ত্র বুদ্ধি। বুদ্ধি তাহাকে বলিয়া দিবে—'ওগো তোমার জীবন-যজ্ঞের প্রাণাগ্নিশিখায় এ লিপ্সাকে পুড়াইয়া ফেল,—ইহা ইন্দ্রিয়াসক্তি।' এইরূপে ত্রিগুণের কাণমন্ত্রণা উপেক্ষিত হইলে যজ্ঞের হোমানল দীপ্ত হইয়া উঠে।

কিন্তু যাহাদের মন, অজ্ঞতাহেতু অত গভীরভাবে বুদ্ধির দীপশিখা জ্বলিয়া সজাগ থাকিতে পারে না, তাহারাই প্রকৃতির চাতুরীতে আত্মহারা হইয়া যায়—গুণ সম্মোহনে একেবারে জীবনযজ্ঞের অনলকে যেন ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। এ হেন জনকে প্রাজ্ঞ কখনো প্রাণাগ্নির স্বরূপ শুনাইবেন না। ২৯।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন যে কর্ম্মযোগের স্বরূপ পাঠ শুনিবার অধিকারী সকলে নয়—সকলের পক্ষে তাহা সম্ভবপরও নহে। অর্জ্জুন এ সম্বন্ধে উত্তম শিষ্য, তাই কহিতেছেন—

হে অর্জ্জুন, আমাকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তারূপে মূলে রাখিয়া তুমি স্বাধিকার বুদ্ধিতে আত্ম-প্রবুদ্ধ হইয়া স্ব-ধর্ম্ম পালনে ব্রতী হও—কামনা, মমতা ও অনুশোচনা যেন তোমার কর্ম্মযোগকে তিলমাত্রও দুর্ব্বল করিতে না পারে। ৩০।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ যে তৎসৎ অক্ষরের সহিত একাত্মক তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায় আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি ৬১ সংখ্যক শ্লোকে বাসুদেব 'মৎপর' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা দর্শনের অচিন পুরুষকে আপন সত্তায় বিলীন করিয়া দিতেছেন। এখানে বাসুদেবকে পুনরায় গীতার মান্ত্রবর্ণিকরূপে পাইতেছি।

মান্ত্রবর্ণিকস্বরে শ্রীকৃষ্ণ আরও কহিতেছেন—

হে অর্জ্জুন, আমার এই মতই যাহাদের জীবনের একমাত্র পথ, যাহারা শ্রদ্ধাবান এবং অসূয়াশূন্য—তাহারা নির্লেপ কর্ম্মযোগাশ্রয়ে সঞ্চিত কর্ম্মের উচ্ছেদ ঘটাইতে পারে। আর যাহারা নিজের নিকট অতি পণ্ডিত—আমার মতের পরিবর্ত্তে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া চলে তাহাদিগকে নিম্নতমপথযাত্রী বলিয়া জানিয়ো। ৩১, ৩২।

যাহারা শাস্ত্রপাঠে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছে, তেমন যে জ্ঞানবান তাহাদের পক্ষেও পাণ্ডিত্যবলে কর্ম্মযোগী হইয়া প্রকৃতির প্রভাব এড়ান যে সম্ভব তাহাও নয়। পূর্ব্বোক্ত সাধারণের ন্যায় তাহারাও মন্ত্রমুগ্ধবৎ প্রকৃতির গুপ্ত গুণ-সঙ্কেতে চালিত। যদিও কর্ম্মগৃহ প্রকৃতির পরিচয় সকলেই জানে এবং এটুকুও জানে যে ঐ প্রকৃতির পরতন্ত্রতায় পরিণামে সমূহ দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। ৩৩।

এই শ্লোকে ৫ম শ্লোকেরই ভাবার্থ পুনরুক্ত হইয়াছে। কর্ম্মসমস্যায় প্রকৃতির প্রভাব অপরিলক্ষিত হইলেও ইহার গোপন ইঙ্গিতেই জীবজগতে কর্ম্মপ্রবাহ চলিতেছে। সুতরাং কর্ম্মযোগের একমাত্র দুর্লঙ্ঘ্য বাধাই প্রকৃতি। ইহা যে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মেরই পরিণাম তাহা পূর্ব্বে শঙ্করবাক্যে আলোচিত হইয়াছে।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের উপর প্রকৃতির অনুশাসন অলক্ষ্যে আসিয়া পড়িতেছে—ইহার পরশ লাগিয়া নেত্র নয়নাভিরাম, শ্রোত্র শ্রবণমনোহর বিষয়ের জন্য উন্মুখ হইতেছে; আর যখনি ইহাদের পাওয়ার অসুবিধা ঘটিতেছে তখনি দ্বেষ-বিষ উদ্গার করিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে জাগ্রত হইতেছে। সুতরাং রাগ ও দ্বেষ, সুখ দুঃখ বিরচক প্রকৃতির দুই শর স্বরূপ। ইহাদের প্রভাবে কর্ম্মযোগী কখনই আত্মবিস্মৃত হইবেন না। শরবিদ্ধ হইলেও জীবনযজ্ঞের হোমানলে তৎক্ষণাৎ ইহাকে পুড়াইয়া ফেলিবেন। ইহার শক্তি মনের উপর ফলিতে থাকিলে হোমানল ধূঁয়াচ্ছন্ন হইয়া মলিন হইয়া যাইবে। ৩৪।

কর্ম্মযোগী এইরূপে রাগদ্বেষকে ঠেলিয়া ফেলিয়া স্বাভিনিবিষ্ট বুদ্ধিতে স্বধর্ম্মপালনে তৎপর হইবেন। তবেই কর্ম্মফলের বালাই থাকিবে না। এইরূপে যোগযুক্ত হইয়া

ক্ষত্রিয় যদি যুদ্ধক্ষেত্রে অসিচালনা করে তবে তপোবনে তপোমগ্ন ব্রাহ্মণ হইতে ইহাকে নিকৃষ্ট বলা যাইতে পারে না। উভয়ই উভয়ের স্বধর্ম্মপালনে রত, ইহার ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় তাহার স্বধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণবর্ত্মে যুদ্ধকালে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিলে ইহা পাপাচার রূপে গণ্য হইবে। সুতরাং হে অর্জ্জুন, স্বধর্ম্মপালনে প্রত্যবায় নাই, ইহার উল্লঙ্ঘনে জীবন পাপভাক্ হইবে। ৩৫।

(৪)

প্রকৃতির স্বরূপবোধ

কর্ম্মযোগাধ্যায়ের শেষ ছেদে পৌঁছিতেছি। ৩৬ হইতে ৪৩ পর্য্যন্ত প্রকৃতির স্বরূপবোধ আলোচিত হইয়াছে। আমরা থাকিয়া থাকিয়া প্রকৃতির নাম ফাঁকে ফাঁকে পাইতেছি। দর্শনশাস্ত্রের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই, 'প্রকৃতি' যে তাঁহাদের পাঠে বাধা জন্মাইবে ইহা নিশ্চয়। প্রকৃতি দর্শনশাস্ত্রে এক গোলকধাঁধা বিশেষ, এক কথায় অত বড় জিনিসের ধারণা করা কঠিন। তবে সহজ ভাষায় এইটুকু বলা চলে যে, সংখ্যাহীন পূর্ব্ব জন্মের রাশিকৃত কর্ম্মের ফলগুলি, ল্যাম্পের চিম্‌নিতে ঠাণ্ডা ধূঁয়ার ন্যায় আমাদের হৃদয়াকাশে জমাট বাঁধিয়া আছে। সেই জন্য সূর্য্য হইতে অধিক উজ্জ্বল আত্মনকে চক্ষু মুদিলে দেখা যায় না। এই কর্ম্মজাল ঠেলিয়া আত্মনের দর্শন লাভ ঘটে না, যেমন মেঘজাল ঠেলিয়া সূর্য্যের দর্শন অনেক সময় সম্ভবপর হয় না। জন্মান্তরীণ এই কর্ম্মজালই প্রকৃতি। কর্ম্মের উৎপত্তিই কাম হইতে; তাই প্রকৃতির স্বরূপ কাম। অতীত অতীত জন্মের কর্ম্মফলগুলি ভিতরে জমাট থাকিয়া মানুষের চরিত্রে অনায়াসে কামের সাড়া জাগায়। আমরা জানি মানুষ অভ্যাসের দাস, অভ্যাসকে এড়ান সহজ নহে। অতীত জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মগুলি কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। যাহার মদ খাওয়া অভ্যাস হইয়াছে তাহার থাকিয়া থাকিয়া মদের পিপাসা হয়। ঠিক তেমনি ভোগ-বিলাসের যে-অভ্যাস মানুষ শত শত জন্মে উপার্জ্জন করিয়া আসিয়াছে, সেই অভ্যাসগুলি থাকিয়া থাকিয়া মদ্যপায়ীর ন্যায় নূতন জন্মেও দেখা দেয়। ইহাকেই বলে প্রকৃতির প্রভাব। আমরা চলিত কথায় বলিয়া থাকি, মদ খাওয়া তাহার স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে—সে কি ইহা ছাড়িতে পারে? এ জন্মের অভ্যাস যদি স্বভাবে পরিণত হইতে পারে, বহু-জন্মের সঞ্চিত অভ্যাস তবে 'প্রকৃতিতে' পরিণত হইতে কি বাধা থাকিতে পারে?

কর্ম্মযোগের বিস্তৃত পাঠ শুনিয়া অর্জ্জুনের মনে ইচ্ছা হইল প্রকৃতির শাসন সম্বন্ধে আরও পরিষ্কাররূপে শুনা। তাই প্রশ্ন করিলেন—

'হে বার্ষ্ণেয়, মানুষ যদি চ পাপাচরণে স্বয়ম অভিলাষী নহে, তবু কাহার পরতন্ত্র হইয়াই যেন পাপকৃৎ হয়, জীবের মধ্যে ঐ পাপ প্ররোচক কে বাস করিতেছে? ৩৬।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

'হে অর্জ্জুন, জীবনযজ্ঞকে পণ্ড করিয়া ব্যর্থতায় মানুষকে ভাসাইতেছে এমন যে মহাশত্রু তাহাকে কাম বলিয়াই জানিবে। ইহার ক্ষুধা চির-অতৃপ্ত, আকাঙ্ক্ষা অফুরন্ত। ইহাকে মহাপাপ বলিয়া জানিও। প্রকৃতির রজোগুণ হইতে এ বৃত্তিটি উদ্ভূত হইয়া মানুষের মনকে অলক্ষ্যে এমনি রাঙাইতে থাকে যে মানুষ ইহাকে আপন স্বভাব বলিয়া ভ্রমবশতঃ ধরিয়া লয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও উৎপন্ন হয়। ৩৭।

শ্রীকৃষ্ণ এমনিভাবে সহজ, সরল ভাষায় কর্ম্মযোগের প্রধান অন্তরায়কে চিনাইতেছেন। এত খোলাখুলি ভাবে আর কখনো বলেন নাই। সকলেই জানেন রিপু ছয়টি—ষড়রিপু। কিন্তু ইহারা ছয়ে এক—গোড়া সেই কাম,—একেরই ষড়ঙ্গ মাত্র।

আমরা জানি কামই সৃষ্টিবাহী;—কাম হইতে মানুষ জন্মে, মানুষে আবার ক্রোধ লোভ ইত্যাদি উপসর্গ বয়সের সঙ্গে জুটিতে থাকে—প্রত্যুত ইহারা কামেরই ভিন্ন ভিন্ন স্তর মাত্র,—কামের সহিত ইহাদের রক্তসম্বন্ধ আছে, যেন কামের পেটেই ইহাদের জন্ম। আচার্য্য শঙ্কর ক্রোধ সম্বন্ধে ভাষ্যে লিখিতেছেন—কাম এহি কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধত্বেন পরিণমতে।'

এখানে একটু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে 'মহাপাপ্মা' শব্দটি কামেরই বিশেষণ। কামের অভ্যুদয় রজোগুণ হইতে, গুণত্রয়ের অভ্যুদয় হইতেছে প্রকৃতি হইতে—'প্রকৃতিজৈ র্গুণৈঃ' (৩।৫) সুতরাং কামের উৎপত্তিস্থান প্রকৃতি। প্রকৃতিং কামকর্ম্মবীজভূতাং (শঙ্কর)। এইরূপে প্রমাণিত হয় প্রকৃতিই অনৃতবৃত্তির জনয়িত্রী হইয়া জীবের অন্তঃপুরে নিভৃতে বাস করিতেছে—সেই কর্ম্মগৃহে জীবের

মোহকরী মন্ত্রণাসভা অগণিত কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ 'মহাপাপ্মা' বিশেষণে ইহাকেই বিশেষিত করিয়াছেন। কর্ম্মযোগের প্রারম্ভ মাত্রই ইহার বিপক্ষতা প্রবল হইয়া উঠিবে। কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করিয়া আপন যোগ-মার্গে চলিতে হইবে।

কামের চাঞ্চল্য মনের উপর খেলিয়া যাইতেই এক রাশ ধূঁয়া উঠিয়া যেন জীবনের হোমানলকে মলিন করিয়া দেয়, স্বচ্ছ দর্পণকে যেন অস্বচ্ছ করিয়া ফেলে, উল্ব যেমন করিয়া গর্ভকে ঢাকিয়া রাখে, ইহাও তেমনি জীবের স্ব-রূপকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। ৩৮।

আবার ঐ কথাকেই জোর দিয়া কহিতেছেন—

ঐ কামরূপ চিরবুভুক্ষু নিত্যশত্রুর মধ্যবর্ত্তিতাহেতু জ্ঞানীর জ্ঞান আবৃত হইয়া আছে। ৩৯। 'জ্ঞ এবাত্মা' বেদান্তের এই সূত্র হইতে আত্মাই যে জ্ঞানগর্ভ ইহা বুঝা যায়। সেই জ্ঞানালোক আচ্ছন্ন করিয়া কামের গতিবিধি ঘটিয়া থাকে।

কেমন করিয়া কাম মানুষের সত্তার অলক্ষ্যে মিশিয়া যায় এবং স্ব-ভাবে পরিণত হয়, শ্রীকৃষ্ণ তৎসম্পর্কে ইঙ্গিত করিতেছেন—

'ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধিতে মৃদু পদবিক্ষেপে কাম অতি সঙ্গোপনে বিচরণ করে, মন ও বুদ্ধি যজ্ঞরূপী আত্মনের আলোকে সচেতন না থাকিলে ইহার একান্ত লঘুগতি টের পায় না এবং কিছুকালের মধ্যে ঔষধ ধরিয়া যায়। তখন মন কামায়মান হয়, বুদ্ধি কামসঙ্কল্পে ঘোলা হইয়া যায়। তখন যে-বুদ্ধি স্বাভিনিবিষ্ট থাকিয়া জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের ভিত্তিস্বরূপ ছিল তাহা কামাচ্ছাদনে ঢাকা পড়িয়া যায়। জীবের স্বরূপ ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। যজ্ঞের হোমানল নিভু নিভু করিতে থাকে। ৪০।

ইন্দ্রিয়গণের মহারাজ মন—মন যেদিকে হেলাইবে সেদিকে ইহারা নুইবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ মনকে সংযত করিয়া ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ বিধান করিয়াছেন। 'ইন্দ্রিয়রোধ করিয়া কামরূপ মহাপাপকে নিরস্ত করিবে যেন কোন ছিদ্রপথে কামের প্রবেশ না ঘটে। ৪১। 'ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে যেমন দ্বিধাবোধ করিবার নাই—ইন্দ্রিয়ের সেনানী রূপে মনকে গ্রহণ করিতেও কোন আপত্তির কারণ নাই। মনের স্বামী বুদ্ধি, বুদ্ধির ভর্ত্তা সেই স্ব-রূপী আত্মন্। ৪২।

৪২ শ্লোকে জীব বলিতে কতখানি বুঝায়—কত গভীরভাবে জীবনের উৎস লুকাইয়া আছে তাহার একটা অতি সংক্ষেপ আবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য কতকটা এখানে তুলিতেছি—

অথ য সর্ব্বহশ্যেভ্যো, বুদ্ধ্যন্তেভ্যো আভ্যন্তরঃ। যং দেহিন্ ইন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়েযুক্ত ক্যমো জ্ঞানাবরণ দ্বারেণ মোহয়তীত্যুক্তম্ বুদ্ধেঃ পরতস্ত স বুদ্ধের্দ্রষ্টা পরমাত্মা।

দৃশ্য শব্দের প্রয়োগ দ্বারা পাতঞ্জল যোগসূত্র মনে পড়িতেছে—········। যে ইন্দ্রিয়াবলীর মূলে বুদ্ধির স্থিতি তাহাদের হইতে আরও নিভৃত প্রদেশে আরও অভ্যন্তরে অক্ষর আত্মন্ বিরাজমান। কামকরণাদির বিকার সাধন করিয়া এক জ্ঞানাবরক মোহময় দ্বারের সৃষ্টি করে। যিনি এইরূপে জীব হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়েন—তিনি বুদ্ধিভৃৎ, তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা। আর সকলই দৃশ্য মাত্র।

মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত হইয়া জীব নিজেকে স্বয়ম্-সমাপ্ত জ্ঞানে দ্রষ্টা মনে করে—কিন্তু এ সকলি যে স্রষ্টা অক্ষর পুরুষের নিকট দৃশ্যরূপে প্রতিভাত তাহা জানে না। কাম যে কর্ম্মগৃহ প্রকৃতির মন্ত্রণাসভার একটি প্রতিনিধিমাত্র তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? কামের দ্বারা যে আচ্ছাদন রচনা পাইতেছি, উহা প্রত্যুত প্রকৃতির প্রতিই সবিশেষে প্রযোজ্য। কারণ অনাদিকাল ধরিয়া দৃশ্য দ্রষ্টাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেই হেতু পাতঞ্জল বাণী ইহার অত্যন্ত উচ্ছেদ আদেশ করিয়াছেন—দ্রষ্টাদৃশ্যয়ো সংযোগো হেয়হেতুঃ ২।১৭। যখন দৃশ্যের মিথ্যা কর্ত্তৃত্বাভিমান চুকিয়া গিয়া দ্রষ্টার কর্ত্তৃত্বে জীবনযজ্ঞের হোমানল জ্বলিবে তখনি কর্ম্মযোগের সূত্রপাত।

তাই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশেষ কহিতেছেন—বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ সেই দ্রষ্টা অক্ষরকে জানিয়া, বুদ্ধির সারথিপণায় মনকে প্রগ্রহের ন্যায় কামভাব হইতে সর্ব্বদা টানিয়া লইবে। ৪৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের রূপ যেমন 'স্ব-ধর্ম্ম' শব্দে অভিব্যক্ত, তৃতীয় অধ্যায়ের সারসংক্ষেপও তেমনি একটি শব্দে অন্তর্নিহিত—সেইটি সহযজ্ঞ। প্রাণের যজ্ঞরূপ কর্ম্মযোগীর জীবনে সদ্য জাগ্রত রাখা কর্ত্তব্য। প্রাণযজ্ঞের হোমানল যত জলজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, প্রকৃতির পরতন্ত্রতা বিমুক্ত হইয়া জীব তত স্বতন্ত্র হইবে।

তার পর

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(১৬)

সমস্ত রাস্তা মায়ার মগজ যেন টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। বাড়ীতে ফিরিয়া সে সুস্থির হইতে পারে না; চঞ্চল ভাবে, জোরে জোরে পা ফেলিয়া সে তার বারান্দায় পায়চারী করিতে লাগিল।

অভয়কে সে ডাকিয়া পাঠাইল। অভয় ল্যাবরেটারীতে ছিল,—চাকর আসিয়া খবর দিল তিনি এখন আসিতে পারিবেন না।

মায়া ভয়ানক চটিয়া উঠিল। চাকরের কাছেই বলিল, "আসতে পারবেন না কি? এ কি তামাসা? ব'লেছিলি ভয়ানক দরকার?"

"আজ্ঞে, ব'লেছিলাম, তিনি আমাকে হাঁকিয়ে দিলেন।"

ক্রুদ্ধ পদবিক্ষেপে মায়া হন হন করিয়া ল্যাবরেটারীতে নামিয়া গেল।

অভয় তখন একটা পরীক্ষা লইয়া ব্যস্ত ছিল। মায়া বলিল, "দেখ, তুমি যদি ও ছাই ফেলে আমার কথা এখন না শোন তবে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেবো তোমার সব যন্তর!"

অভয় তার দিকে না চাহিয়াই বলিল, "একটু—একটু সবুর!"

মায়া বলিল, "এদিকে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাচ্ছে—একটু সবুর! সবুর ক'রবো না আমি—এসো।"

অভয় বলিল, "চুপ—গোল ক'রো না।"

মায়া গর্জ্জিয়া বলিল, "বটে!" কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সে রাগে ফুলিতে লাগিল। তার পর সে অনুভব করিল, রাগ করা মিথ্যা—অভয়কে তার এই সাধনক্ষেত্রে সে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিবে না। সে দম্ দম করিয়া ল্যাবরেটারী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ একলা বসিয়া সে ভাবিল। তার পর নিরুপমকে ডাকিয়া পাঠাইল।

নিরুপম আসিলে মায়া বলিল, "ঠাকুরপো, তুমি কাপুরুষ!"

নিরুপম বলিল, "কিসে বউদিদি?"

"তুমি নিজেই না ব'লেছিলে যে তুমি যদি কাউকে ভালবাস তবে অন্যের খাতিরে তাকে ছেড়ে দেবে না। ছেড়ে দেওয়া ধর্ম্ম নয়—কাপুরুষতা। তুমি কিন্তু নিজে ঠিক তাই ক'রছো।"

নিরুপম কথাটার ঠিক তাৎপর্য্য বোধ করিতে পারিল না। সে দেখিল মায়ার মুখ চোখ ভয়ানক উত্তেজনায় ভরা—সে যেন আত্মস্থ নয়। তার সন্দেহ হইল মায়া বুঝি-বা—হাঁ, বুঝি-বা স্থির করিয়াছে যে নিরুপম মায়াকে মনে মনে ভালবাসে এবং সেই কথা উপলক্ষ করিয়াই এ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। তার বুকের ভিতরটা এ কল্পনায় ভয়ানক কাঁপিয়া উঠিল। সে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

মায়া তার পর বলিল, "তুমি যতই যা' বল, এ কথা অস্বীকার ক'রতে পারবে না যে সরমাকে তুমি ভালবাস।"

চট করিয়া খাড়া হইয়া নিরুপম বলিল, "না—ও-প্রসঙ্গ আর তুলো না বউদি।"

"কেন তুলবো না? তুমি যে তুলতে চাও না তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে তুমি তাকে ভালবাস—সে আর কাউকে ভালবাসে ভেবে তুমি সরে' দাঁড়িয়েছ। তুমি নিজেই তো ব'লেছ এ কাপুরুষের কাজ।"

"না বউদি, তা নয়, সে আমার ভালবাসার যোগ্য নয়।"

"কেন না, তোমার বিশ্বাস সে অজয়কে ভালবাসে। না' থেকে তুমি এই সিদ্ধান্ত ক'রেছ সেটা সম্পূর্ণ ভুল। আমি সে কথা খুব ভাল ক'রে অনুসন্ধান ক'রে দেখেছি। সরমা অজয়কে যে সেদিন ডেকেছিল, সে সম্পূর্ণ অন্য কাজে। আসল কথাটা এই যে সরমার দোষ নেই—কিন্তু ঐ অজয় যে আস্তে আস্তে অগ্রসর হ'য়ে তাকে ফুসলিয়ে বিয়ে ক'রবার চেষ্টা ক'রছে সে কথা সম্পূর্ণ ঠিক। এই যদি সত্যি কথা হয়, আর তুমি যদি সরমাকে সত্যি ভালবাস, তবে কি একদম সরে দাঁড়িয়ে তাকে এই অসাধু উদ্দেশ্য সফল ক'রবার সুযোগ দেওয়া তোমার উচিত? তোমার কি উচিত নয়, পুরুষের মত অগ্রসর হয়ে সরমাকে অজয়ের এই চক্রান্ত থেকে রক্ষা করা? তাকে অজয়ের কবল থেকে কেড়ে নেওয়া?"

নিরুপম বলিল, "কিন্তু তুমি কেন মনে ক'রছো যে তোমার দিদি এত উদাসীন?"

তার কথা কাড়িয়া লইয়া মায়া বলিল, "মনে ক'রছি আমি সব কথা জানি ব'লে। কিন্তু নাই যদি হয় তা'—যদি সেও ভালই বাসে ওই অপদার্থ অজয়কে, তবুও কি তোমার উচিত নয় তাকে তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া? তুমি না ব'লেছিলে একদিন, যাকে তুমি ভালবাসবে তাকে তুমি কেড়ে ছিঁড়ে নেবে, সে আর কাউকে ভালবাসে ব'লে পথ ছেড়ে দাঁড়াবে না?"

"কিন্তু তোমার কি ঠিক বিশ্বাস যে সেদিন—যে তোমার দিদি সত্যি সত্যি অজয়ের সঙ্গে—মানে তার কোনও গোলযোগ নেই?"

"পাগল! এ কথা তোমার নিছক কল্পনা। কিন্তু এ কথা আমি বিশ্বাস করি যে, তাকে যদি তুমি মাঝে পড়ে উদ্ধার না কর তবে অজয় তাকে একদিন ফাঁসাবে। সে সরমার মন অনেকটা নরম ক'রে ফেলেছে।"

নিরুপম কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, দেখি, তোমার দিদিকে রক্ষা ক'রতে পারি কি না?"

ভাবিতে ভাবিতে নিরুপম বাড়ী চলিয়া গেল।

অভয় যখন উপরে আসিল তখন মায়া ভয়ানক রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। মায়া যে রাগ করিয়াছে সে কথা অভয় প্রথমে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে তখন অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া মায়ার অভিমান ভাঙ্গাইল।

পরিশেষে মায়া বলিল, "এদিকে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত!"

"সে কি? কি হ'য়েছে?"

"সরি যে ম'রতে ব'সেছে!"

"অ্যাঁ, তাঁর অসুখ ক'রেছে না কি?"

"না, অসুখ করে নি—তার চেয়ে ঢের ভয়ানক।" বলিয়া সে সরমার সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছিল এবং যাহা অনুমান করিয়াছিল সব কথা খোলাসা করিয়া অভয়কে বলিয়া বলিল, "এখন উপায়? তুমি তো হাবার মত সেদিন তার কথা শুনে এসেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সেছ—তার পেটে পেটে যে কত বুদ্ধি তার তুমি বুঝবে কি?"

অভয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "এখন আর উপায় কি? এতদূর যখন গড়িয়েছে তখন তার অজয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়া ছাড়া তো অন্য কোনও উপায় দেখ্‌ছি নে।"

মায়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "পাগল হ'য়েছ? ঐ হতভাগা পাষণ্ডের সঙ্গে সরমার বিয়ে? শেষে যে গলায় দড়ি দিতে হবে।"

অভয় বলিল, "তুমি তাকে যা ভাবছ সে এখন তেমন নয়। সে একেবারে শুধরে গেছে। আমি তাকে—"

"শুধরে থাকতে পারে বিপদে প'ড়ে। তাও শুধরেছে কি অ্যাক্টিং ক'রছে ভগবান জানেন। আবার সুদিন এলে ও যে-কে সেই হবে।—তা' ছাড়া শোধরাক বা না শোধরাক—এই ক'লকাতা সহরে কে না জানে যে ও চোর—জোচ্চোর, বদমায়েস! ওর সঙ্গে যদি আমার বোনের বিয়ে হয় তবে সমাজে আমার মুখ দেখান দায় হবে।"

অভয় বলিল, "কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের হাত দেবার কি অধিকার আছে মায়া? দিদির বয়স হ'য়েছে, বুদ্ধিও আছে। তিনি যদি ভেবে-চিন্তে একজনকে ভালবেসে বয়ে

ক'রতে চান, তবে তোমার আমার তাতে কথা ব'লবার কি অধিকার আছে?"

"দুশো বার অধিকার আছে। যাও—তুমি ঐ কথা বিনিয়ে বিনিয়ে আমাকে বার বার শুনিও না।"

"কিন্তু এ তো আমার কথা বলছি না মায়া, তুমিও তো সেদিন নিরুপমকে এই কথা ব'লেছিলে।"

"বেশ ক'রেছিলাম, ব'লেছিলাম। আমি অতটা তখন বুঝতে পারি নি। কিন্তু এ হ'তেই পারে না। যে ক'রেই হোক ওদের তফাৎ ক'রতে হবে। নইলে আমার গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। লোকের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে?"

অভয় মায়ার এই তীব্র মন্তব্যের পর তাকে বুঝাইবার কোনও চেষ্টা করিল না। সে আপনার মনে চিন্তা করিতে লাগিল। মায়ার মত সে অজয়ের চরিত্র সম্বন্ধে অবিশ্বাসী নয়, কেন না, সে দেখিয়াছে অজয় আর সে অজয় নাই। তবু অজয়কে বিবাহ করা সরমার পক্ষে ভয়ানক অবিবেচনার কার্য্য হইবে বলিয়া তার মনে হইল। অজয় যে কোনও অংশেই সরমার যোগ্য নয় এ কথা সে ভুলিতে পারিল না।

কিন্তু, সেজন্য তাদের প্রেমে বাহির হইতে তাহারা বিঘ্ন উৎপাদন করিবে, এমন ইচ্ছা অভয়ের হইল না। বিশেষতঃ মায়ার কথা হইতে অভয় যাহা বুঝিয়াছিল, তাতে ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াইয়া গিয়াছে—সরমা গোপনে অজয়ের সঙ্গে সারা সকালটা কাটাইয়া আসিয়াছে। সে নিজ মুখে বলিয়াছে—সে মরিতে গিয়াছিল। ইহার কেবল এক অর্থ সম্ভব—সেই অর্থ মায়া করিয়াছিল,—অভয়ও তার সেই অর্থ করিল। এমন অবস্থায় তাদের বিবাহ করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

তাই অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অভয় স্থির করিল যে, সরমার সঙ্গে অজয়ের বিবাহে বাধা দিবার কল্পনা বাতুলতা। বরং এখন যত শীঘ্র বিবাহটা হইয়া যায় তাই মঙ্গল।

মায়া স্থির করিল ঠিক উল্টা। সে প্রতিজ্ঞা করিল, এ বিবাহ কিছুতেই হইতে পরিবে না। তাই সে নিরুপমকে মাঝখানে দাঁড় করাইবার জন্য তাকে উৎসাহিত করিল। তার পর সে মনে মনে ভাবিল অজয়কে সে শাসাইয়া বারণ করিবে। একবার তার খুব রাগের সময় মনে হইয়াছিল যে সে নিজে যাইয়া অজয়কে ধমকাইয়া শাসাইয়া আসিবে। কিন্তু একটু ঠাণ্ডাভাবে বিষয়টা চিন্তা করিয়া সে সঙ্কল্প সে পরিত্যাগ করিল। অজয়ের সঙ্গে সামনা-সামনি কথা কহিতে গেলে তাদের ভিতর অনেক কথা উঠিতে পারে, অজয় হয় তো অনেক কথা শুনাইতে পারে—সে সব কথা শুনিবার সাহস তার ছিল না; অজয়ের সামনাসামনি হইয়া তার সঙ্গে তর্ক করিতে সে সাহস করিল না।

তাই সে কৌশলে অভয়ের কাছে অজয়ের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া তার কাছে চিঠি লিখিল। মায়া লিখিল,

"অজয়বাবু, সরমার মুখে যাহা শুনিলাম তাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে আপনি তাঁকে ফাঁদে ফেলিয়া সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন। আমি বাঁচিয়া থাকিতে যে আপনি তাকে হস্তগত করিয়া তাকে শেষে বিবাহ করিয়া বসিবেন ইহা স্বপ্নেও মনে করিবেন না। আমি আপনাকে সাবধান করিতেছি—এখনও যদি আপনি তাকে ত্যাগ না করেন তবে বিপদে পড়িবেন।

"যদি আপনি নিজের মঙ্গল চান, অবিলম্বে আপনি সরমাকে বিবাহ করিবার আশা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। যদি না যান, যদি সরমার সঙ্গে আপনার আবার সাক্ষাৎ হইয়াছে শুনিতে পাই, তবে আপনাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য কিছুই করিতে কুণ্ঠিত হইব না। ইতি

মায়া।"

(১৭)

সরমা অনেকক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া শেষে আপনাকে শান্ত করিল।

এই কথাটা তাকে নিদারুণ আঘাত করিল যে উপযাচিকা হইয়া অজয়কে প্রেম নিবেদন করিতে গিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। যে কোনও মেয়ের পক্ষে এটা একটা নিদারুণ অপমান ও মর্ম্ম-পীড়ার কথা। সরমার বুকেও কথাটা শেলের মত গিয়া বিঁধিল।

অজয় তাকে কোনও অপমানজনক কথা বলে নাই সত্য, অত্যন্ত দীনতা স্বীকার করিয়া সে যথাসম্ভব ভদ্রভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এবং পাছে তার সেখানে যাওয়া লইয়া কোনও কথা উঠিয়া সে অপমানিত হয় সেজন্য

যত্ন করিয়া গোপনে তাকে বাহির করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। অপরিসীম ভদ্রতা ও যত্ন সে দেখাইয়াছে। তবু,—সে যদি ভালবাসিত সরমাকে, তবে কি সে পারিত প্রত্যাখ্যান করিতে? এই কথাটাই তাকে ভয়ানক পীড়া দিতে লাগিল যে সে তার সম্মান তুচ্ছ করিয়া অজয়কে প্রেম নিবেদন করিয়াছিল, অজয় তার সে প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই, এতখানি ভালবাসা তার অন্তরে একটা ভালবাসার তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারে নাই!

অনেকক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিল।

বসিয়া সে ভাবিল, এ পাঠ তার শেষ হইয়া গিয়াছে। অভয়কে সে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু হাতে পাইয়া তাকে সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছিল। তাতে দুঃখ হইয়াছিল, কিন্তু সে দুঃখের ভিতর এইটুকু তৃপ্তি তার ছিল যে সে স্বেচ্ছায় অভয়কে ছাড়িয়া দিয়াছে, মায়ার সুখের জন্য। ত্যাগের একটা আনন্দ সে পাইয়াছিল। তার পর তার হৃদয় হইতে অভয়ের ছাপ মুছিয়া দিয়া এই কয়দিনের মধ্যে অজয় তার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। উন্মত্ত হইয়া সে অজয়কে ভালবাসিয়াছিল—সে পাঠও তার মিটিয়া গেল। অজয় তাকে চায় না।

সে মনে করিল তার ভালবাসার উপর বিধাতার অভিশাপ আছে। ভালবাসিয়া, ভালবাসা পাইয়া যে তৃপ্তি সে সুখ ভগবান তার অদৃষ্টে লেখেন নাই। বৃথাই সে ভালবাসিতে গিয়া প্রাণের ভিতর দারুণ দাবানল জ্বালিয়া মরিতেছে। ইহার চেয়ে সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সেই তার ভাল। বিজ্ঞান চর্চ্চায় সে আত্মনিবেদন করিবে, পুরুষের কথা চিত্তে স্থান দিবে না। আজও সে নূতন করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা করিল, ভাঙ্গা প্রাণে, উৎসাহহীন অন্তরে।

একদিন সে বিজ্ঞানের চর্চ্চায় আত্মোৎসর্গের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, বিদ্যার উৎসাহে, জ্ঞানের আনন্দে। কি আনন্দ কি উৎসাহ ছিল তার সে প্রতিজ্ঞায়! কিন্তু তার আজকের প্রতিজ্ঞায় না ছিল আনন্দ, না ছিল উৎসাহ। প্রেমে হতাশ হইয়া, অন্য পথ নাই জানিয়া, সে বিজ্ঞানকে আজ আশ্রয় করিল—আনন্দে নয়, দুঃখে। সেদিনকার প্রতিজ্ঞায় আর আজকের প্রতিজ্ঞায় আকাশ পাতাল তফাৎ!

প্রথম যখন সে বিজ্ঞান-সেবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তখন সে গিয়াছিল উল্লসিত অন্তরে উৎসাহদীপ্ত পদক্ষেপে। আজ হৃদয় তার উদাস, তার পদক্ষেপ ক্লান্ত। সে আপনাকে টানিয়া তুলিল, টানিয়া আপনাকে লইয়া গেল তার পাঠ-গৃহে। সুধু কঠোর প্রতিজ্ঞার বলে হৃদয়ের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে মন বসাইল তার পাঠ্য গ্রন্থে।

কিছুক্ষণ পড়াশুনা করিয়া সে স্নানাহার করিয়া ল্যাবরেটারীতে যাইতে প্রস্তুত হইল।

আহারের সময় সুনীতি তাকে বলিলেন "তোর চেহারা এ কি হ'য়ে গেছে? অসুখ ক'রেছে না কি?"

সরমা বলিল, "না মা অসুখ করে নি; কই আমার তো কিচ্ছু মনে হ'চ্ছে না!"

"তবে অমনি এই চেহারা হ'য়েছে? নাই-বা হবে কেন? প'ড়ে প'ড়ে একেবারে শরীরখানাকে তো কালি ক'রলি। এত পড়ার কি দরকার তোর? তোর তো চাকরী ক'রে খেতে হবে না।"

সরমা হাসিয়া বলিল, "মাগো, লেখাপড়া লোকে সুধু চাকরী করবার জন্যই শেখে না। লেখাপড়া করাটাই একটা মস্ত বড় কাজ! এই পৃথিবীর এত রহস্য আছে, জানতে ইচ্ছা হয়, তাই পড়ি। প'ড়ে আশ মেটে না। মনে হয় আরও প'ড়ে বিশ্বের বুক চিরে তার সব রহস্য চট্ ক'রে জেনে ফেলি।"

"তা যাই হোক বাপু, তোর এত পড়া চলবে না। পড়ার এত তাড়াটা কি তোর? র'য়ে স'য়ে প'ড়লে ক্ষতি কি তোর? দিনরাত সমানে পড়া, এত তোর সইবে না। শরীর থাকলে তবে না পড়া!"

"কোনও ভাবনা ক'রো না মা, এ শরীর কিছু হবে না। আচ্ছা এইবার থেকে কি করি দেখ। খেয়ে খেয়ে তোমার এ শরীরখানা এমন ফুলিয়ে দেবো যে তুমি চিনতে পারবে না আমায়।"

"তা' আজ বাড়ীতে থাক না, নাই গেলি আজ অভয়ের কাছে প'ড়তে।"

"না মা, আজ না গেলে চ'লবে না।"

সরমা অন্যদিনের চেয়ে একটু দেরীতে ল্যাবরেটারীতে গেল। সেখানে গিয়া সে রোজ যেমন যায় তেমনি তার জায়গায় গিয়া কাজ আরম্ভ করিল। তার সেদিনকার

নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়া সে লাইব্রেরীতে গিয়া পড়িতে বসিল।

অভয় তাকে সমস্তক্ষণ একটু কৌতূহলের দৃষ্টিতে দেখিল। অনেকবার তার মনে হইল তার সঙ্গে অজয়ের বিষয়ে কথা কয়, কিন্তু সে সরমার কাছে অগ্রসর হইল না। প্রথমতঃ সরমা এত একাগ্রতার সহিত কাজ করিতেছিল, যে তার কাজে সে বাধা দিতে ইচ্ছা করিল না। দ্বিতীয়তঃ সে যে কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবে, কি কথা বলিবে, সে কথা সে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না।

সরমা যখন লাইব্রেরীতে আসিয়া বসিল তখন অভয় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিল।

সরমা তার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তার পর সে পড়িয়া গেল।

অভয় কিছুক্ষণ কাগজ-পত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া শেষে বলিল, "দেখুন দিদি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি?"

সরমার বুক দুড় দুড় করিয়া উঠিল। কি কথা যে অভয় বলিবে সে তাহা অনায়াসে অনুমান করিল। মায়ার সঙ্গে আজ সকালে সাক্ষাতে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে সে সমস্তই মায়া অভয়কে জানাইয়াছে সে বিষয়ে সরমার সন্দেহমাত্রও ছিল না। সুতরাং অভয় তাকে অজয় সংক্রান্ত কথাই জিজ্ঞাসা করিবে নিশ্চয়। আজ ল্যাবরেটারীতে আসিবার সময় অবধি সরমার মনে মনে এই বিষয়ে একটা প্রকাণ্ড ভয় ছিল। অভয় যদি তাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে তবে কি উত্তর সে দিবে, তাই ভাবিয়া সে অস্থির হইয়াছিল। সারাদিন তাই সে অভয়ের সঙ্গে বিশেষ কোনও কথাই বলিতে পারে নাই। আর এ বিষয়ে তার সঙ্কোচ ঢাকিবার জন্যই বিশেষ করিয়া সে তার মন নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিল তার পরীক্ষা কার্য্যে। অভয়ের কথায় তাই তার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

অভয় মৃদুস্বরে বলিল, "দেখুন আপনি সেদিন আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে আপনার বিয়ের কোনও কথা হ'লে আমাকে জানাবেন। কিন্তু—এই—আজ মায়ার কাছে যা শুনলাম, তাতে সে কথা কেমন ক'রে বিশ্বাস করি?"

সরমার মুখ লাল টক্‌টকে হইয়া উঠিল। সে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিল, "আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে মিথ্যা বলি নি।"

অভয় সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "কিন্তু, দেখুন, কিছু মনে ক'রবেন না এ সব কথা জিজ্ঞেস ক'রছি ব'লে;—কোনও অধিকার নেই আমার কিছু জিগ্‌গেস ক'রবার"—

সরমা ধীরভাবে বলিল, "আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে—আপনি আমার গুরু, আমার আদর্শ—দেবতা! আমার জীবন গড়ে তোলবার ভার আপনার। আপনি আমাকে স্বচ্ছন্দে জিগ্‌গেস ক'রতে পারেন—যদি অন্যায় ক'রে থাকি তার জন্য শাসন ক'রতে পারেন। আপনার শাসন আমি মাথা পেতে নেব।"

অভয় একটু বিব্রতভাবে বলিল, "না, সে কথা কেন ব'লছেন? আমি বলছি না যে আপনি অন্যায় কিছু ক'রেছেন। আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে আপনার নিজের জীবন নিয়মিত ক'রবার, সে স্বাধীনতায় আমার হাত দেবার কোনও অধিকার নেই। আমি সুধু এই ব'লছিলাম যে অজয় বাবুর সঙ্গে আপনার ওর নাম কি—বিয়ের কথা চ'লছে—কিন্তু সে সম্বন্ধে তো আপনি আমাকে কিছু বলেন নি।"

সরমার বুকটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল। সে চট্ করিয়া কথাটার জবাব দিতে পারিল না। এই কথার সঙ্গে তার অন্তরের এমন একটা নিবিড় বেদনার সংযোগ ছিল যে এই প্রসঙ্গ উঠাতে সে একটু অস্থির হইয়া উঠিল। একটু পরে সে বলিল, "বলি নি, বলবার দরকার হয় নি ব'লে, আর সময় পাই নি ব'লে। কথাটা হঠাৎ উঠেছিল—আর খুব শীগ্‌গির তার নিষ্পত্তি হ'য়ে গেছে, তাই ব'লতে পারি নি।"

অভয় বলিল, "যাক, নিষ্পত্তি হ'য়ে গেছে তা' হ'লে। বেশ। শীগ্‌গিরই বিয়ে হবে কি?"

সরমা মাথা নত করিয়া বলিল, "না, বিয়ে হবে না। হবার হ'লে আমি নিজেই আপনাকে ব'লতাম।"

অভয় চমকাইয়া উঠিয়া বলিল "অ্যাঁ! বিয়ে হবে না?—তার মানে"—আর কি বলিবে অভয় ভাবিয়া পাইল না।

সরমা টেবিলের উপর আরও নুইয়া পড়িয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "মানে এই যে অজয়বাবু আমাকে বিয়ে ক'রতে অস্বীকার ক'রেছেন।"

কথা কয়টা বলিতে সরমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। টেবিলের উপর মাথা দিয়া মুখ লুকাইল।

অভয় লাফাইয়া উঠিল। অভয়ের রাগ কেউ কোনও দিন দেখে নাই, কিন্তু আজ সে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "বটে! এত বড় আস্পর্দ্ধা!" সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্রবেগে পায়চারী করিতে লাগিল।

একটু পরে সে সরমাকে বলিল, "দেখুন—"

সরমা উঠিয়া বাধা দিয়া বলিল, "দয়া ক'রে এ সম্বন্ধে আর কোনও কথা জিগ্‌গেস ক'রবেন না। আমি—আমি আর কিছু ব'লতে পারবো না। আমি যাই।" বলিয়া সে বেগে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া সে নিজের মোটরে উঠিয়া চলিয়া গেল।

অভয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল! ক্রোধে তার ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। সে কোনও কথা না বলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

সরমা যে কথা বলিতে পারিবে না বলিল, অভয় তাহা কল্পনায় পূরণ করিয়া লইল। মায়ার কাছে সে যাহা শুনিয়াছিল তাহাতে তার অনুক্ত কাহিনীটি মনে মনে রচনা করিয়া লইতে কোনও কষ্ট হইল না।

অভয় স্থির করিল অজয় সরমাকে বিবাহ করিবার ভরসা দিয়া তাকে বিপথগামিনী করিয়াছে। এখন নিতান্ত বিপন্ন হইয়া সরমা অজয়কে বিবাহ করিতে বলিয়াছিল, কিন্তু অজয় তাহা করিতে অস্বীকার করিয়াছে। সরমার আর মুখ দেখাইবার পথ সে রাখে নাই।

এ কথা মনে হইতেই অভয় মহা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সরমা চলিয়া গেলে সে অস্থিরভাবে তার লাইব্রেরী ঘরের ভিতর পায়চারী করিতে লাগিল। তার রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল।

তার মনে হইল মায়া বলিয়াছিল ঠিক! অজয়ের মত পাপিষ্ঠের চরিত্রে পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। অবস্থান্তরের সহিত তার দুষ্প্রবৃত্তি ভিন্নগতি হয় মাত্র!

সরমার উপর তার মোটে ক্রোধ হইল না, তাকে প্রবঞ্চিতা বলিয়া তার উপর অভয়ের করুণা উথলিয়া উঠিল। তার ক্রোধ দগ্ধ করিতে লাগিল শুধু অজয়কে।

এখন উপায়? একমাত্র উপায় অজয়ের সহিত সরমার বিবাহ—অন্য কোনও কথাই অভয়ের মনে হইল না। সে শুধু ভাবিতে লাগিল, কেমন করিয়া অজয়কে বিবাহ করিতে বাধ্য করা যায়?

সে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ভাবিতে লাগিল। একটা পেন্সিল সে তার সম্মুখের ব্লটারের উপর অন্যমনস্কভাবে চালাইতে লাগিল—তাতে সে বড় বড় অক্ষরে, নানারূপ অলঙ্কার যোগ করিয়া অন্যমনস্কভাবেই লিখিল 'সরমা'—আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল অজয়কে বাধ্য করিবার উপায়।

মায়া আসিয়া দাঁড়াইল। অভয় তাহা লক্ষ্য করিল না। ল্যাবরেটারীর বাহিরে মায়া অভয়কে কখনও এমন অন্যমনস্ক হইতে দেখে নাই। সে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল ব্লটারের উপর বড় বড় অক্ষরে অভয় লিখিয়াছে "সরমা" আর সেই লেখার উপরই পেন্সিল বুলাইয়া সে অলঙ্কার যোগ করিতেছে।

তেলে বেগুনে মায়া জ্বলিয়া উঠিল! এই জন্য অভয় এতক্ষণ উপরে যায় নাই। এই ঘরে নিভৃতে বসিয়া সে ধ্যান করিতেছে সরমার কথা! তার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল।

মায়া তীব্র শ্লেষের সহিত বলিল, "কি হ'চ্ছে এখানে ব'সে ব'সে? বিরলে ব'সে প্রিয়তমা সরমার ধ্যান হ'চ্ছে?"

অভয় পেন্সিল ফেলিয়া অবাক্ হইয়া মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ছিঃ, কি যে বল তুমি তার ঠিকানা নেই। দেখ, অমন কথা মুখেও এনো না।"

তীব্রকণ্ঠে মায়া বলিল, "কেন বলবো না? সারাদিন ব'সে তার সঙ্গে ল্যাবরেটারীতে কাটালে, আর এখন সে চ'লে গেছে, তার কথা ব'সে ব'সে ধ্যান ক'রছ। দেখ আমি নেহাৎ কাণা নই। এতদিন যদি বা কাণা ছিলাম, আজ সকালে চোখ খুলে দিয়েছে সরি। সে যে সব ক'রতে পারে সে কথা এখন বুঝেছি। আর এও বুঝেছি যে কিসের টানে সে এখানে ছুটে আসে, আর কেনই বা হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই তুমি ফস্ ক'রে Bio-chemistryর ল্যাবরেটারী ক'রতে গেলে। সমস্ত আজ আমার চ'খের সামনে জলজ্বলে হ'য়ে ফুটে উঠেছে। তা' এত যদি ভাল লেগেছিল ওকে—ওকে বিয়ে ক'রলে না কেন? আমাকে

দগ্ধাবার জন্য বিয়ে করবার কি দরকার ছিল? জেঠা মশায়ের কথা না হয় নাই রাখতে!"

অভয় মায়ার কথা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। তার এই বাক্যস্রোতে বাধা দিবার পর্য্যন্ত শক্তি তার ছিল না। কথঞ্চিৎ সংবিৎ ফিরিয়া পাইয়া সে বলিল, "থাম, থাম, অমন কথা মুখেও এনো না। ছি! কি ভাব তুমি আমায়। আর দিদিকেও তুমি যা' ভাবছ তা' তিনি নন তা' তুমি জান। একটা ভুল ক'রে ফেলেছে ব'লে সে দুশ্চরিত্রা নয়।"

"না সে কেন হ'তে যাবে দুশ্চরিত্রা? খারাপ যা' কিছু আমি। তার কথা আমায় শোনাতে হবে না। আর তুমি—তোমাকে কি দোষ দেব? দোষ আমার অদৃষ্টের!" মায়া ধপ্ করিয়া একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

অভয় কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। মায়া একটু পরে আবার বলিল, "অত যে সাধু সাজছো, ভাব আমি কিছু খবর পাইনা? ল্যাবরেটারীর কাজ শেষ ক'রে উপরে না গিয়ে এতক্ষণ দু'জনে একলা ব'সে গুজু গুজু হ'চ্ছিল তা' জানি না? না সরি যে কেমন ক'রে ছুটে গিয়ে মোটরে উঠলো তা' দেখি নি!"

অভয়ের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। হঠাৎ মায়ার এই ভাবান্তরে সে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। মায়া ও সরমার পরস্পর প্রীতির সীমা ছিল না; আর সরমার সহিত অভয়ের মেলামেশা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ বা সঙ্কোচ তার ভিতর কোনও দিন প্রকাশ পায় নাই। অভয় সরমাকে যতখানি শ্রদ্ধা করে, যে প্রশংসা করে, তার চেয়ে মায়া তার প্রশংসা বা তাকে শ্রদ্ধা কম করে নি কোনও দিন। সরমার বুদ্ধি, তার চরিত্রগৌরব লইয়া তারা কত দিন কত আলোচনা করিয়াছে। সরমার চরিত্রের কথা বলিতে গিয়া মায়া অনেক দিন এমন গদ্গদকণ্ঠে তার অশেষ প্রশংসা করিয়াছে যে সে কথা শুনিয়া অভয় অবাক হইয়াছে।

অভয়ের মনে পড়িল, একদিন নয়, অনেক দিন মায়া বলিয়াছে, "সরি মানুষ নয়, দেবতা! ও যা ক'রেছে তা বুঝি দেবতাও পারে না। এত মনের বল, এত ত্যাগ, এতখানি ভালবাসা মানুষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।" অনেক দিন মায়া বলিয়াছে, "রোজ যদি আমি সরির পাদোক খাই তবে আমি ধন্য হ'য়ে যেতে পারি।"

আজ কি সরমা একটি মাত্র ভুলে, একবার মাত্র এক বঞ্চকের প্রলোভনে আত্মহারা হইয়া মায়ার চক্ষে এতখানি নামিয়া গিয়াছে যে মায়া এ কথাও বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছে যে সরমা অভয়ের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী!

অভয় স্তব্ধ হইল, দুঃখিত হইল, ক্রুদ্ধও হইল। অনেকক্ষণ পর সে একটু রূঢ়কণ্ঠে বলিল, "মায়া, তোমার কাছে এ ব্যবহার আমি আশা করি নি। আমি কোনও দিন এমন কিছু করি নি যাতে তোমার এমন সন্দেহের কোনও কারণ হ'তে পারে। তোমার দিদিও এ তিন বৎসরের মধ্যে একটি দিনের তরে কোনও রকমে কোনও সন্দেহের কারণ দেন নি।"

"সন্দেহের কারণ দেন নি? বটে? কারণ যথেষ্টই ছিল, কিন্তু আমি ওকে চিনতে পারি নি এত দিন, তাই সাদা মনে ওকে কোনও দিন সন্দেহ করি নি। আমি যা জানি তা জেনে অন্য কোনও মেয়ে এমন স্বচ্ছন্দে ওকে তোমার সঙ্গে মিশতে দিত না। আমি দিয়েছিলাম, ওকে দেবতার মত জানতাম ব'লে, জানতাম না যে ও এতবড় পাপিষ্ঠা!"

অভয় আরও অবাক্ হইল। সে হাঁ করিয়া মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মায়া একটু পরে বলিল, "কি জানি শুনবে? শোন—তোমার উপর ওর লোভ বরাবর। যেদিন প্রথম ও তোমাকে দেখেছে, সেই থেকে ও তোমাকে ভালবেসেছে। —একদিন সে নিজমুখে সে কথা স্বীকার ক'রেছিল আমার কাছে।"

বলিয়া মায়া অভয়কে সেদিনকার বিবরণ বলিল। শুনিয়া অভয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। তার বুকটা যেন বসিয়া গেল—হাত-পা অসাড় হইয়া গেল। শেষে মায়া বলিল, "আমি তখন ভেবেছিলাম বুঝি আমাকে ভালবেসে সে এতবড় ত্যাগ ক'রেছে। ভেবেছিলাম ও বুঝি দেবতা! এখন দেখছি—বুঝছি অন্য রকম। ওকে তুমি বিয়ে ক'রবে না জেনে ও আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে ঘটিয়েছিল, শুধু তোমাকে হাতে রাখবার জন্যে।"

অভয়ের মনটা যেন বিস্ময়ের আঘাতের পর আঘাত খাইয়া একেবারে চুরমার হইয়া গেল। তার চিন্তার ধারা উদ্দামভাবে একেবারে চারিদিকে সমান বেগে ছুটিয়া চলিল, গুছাইয়া সমস্ত কথা সে ভাবিতে পারিল না।

মায়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বকাবকি করিয়া শেষে বলিল, "ও পোড়ার মুখী যদি আর এ বাড়ীমুখো হয় তবে আমি হয় ওকে ঝাঁটাপেটা ক'রে তাড়াব, না হয় তো নিজে গলায় দড়ি দেব। তুমি ওকে ফের যদি এ ল্যাবরেটারীতে কাজ ক'রতে আসতে দেবে তো, তারই একদিন কি আমারই একদিন।"

অভয় বলিল, "কি যে বল তার ঠিকানা নেই। কি ব'লে তাকে মানা ক'রবে ল্যাবরেটারীতে আসতে তাই শুনি?"

মায়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, "কি ব'লে, স্পষ্ট ক'রে তাকে ব'লবো সে দুশ্চরিত্রা—ব'লবো আমার স্বামীকে সে নষ্ট ক'রবে, সে আমি দাঁড়িয়ে দেখবো না।"

অভয় ত্রস্তভাবে বলিল, "চুপ, চুপ! দেখ পাগলামী ক'রো না। তুমি একেবারে স্বপ্ন দেখছো। যা ভাবছো তার চেয়ে মিথ্যা জগতে কিছুই নেই।—তুমি শান্ত হও, সুস্থির হয়ে ভেবে-চিন্তে দেখ—নিজেই ভুল বুঝতে পারবে।"

মায়া বলিল, "ভুল? তুমি সরমাকে ভালবাস না? আচ্ছা বেশ, তবে তুমি তাকে এক্ষুণি চিঠি লিখে দাও যে সে যেন কাল থেকে এ বাড়ীতে না আসে, ল্যাবরেটারীতে না আসে।"

অভয় উত্তপ্তভাবে বলিল, "এমন অন্যায় কথা আমি কিছুতেই লিখবো না—কেন না আমি জানি তাঁর কোনও দোষ নেই, তাঁকে এমন ক'রে অপমান ক'রবার কোনও অধিকার নেই আমার!"

মায়া বলিল, "তার চেয়ে বল না কেন, লিখতে বুক ফেটে যাবে আমার! তাকে না দেখে থাকতে পারবো না আমি! কিন্তু—আমি ব'লে রাখছি যে আমি বেঁচে থাকতে এ ল্যাবরেটারী উপলক্ষ ক'রে রাসলীলা হ'তে দেবো না।"

অভয় চুপ করিয়া গেল। তার এত রাগ হইল যে সে কোনও কথা বলিতে পারিল না।

মায়াও অনেকক্ষণ বকাবকি করিয়া তড়্‌বড়্‌ করিয়া উপরে চলিয়া গেল।

মায়া চলিয়া গেলে অভয় তার ছিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা-গুলি সংহত করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া সে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিল। তার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সে অজয়কে একখানা চিঠি লিখিতে বসিল।

অজয়কে সে লিখিল,

"অজয় বাবু,—

"সরমা দেবীর সঙ্গে আপনার ব্যবহার পশুর অধম হইয়াছে। আপনার ভিতর যদি এক ফোঁটা মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট থাকে তবে আপনি অবিলম্বে সরমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন।

"একজন তদ্রকন্যাকে ভুলাইয়া কলঙ্কিত করা খুব একটা পৌরুষের কথা নয়। আর তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া আপনি যে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন এ কথা মনেও ভাবিবেন না। একদিন আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা অম্লানবদনে ব্যয় করিয়াছিলাম, সরমা দেবীর প্রতি যদি আপনি আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন না করেন তবে আমি আমার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করিয়াও আপনাকে শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হইব না। স্মরণ রাখিবেন যে শাস্তি দিবার শক্তি আমার আছে।

"আপনি পত্রপাঠ মাত্র সরমা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিবেন। তিন দিন মধ্যে যদি শুনিতে না পাই যে আপনাদের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, তবে আমি আপনার শাস্তির জন্য যাহা করিতে হয় করিব। ইতি—

অভয়।"

চিঠি ডাকে পাঠাইয়া দিয়া অভয় উপরে গেল।

মায়া বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতেছিল। অভয় তাহাকে স্নিগ্ধ বাক্যে শান্ত করিয়া বুকের ভিতর টানিয়া লইল।

(ক্রমশঃ)

বৌদ্ধ-সাহিত্যে 'চৈত্য'

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি

বৌদ্ধ-সাহিত্যে চৈত্য শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। চৈত্য বলিতে সাধারণ অর্থে আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্পর্কিত যে কোন পবিত্র স্থানকেই বুঝিয়া থাকি; কিন্তু মূলতঃ চৈত্য অর্থে কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্পর্কিত ঐরূপ স্থানকেই বুঝাইত না, কারণ জৈন এবং ব্রাহ্মণগণেরও চৈত্য ছিল, প্রাচীন গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] ইহা হইতেই অনুমান করা যায় অতি প্রাচীন কালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে "চৈত্য" বলিতে যে কোন সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম-মন্দির, পূজাস্থান বা তীর্থভূমিকেই বুঝাইত। পরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে "চৈত্য" শব্দটী কেবল বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্পর্কিত পবিত্র স্থানকেই বুঝাইতে আরম্ভ করে।

দীঘ-নিকায় গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে ভগবান বুদ্ধ এক সময় ভোজনগরের আনন্দ-চৈত্যে বাস করিতেন; সেইখানে বাসকালে তিনি শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা[২] এবং চারিটী মহোপদেশ[৩] সম্বন্ধে ভিক্ষুদের শিক্ষা ও উপদেশ দান করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে আনন্দ-চৈত্যে ভিক্ষুরা বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও উপদেশ শ্রবণ করিতে সমবেত হইতেন; সুতরাং আনন্দ-চৈত্য কোন ভিক্ষুবিহারের নাম ছিল বলিয়াই মনে হয়। এই দীঘ-নিকায়েরই অন্যস্থানে চাপাল চৈত্যের উল্লেখ আছে। শিষ্য আনন্দকে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধ এই স্থানে একটী দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি আনন্দকে বলিয়াছিলেন, "হে আনন্দ, বৈশালী নগরী সুন্দর, এবং উদেন, গোতমক, সত্তম্বক, বহুপুত্ত, সারনদদ এবং চাপাল চৈত্যও সুন্দর।[৪] এইগুলি ছাড়া দিব্যাবদানে গৌতম-ন্যগ্রোধ এবং মকুটবন্ধন নামক অতিরিক্ত দুইটি চৈত্যের উল্লেখ আছে।[৫] এই চৈত্যগুলি ঠিক কি রকমের পূজাস্থানকে বুঝাইত তাহা নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু নাম দেখিয়া মনে হয় উল্লিখিত চৈত্যের অনেকগুলিই কাহারও নাম অথবা স্মৃতিচিহ্নের স্মরণ ও পূজার জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। গৌতমন্যগ্রোধ-চৈত্য বলিতে খুব সম্ভব একটি ন্যগ্রোধ বৃক্ষকেই বুঝাইত, এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধভিক্ষুরা হয় ত এই বৃক্ষের পূজাও করিতেন। বৃক্ষ পূজার অনেক প্রমাণ ও নিদর্শন প্রাচীন বৌদ্ধশিল্প ও সাহিত্যে পাওয়া যায়। বহুহুত ও সাঞ্চী স্তূপের প্রাচীর-গাত্রে বৃক্ষপূজার অনেক প্রস্তর-চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যগ্রোধবৃক্ষের তলদেশেই গৌতম সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন। মকুটবন্ধন চৈত্য বলিতেও বোধ হয় কোন একটি পবিত্র স্থানকেই বুঝাইত। বুদ্ধদেব গৃহত্যাগের পরই তরবারী দিয়া নিজেই নিজ দীর্ঘ কেশগুচ্ছ কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে ভক্ত ও শিষ্যেরা বুদ্ধদেবের এই কেশগুচ্ছের পূজা করিতেন। মকুট-বন্ধন চৈত্য এইরূপ কর্ত্তিত কোন কেশগুচ্ছের অথবা তাঁহার মস্তকের পরিচ্ছদের বন্ধনী রক্ষিত পূজাস্থানের নাম ছিল বলিয়াই মনে হয়। বৌদ্ধধর্ম্মে সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিপূজার কোন স্থান ছিল না, ভক্ত ও শিষ্যেরা তখন বুদ্ধস্মৃতির পূজা করিতেন—বোধিদ্রুম, বুদ্ধদেবের পরিত্যক্ত কেশগুচ্ছ, তাঁহার পদচিহ্ন, ধর্ম্মচক্র, ভিক্ষাপাত্র অথবা এই প্রকার কোন স্মৃতিচিহ্ন যাহা সর্ব্বদা তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া দিত, তাঁহারা তাহাই ভক্তি, শ্রদ্ধা ও অর্ঘ্য দানে পূজা করিতেন।

১। পিটকগুলিতে 'চেতিয়' বলিতে জনসাধারণের যে কোন স্থানকেই বুঝায় এবং সে পূজাস্থানের সঙ্গে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পূজার্চ্চনার কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই। এই পবিত্র স্থান বলিতে কোন কোন ক্ষেত্রে হয় ত বর্ণ সমাবেশে বা পুষ্পসুসজ্জিত একটী বৃক্ষ বা একখণ্ড প্রস্তরকেও বুঝাইত (Eliot, Hinduism and Buddhism, II, 171-172)। জৈন চৈত্যগুলি বৌদ্ধ চৈত্যের ন্যায় বৃহৎ নহে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে প্রায় একই রূপ (Stevenosu, Heart of Jainism, p. 280)। সংস্কৃত ভাষায় 'চৈত্য' বলিতে কোন স্তূপ পূজাবেদী বা সমাধিকে বুঝায়। চৈত্য অর্থে "দাখোবা" শব্দটী ব্যবহার হয়; 'দাগোবা' সংস্কৃত 'দেহগোপা' শব্দ হইতে উদ্ভূত (Mitra, Bodh-Gaya, p. 119)।

২। দীর্ঘ নিকায়, ২য় খণ্ড, ১২৬ পৃঃ।

৩। দীর্ঘ নিকায় ২য় খণ্ড, ১২৩ পৃঃ।

৪। দীঘ নিকায়, ২য় খণ্ড, ১০২ পৃঃ।

৫। দিব্যাবদান (Cowler & Neil) ২০১ পৃঃ।

বাস্তবিক বরহুত স্তূপের প্রস্তর-বেষ্টনীতে এইরূপ পূজার নিদর্শন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মকুটবন্ধন চৈত্য মল্লদের পূজাস্থান ছিল, দীঘনিকায় গ্রন্থে এই প্রকার উল্লেখ আছে।[৬] প্রত্যেক গণ ও প্রত্যেক জনপদের পৃথক্ পৃথক পূজাস্থান ছিল; সেই সব পূজাস্থানের পূজা ও সংরক্ষণের ভার তাহাদের লইতে হইত। দীঘনিকায় গ্রন্থের মহাপরিনিব্বাণসুত্তে আছে, "যতদিন বজ্জিরা (অর্থাৎ বজ্জিগণের লোকেরা) তাহাদের পূজাস্থানের পূজা ও সংরক্ষণ করিবে, ততদিন বজ্জিদের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে।[৭] সারন্দদ চৈত্যে অবস্থানকালে বুদ্ধ বজ্জিদিগকে কল্যাণের সাতটি হেতু সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়াছিলেন।[৮] মনে হয় সারন্দদ চৈত্য বজ্জিদের কোন বিহার ছিল। তাহা না হইলে ভিক্ষুদের সম্মিলন সেখানে সম্ভব হইত না। মকুটবন্ধন চৈত্যে বোধ হয় ভগবান বুদ্ধদেবের মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছিল; কারণ, দীঘনিকায় গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান বুদ্ধদেবের মৃতদেহ মল্লদের মকুটবন্ধন চৈত্যে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, ইহাই দেবতাদের কাজ, কারণ সেইখানেই মৃতদেহ দাহ করা হইবে।[৯] এই গ্রন্থেই চাপাল চৈত্যের কথার বিশেষভাবে উল্লেখ আছে; এইখানেই তিনি মারের দুষ্ট অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া তাহাকে ধর্ষণ করিয়াছিলেন।[১০] দিব্যাবদান গ্রন্থে চাপাল চৈত্যের উল্লেখ আছে। ভগবান বুদ্ধদেব একদিন আনন্দকে বলিলেন, "যে চাপাল চৈত্যে ভিক্ষুরা বাস করে, তুমি সেইখানে গিয়া সকলকে উপাসনা-গৃহে সমবেত হইতে বল।[১১] ইহা হইতে অনুমান করা সহজ যে চাপাল চৈত্য কোন বিহার বিশেষেরই নাম ছিল। সারন্দদ চৈত্যকে বিহার বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে; কারণ অঙ্গুত্তর নিকায়ে উল্লেখ আছে যে এক সময় পাঁচ শত ভিক্ষু এইখানে সমবেত হইয়া পঞ্চরত্নপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে বিতর্ক ও আলোচনা করিয়াছিলেন।[১২]

সংযুক্ত নিকায়[১৩] হইতে জানিতে পারা যায় যে বৈশালীর বহুপুত্ত চৈত্যও এই প্রকার সংঘ-বিহারই ছিল। রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্ত্তী কোন এক স্থানে এই চৈত্য অবস্থিত ছিল। এক সময়ে বুদ্ধদেবকে এই স্থানে বসিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। এই স্থানের গোতমক চৈত্যে বুদ্ধ কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে বলিয়াছিলেন, "সবিশেষ জ্ঞাত থাকিয়াই আমি ধর্ম্ম উপদেশ দিব, কারণ ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার সাহায্যে ইহা শিক্ষা দিব।[১৪]" বিনয়পিটকেও এই গোতমক চৈত্যের উল্লেখ আছে; কিন্তু গোতমক চৈত্য বোধ হয় কোন উন্মুক্ত পূজাস্থানের নাম ছিল।[১৫] বস্তুতঃ ধম্মপদ গ্রন্থের টীকাকার উদেনও গোতমক চৈত্যকে বৃক্ষ চৈত্য (রুক্ষ চেতিয়ানি) বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন; সন্তান কামনা করিয়া কিংবা ভয় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য লোকে এই জাতীয় চৈত্যে আশ্রয় লইত।[১৬] দীঘনিকায় গ্রন্থে এই দুটী চৈত্যের উল্লেখ আছে।[১৭] জনৈক অচেলক জীবন যাপনের জন্য সাতটী নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে একটী এই ছিল যে তিনি উদেন, গোতমক, সত্তম্বক ও বহুপুত্ত চৈত্যের সীমান্তের বাহিরে যাইবেন না। ইহা হইতে জানা যায় যে বৈশালীর পূর্ব্বদিকে ছিল উদেন চৈত্য, দক্ষিণে গোতমক চৈত্য, পশ্চিমে সত্তম্ব (অথবা সত্তম্বক), এবং উত্তরে বহুপুত্ত। মগধের মণিমালক চৈত্য বিহার-গৃহ ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে; এই চৈত্য মণিভদ্র যক্ষের আবাসস্থল ছিল এবং তথাগতও কিছু দিন এখানে বাস করিয়াছিলেন।[১৮] অগ্গাড়ব চৈত্যও ঐ রকম একটী বিহার ছিল।[১৯] এক

৬। দীঘ নিকায়, ২য় খণ্ড, ১৬০ পৃঃ।
৭। দীঘ নিকায়; ২য় খণ্ড, ৭৫ পৃঃ; অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, ১৬-১৭ পৃঃ।
৮। দীর্ঘ নিকায়, ২য় খণ্ড, ৭৫ পৃঃ;
৯। দীর্ঘ নিকায়, ২য় খণ্ড ১৬০ পৃঃ।
১০। দীর্ঘ নিকায়, ২য় ১১৩-১৪ পৃঃ।
১১। দিব্যাবদান, ২০৭ পৃঃ।
১২। অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য় খণ্ড, ১৬৭ পৃঃ।
১৩। সংযুক্ত নিকায়, ২য় খণ্ড, ২২০ পৃঃ।
১৪। অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, ২৭৬ পৃঃ।
১৫। বিনয় গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, ২১০ পৃঃ।
১৬। ধম্মপদ ভাষ্য, ৩য় খণ্ড, ২৪৬ পৃঃ।
১৭। দীঘ নিকায়, ৩য় খণ্ড, ৯-১০ পৃঃ।
১৮। সংযুক্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, ২০৮ পৃঃ।
১৯। অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, ২১৬-১৭ পৃঃ; ধম্মপদ ভাষ্য, ৩য় খণ্ড, ১৭০ পৃঃ।

সময় ভগবান তথাগত রাজগৃহের নিকট লট্‌ঠিবন প্রমোদোদ্যানে সুপতিট্‌ঠ চৈত্যে কিছু দিন বাসকালে নৃপতি বিম্বিসার তাঁহাকে ও ভিক্ষুসংঘকে একদিন আমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন।[২০] এই চৈত্যটীও একটী বিহার ছিল বলিয়াই মনে হয়।

জাতকে অনেক চৈত্যের উল্লেখ আছে। মণিকণ্ঠ-জাতকের ভূমিকায় অগ্গাড়ব চৈত্যের কথা আছে; বুদ্ধ এখানে কিছু দিন বাসকালে ভিক্ষুদের নিকট মণিকণ্ঠ, ব্রহ্মদত্ত ও অট্‌ঠিসেন জাতক-কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। মনে হয় অগ্গাড়ব চৈত্য কোন গুহা বা বিহারের নাম ছিল।[২১] কালিঙ্গবোধি-জাতকের ভূমিকায় বিভিন্ন প্রকার চৈত্যের বিবরণ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব সেখানে আনন্দকে বলিতেছেন, চৈত্য তিন প্রকার:—(১) শরীর চৈত্য, অর্থাৎ যে চৈত্য কোন দেহাবশেষের উপর নির্ম্মিত (সম্ভবতঃ ইহা স্তূপ বা দাগোব জাতীয় চৈত্যের নাম); (২) ভোগীক চৈত্য, অর্থাৎ কোন ভোগ্য পার্থক্যে উপলক্ষ করিয়া যে চৈত্য নির্ম্মিত (সম্ভবতঃ কোন ভিক্ষা-পাত্র, চীবরখণ্ড, অথবা এই জাতীয় কোন জিনিস পূজার জন্য যে চৈত্য নির্ম্মিত হইত তাহারই নাম); এবং (৩) উদ্দেশিক চৈত্য, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা ঘটনা বা কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ার উদ্দেশে ও স্মরণার্থে যে চৈত্য নির্ম্মিত হইত। এই জাতকের ভূমিকাতে আনন্দ তথাগতকে প্রশ্ন করিতেছেন কোন বুদ্ধের জীবিতকালেই তাঁহার উদ্দেশে চৈত্য নির্ম্মিত হইতে পারে কি না। তথাগত উত্তরে বলিলেন, উদ্দেশিক চৈত্য কোন বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্বে হইতে পারে না; কিন্তু যে বোধিবৃক্ষের নীচে তাঁহারা সম্বোধি লাভ করেন, সেই বৃক্ষচৈত্যের পূজা জীবিতাবস্থায়ও হইতে পারে, মৃত্যুর পরেও হইতে পারে।[২২] উদ্দেশিক চৈত্য সম্বন্ধে ভগবান তথাগতের এই নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ঐ জাতীয় চৈত্য নির্ম্মিত ও পূজাস্থানরূপে যে ব্যবহৃত হইত না এ কথা বলা চলে না। পূর্ব্বে যে তিন প্রকার চৈত্যের কথা বলা হইয়াছে, ইহা ছাড়া অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়াও অনেক সময় অনেক চৈত্য নির্ম্মিত হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, একবার ভগবান তথাগত সুজাতা কর্ত্তৃক আহারে নিমন্ত্রিত হইয়া স্নান সারিয়া নদীগর্ভ হইতে উঠিবার পরই শত শত দেবগণ আকাশ হইতে নামিয়া আসিলেন তথাগতের স্নানাবশিষ্ট ফুল কুড়াইতে; উদ্দেশ্য ছিল ঐ ফুলের উপর চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা তাহার পূজা করিবেন।[২৩]

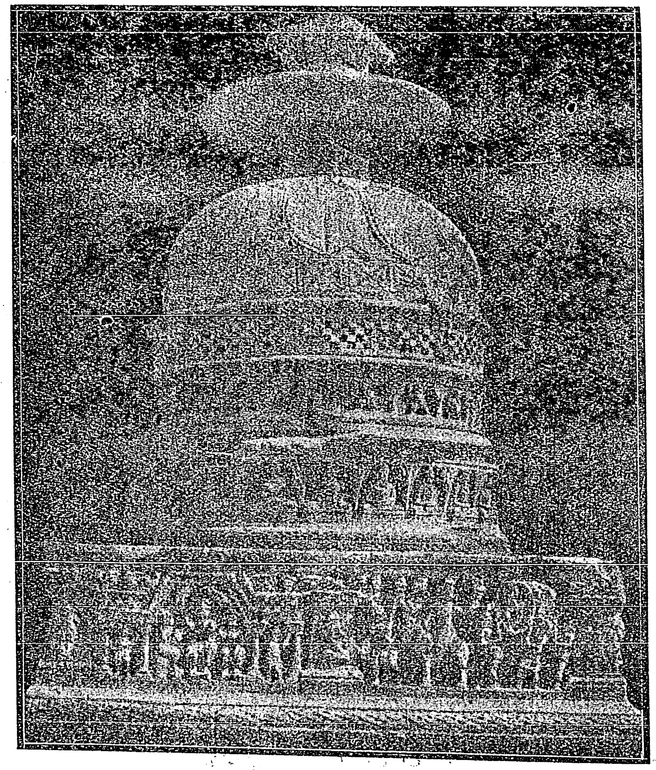

বৌদ্ধ চৈত্য

২০। বিনয় গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, S. B. E. ১৩৬ পৃঃ।
২১। জাতক গ্রন্থ (Fausboll), ২য় খণ্ড, ২৮২ পৃঃ, ঐ, ৩য় খণ্ড, ৭৮, ৩৫১ পৃঃ।
২২। জাতক (Fansboll), ৪র্থ খণ্ড, ২২৮ পৃঃ।
২৩। মিত্র, বোধগয়া, ৩০ পৃঃ।

এই শ্রেণীর চৈত্যগুলি যে স্তূপকে নির্দ্দেশ করিতেছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মহাবস্তু গ্রন্থে বহুদেব চৈত্যের উল্লেখ আছে। বহুদেব চৈত্য বোধ হয় কোন গুহা গৃহ বা বিহার গৃহের নাম ছিল।[২৪] অপদান গ্রন্থে বুদ্ধচৈত্য ও শিখিচৈত্য নামক দুইটী চৈত্যের উল্লেখ আছে।[২৫] ধম্মপদ ভাষ্যে অগ্‌গাড়ব চৈত্যের যে উল্লেখ আছে, সে সম্পর্কে জানা যায় যে একবার তিনি একটি তন্তুবায়-কন্যাকে যে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়াছিলেন তাহার ফলে ধর্ম্মলাভের প্রথম সোপান সে অতিক্রম করিয়াছিল।[২৬] এই গ্রন্থেই দশবল সম্বন্ধে কসসপ বুদ্ধের জন্য একটী স্বর্ণ চৈত্যের প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। বারানসীর ভক্ত পরিবারের লোকেরা গাড়ী বোঝাই খাবার সঙ্গে লইয়া এই চৈত্য নির্ম্মাণ কার্য্যে মজুরের কাজ করিতে আসিয়াছিল।[২৭] এই স্বর্ণ চৈত্যটী বোধ হয় কোন স্তূপকেই বুঝাইতেছে।

বিনয়পিটকের টীকা সমন্তপাসাদিকা, শাসনাংশ মহাবোধিবংশ, দাঠাবংশ, চূড়বংশ, সম্মোহবিনোদনী (বিভঙ্গের টীকা) এবং মনোরথপূরনী (অঙ্গুত্তর নিকায়ের টীকা) প্রভৃতি গ্রন্থে সিংহলের অসংখ্য চৈত্যের উল্লেখ আছে। সমন্তপাসাদিকা গ্রন্থে আছে, সিংহলের যে স্থানে প্রথম বৌদ্ধথেরগণ পদার্পণ করেন, সেখানে একটী পূজাস্থান নির্ম্মিত হয়; তাহার নাম ছিল পঠম চৈত্য। ইহা বোধ হয় কোন স্তূপ বা দাগোবার নাম ছিল।[২৮] এই গ্রন্থেই উল্লেখ আছে যে একবার এক ধার্ম্মিক সমণের আকাশ চৈত্যের আঙ্গিনার কয়েকটী সোপান নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।[২৯] একবার বুদ্ধদেব ৫০০ ভিক্ষু সহ মহাচৈত্য, দীঘবাপীচৈত্য এবং কল্যাণী চৈত্য[৩০] পরিদর্শনে গিয়াছিলেন বলিয়া সমন্তপাসাদিকার উল্লেখ আছে। এগুলি সম্ভবতঃ স্তূপ বা বিহার ছিল। থূপারাম চৈত্য একটী বিহারাবাসের নাম ছিল; তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। অনুরাধপুরের নিকটে একটি চৈত্যের উল্লেখ এই গ্রন্থে আছে; কয়েকজন বৌদ্ধ থের আকাশ হইতে সেখানে নামিয়াছিলেন।[৩১] কুমার উত্তর কর্ত্তৃক স্বর্ণ নির্ম্মিত অপর একটী চৈত্যের কথাও ইহাতে পাওয়া যায়। ইহাও একটী স্তূপ বলিয়া মনে হয়। সিংহলে এ শ্রেণীর স্তূপকে 'দাগোবা' বলে।[৩২] অনুরাধপুর সহরে প্রবেশের পূর্ব্বে অশোক কণ্টক-চৈত্য পরিদর্শন করিয়া তাহা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।[৩৩] কণ্টক-চৈত্য খুব সম্ভব কোন স্তূপ বা বৃক্ষচৈত্যের নাম, এবং এই জাতীয় চৈত্যের চারিদিকেই প্রদক্ষিণ-পথ থাকিত। সম্মোহবিনোদনী গ্রন্থের মতে প্রত্যেক ভক্তেরই চৈত্য পরিদর্শনকালে তিনবার উহা প্রদক্ষিণ করিয়া পূজা করা উচিত।[৩৪] ইহা হইতেই অনুমান করা যায় প্রত্যেক চৈত্যের চতুর্দ্দিকেই পরিক্রম-পথ ছিল। শাসনবংশে অনেকগুলি চৈত্যের উল্লেখ আছে, যথা, পাদ চৈত্য,[৩৫] রতনচৈত্য,[৩৬] ইত্যাদি। কিন্তু এইগুলির স্বরূপ নির্দ্দেশ করা কঠিন। মহাবোধিবংশে দীঘবাজী চৈত্য ও শীলাচৈত্যের উল্লেখ আছে; বুদ্ধদেব সমস্ত ভারতবর্ষ পরিদর্শনের পূর্ব্বে এই দুই চৈত্য দেখিতে গিয়াছিলেন।[৩৭] অশোক একবার মহাচৈত্য দর্শনে গিয়াছিলেন বলিয়া সমন্তপাসাদিকায় উল্লেখ আছে; তখন জনৈক থের ফুল লইয়া সেই চৈত্য পূজায় নিযুক্ত ছিল।[৩৮] প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে এই চৈত্যে পূজার জন্য বহু লোক সমবেত হইত। এইরূপ পূজা বৌদ্ধদের নিত্যকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত। সম্মোহবিনোদনী (২৯২ পৃঃ) হইতে জানিতে পারা যায় যে পাপমুক্ত থের মহাচৈত্যকে অভিবাদন করে। চৈত্য দর্শনে যে পুণ্য হয় এই বিশ্বাস

২৪। Law, A Study of the Mahavastu, p. 153; cf. Mahavastu (Senarts' Ed), Vol. III, p. 300.

২৫। অপদান, ১ম খণ্ড, ৭২, ২৫৫ পৃঃ।

২৬। ধম্মপদ ভাষ্য, ৩য় খণ্ড, ১৭০ পৃঃ।

২৭। ধম্মপদ ভাষ্য, ৪র্থ খণ্ড, ৬৪ পৃঃ।

২৮। মহাবংশ, ১৪ পরিচ্ছেদ, ৪৪-৪৫ শ্লোক; সমন্তপাসাদিকা, ১ম খণ্ড, ৭৯ পৃঃ।

২৯। মহাবংশ, ২২ পরিচ্ছেদ, ২৬ শ্লোক।

৩০। সমন্তপাসাদিকা, ১ম খণ্ড, ৮৯ পৃঃ।

৩১। সমন্তপাসাদিকা ১ম খণ্ড, ৭৯ পৃঃ।

৩২। সমন্তপাসাদিকা, ৩য় খণ্ড, ৫৪৪ পৃঃ।

৩৩। সমন্তপাসাদিকা, ১ম খণ্ড, ৮২ পৃঃ।

৩৪। সম্মোহবিনোদনী, ৩১৯ পৃঃ।

৩৫। শাসন বংশ, ১১৫ পৃঃ।

৩৬। শাসন বংশ, ৯১ পৃঃ।

৩৭। মহাবোধি বংশ, ১৩২ পৃঃ।

৩৮। সমন্ত পাশাদিকা, ১ম খণ্ড, ১০১ পৃঃ।

লোকদের মনে দৃঢ় ছিল (চেতিয়দস্‌সনম্ সাধুম)।[৩৯] দাঠাবংশ গ্রন্থে চূড়ামণি চৈত্যের উল্লেখ আছে; ইহা যে একটী স্তূপ বা দাগোবাকে বুঝাইত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ উল্লেখ আছে যে ইহার গর্ভে স্থাপিত স্বর্ণপাত্রের ভিতর ভগবান তথাগতের কর্ত্তিত কেশগুচ্ছ স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রক্ষিত আছে।[৪০] দাঠাবংশেই সিংহলের কল্যাণী, থূপ ও থূপারাম চৈত্যের উল্লেখ আছে।[৪১] থূপ চৈত্য যে একটী স্তূপেরই নাম, তাহা তাহার নামেই প্রমাণ; কিন্তু থূপারাম চৈত্য যে বিহার ছিল তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, ইহার নামকরণ হইতেই তাহা বুঝা যায় এবং ইহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। মনোরথপূরণী গ্রন্থে[৪২] আকাশচৈত্য এবং মহাচৈত্যের উল্লেখ আছে; দুইটী চৈত্যই সম্ভবতঃ স্তূপ ছিল। চূড়বংশেও সিংহলের অনেক চৈত্যের নাম পাওয়া যায়। সিংহলে অম্বথলা চৈত্য[৪৩] পর্য্যন্ত অনেকগুলি সুসজ্জিত চৈত্য ছিল। অন্যত্র মঙ্গলচৈত্যের কথাও ইহাতে বিবৃত আছে। ইহার উত্তরে রাজা উপতিষ্য একটী স্তূপ, একটী মূর্ত্তি এবং উহার সংরক্ষণের জন্য একটী গৃহও নির্ম্মিত করিয়াছিলেন।[৪৪] বহুমঙ্গল চৈত্য,[৪৫] অমলচৈত্য,[৪৬] হেমবালুক চৈত্য,[৪৭] রতনবালুক চৈত্য[৪৮] এবং রতনাবলী[৪৯] চৈত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দমিড়জাতির লোকেরা যে একটী চৈত্য ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল, তাহারও উল্লেখ চূড়াবংশে আছে।[৫০]

স্তূপ ও বিহার ছাড়া চৈত্য বলিতে যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সভাগৃহকেও বুঝাইত, তাহার প্রমাণ নাসিক, ভাজা, কার্লে প্রভৃতি স্থানের পর্ব্বত-গাত্র-খোদিত অদ্যাপি বর্ত্তমান চৈত্য গৃহগুলি হইতেও জানা যায়। এখনও এই সকল সভাগৃহ-গুলিকে চৈত্য বলা হয়। এই সভাগৃহগুলির ভূমিচিত্র একটু লম্বাকৃতি এবং শেষ প্রান্তটি কতকটা অর্দ্ধমণ্ডলাকার।

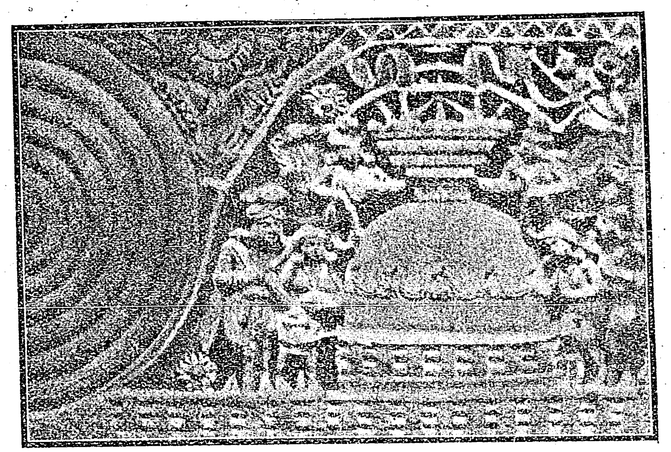

চৈত্য পূজা

এই শেষ প্রান্তে একটী ছোট স্তূপ বা দাগোবা থাকে, এবং তাহারই সম্মুখে স্তম্ভসজ্জিত প্রশস্ত সভাগৃহ,—সেইখানে ভক্ত ও শিষ্যেরা সমবেত হইয়া স্তূপের পূজা করিতেন, আচার্য্যের উপদেশ ইত্যাদি শুনিতেন। বিহারগুলি ছিল ভিক্ষুদের বাসগৃহ; এক একটী বিহারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি কক্ষ থাকিত, প্রত্যেক কক্ষে এক একজন ভিক্ষু বাস করিতেন। স্তূপগুলি পূর্ব্বে ছিল ছোট বড়, অর্দ্ধমণ্ডলাকৃতি ও পরে হইয়াছিল নলাকৃতি গম্বুজের মতন।

উপরে বিভিন্ন প্রকারের চৈত্যের যে সমস্ত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা গেল, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, বৌদ্ধ-সাহিত্যে চৈত্য বলিতে বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্পর্কিত স্তূপ, বিহার, সভাগৃহ, বিশেষ বৃক্ষ, স্মৃতিস্তম্ভ, পূজাস্থান, অথবা মূর্ত্তিকে বুঝাইত। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পর্কে পূজা ও ভক্তি নিবেদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ও নির্ম্মিত যে কোন পূজার বস্তুকেই চৈত্য বলা যাইতে পারে।

৩৯। সম্মোহবিনোদনী, ৩৪৮ পৃঃ।

৪০। দাঠাবংশ (B. C. Law), ৬ পৃঃ।

৪১। দাঠাবংশ ১২-১৩ পৃঃ।

৪২। মনোরথ পূরণী (শিংহলী সং) ২০৭ পৃঃ; প্রথমটী অনোমা নদীতীরে বোধিসত্ত্ব কর্ত্তিত কেশগুচ্ছের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই চৈত্য ইন্দ্র আকাশমার্গে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং মহাচৈত্য জনৈক আমাত্য কর্ত্তৃক পূজিত হইত।

৪৩। চূড় বংশ, ১ম খণ্ড, ৫ পৃঃ।

৪৪। চূড় বংশ, ১ম খণ্ড, ১৪ পৃঃ।

৪৫। চূড় বংশ, ১ম খণ্ড, ২৭ পৃঃ।

৪৬। চূড় বংশ, ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃঃ।

৪৭। চূড় বংশ, ১ম খণ্ড, ১৩১ পৃঃ।

৪৮। চূড় বংশ, ২য় খণ্ড, ৩৮৮ পৃঃ।

৪৯। চূড় বংশ, ৪৪৯ পৃঃ।

৫০। চূড় বংশ, ৩৮৮ পৃঃ।

অস্তাচল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ বি-এ

(১)

"তা কি কোনো রকমেই হ'তে পারে না মিস্?"

"না" বলিয়াই প্রসঙ্গটা চাপা দিবার উদ্দেশ্যে তরুণী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"ঐ দেখুন; দীর্ঘকাল বিলেতে থেকে, সেখানকার চাল্‌চলন্ আপনার এতই মজ্জাগত হ'য়ে গেছে যে, বাঙালীকে—নিজের জাত ভাইকেও আর দেশী কায়দায় বনিয়ে নিয়ে চ'ল্‌তে পারেন না। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এগুলো কি বিলেৎ-ফেরৎ মাত্রেরই রোগ? আমি কিন্তু ঐ সব সাহেবিয়ানাগুলো খুব অপছন্দ করি। ওতে তৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্তিই আসে বেশী। যাক্, আপনি আমায় মিস্ না বোলে, নাম ধ'রেই ডাক্‌বেন্। আমার সঙ্গে ওগুলো ঠিক্ খাপ্ খায় না।"

"আচ্ছা, তাই ক'র্‌বো এবার হ'তে। বিলিতি কায়দা যে মজ্জাগত হ'য়ে গেছে ব'লেই সেই ধাঁচে সব সময় চ'ল্‌তে চাই, তা ঠিক্ নয়। ওতে অনেক অসুবিধার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। নাম না জানার ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না; কোন আদবেরও বালাই নাই। আপনার নামটা তো আমার আজও ভাল ভাবে জেনে নেওয়া হয় নি। অনেকবার ভেবেছি—জিজ্ঞেস ক'র্‌বো; হ'য়ে ওঠে না।"

"নামটা ছাড়া যার অন্য কোনো পরিচয় নাই, তার সে নামটারও কোনো মূল্য নাই। যা হয় একটা কিছু ব'লে ডাক্‌লেই চল্'বে; কিন্তু—'আপনি', 'আজ্ঞা' ইত্যাদির ভারটা আর ঘাড়ে চাপাবেন না।"

ললাটটা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণেক ভাবিয়া লইয়া মেজর বলিলেন——"ঠাকুরদা তো আপনাকে 'অনি' কিম্বা ঐ রকম কি একটা ব'লে ডাক্‌তেন, শুনেছি। পুরো নামটা বোধ হয় শুনি নি কোনো দিন।"

"দাদা মশায়ের সঙ্গে সঙ্গেই যার বাঁধনের শেষ সুতোটি পর্য্যন্ত ছিঁড়ে গেছে, তার আর অতীতের জীর্ণ সম্বল শুধু নামটাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি বলুন? ছেলেবেলা থেকে যা কিছু আমার ব'ল্‌তে ছিল, আজ আর তার কোনো চিহ্নও নাই। তাই ব'ল্‌ছিলুম—ঐ নামটাকে কেবল আঁকড়ে ধ'রে আর লাভ নাই। দাদা মশায় ডাকতেন, ইচ্ছে হ'লে আপনিও সেই 'অনি' ব'লেই ডাক্‌বেন। তবে বর্ত্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে ব'ল্‌তে হ'লে, এখন আমার পুরো নামটা হওয়া উচিত—হয় 'অনামিকা' কিম্বা 'অনাথা'। যা'ক্, কিন্তু দয়া ক'রে আমায় 'আপনি' না ব'লে, 'তুমি' ব'লে সম্বোধন ক'র্‌লেই সুখী হব। নামের মূল্য বিশেষ কিছু নাই; ওটা শুধু 'বহুর' ভিতর থেকে একজনকে বেছে নেবার একটা সঙ্কেত মাত্র। সুতরাং ডাক্‌বার বেলায় যা ব'লেই ডাকুন্, তাতে কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। তাই ব'লে অবশ্য 'তুমি'র যোগ্যকে 'আপনি' না বলাই ভালো; কারণ, পদমর্য্যাদার কথা এসে পড়ে। নয় কি?" বলিয়াই অনি তাহার স্বাভাবিক মাধুর্য্যের সহিত অল্প হাসিল।

"আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু হঠাৎ 'তুমি' ব'ল্‌তে যেন কেমন একটু বাধো বাধো লাগে।"

মেজরের কথা শেষ না হইতেই, তাড়াতাড়ি ঘরের আলোটি ক্ষীণ করিয়া দিয়া, স্মেলিং সল্টের শিশিটা তাঁহার হাতে দিয়া অনি বলিল—"আপনার শরীর অসুস্থ! ব'ল্‌ছিলেন—মাথা ধরে'ছে। বেশী কথা ব'ল্‌বেন না। যে পরিচয়টুকু না জেনে এই দেড় মাস সময়ও বেশ কেটে গেছে, সেটার অভাবে আরো দু'একদিন কাটানোর কোনো অসুবিধাই হবে না। পরে একদিন সব জেনে নিলেই চ'ল্‌বে। আপনি একটু বিশ্রাম করুন; আমি ইউডিকোল্‌নের শিশিটা নিয়ে আসি।" পর্দ্দাটা টানিয়া দিয়া অনি পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

ডাক্তার স্থির দৃষ্টিতে তাহার ধীর মন্থর গতির পানে চাহিয়া রহিলেন। স্বদেশের ও বিদেশের যে সকল সম্ভ্রান্ত ও সুসভ্য সমাজের মহিলাদের সঙ্গে তিনি মিশিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে এই নারীটির যেন একটা অস্বাভাবিক রকমের পার্থক্য আছে। নারী—এত ধীর ও অচঞ্চল—তাঁহার চোখে খুব কমই পড়িয়াছে। অথচ ইহার চাল্-

চলন, কথাবার্ত্তা—সব কিছুর মধ্যেই যথেষ্ট সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। চরণের ধীর তাল যেন সুরের পর্দ্দায় পর্দ্দায় পরশ দিয়া চলে। আয়ত নীল চোখ দুটি লাবণ্যময় যৌবন-শ্রীকে আরও মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

ইউডিকোল্‌নের জলে থিন্ লিনেনের পটীটা ভিজাইয়া মেজরের কপালে দিয়া, অনি পাশের ইজিচেয়ারে বসিয়া হাতপাখায় বাতাস দিতে লাগিল। ডাক্তার বাবু নিমীলিত নেত্রে শয্যায় পড়িয়া কি ভাবিতেছিলেন। অনিও অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া বাতাস দিতেছিল। সহসা শিথিল পাখাখানি ডাক্তার বাবুর কপালের উপর পড়িতেই উভয়ের চমক্ ভাঙিয়া গেল। অনি অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতেই, তিনি বলিলেন—

"এতে লজ্জিত হবার কিছুই নাই। আপনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন; কিন্তু আমার মনে হয়—ওটা অনাত্মীয়তার সঙ্কোচ। ঐটাই আমি বরদাস্ত ক'র্‌তে পারি না। কাছে থেকেও মানুষের সঙ্গে যদি মানুষের অনাসক্ত ভাবটাই প্রবল থেকে যায়, তবে দূরেরটা যে চিরদিন নাগালের বাইরেই পড়ে' থাক্‌বে তাতে আর সন্দেহ কি? আপনি —তুমিও তো কোনো অংশেই তার চেয়ে বেশী কাছে আস্‌তে চাও ব'লে মনে হয় না। আমার এখানে মাত্র কয়েক দিন থেকেই তুমি হাঁফিয়ে পড়ে'ছ। গুরুগিরি, না হয় নার্সিং —যা হোক্ কিছু না হ'লেই যে তোমার জীবিকা চল্'তে পারে না, সেটা আমি কোনো মতেই স্বীকার ক'রবো না। যদি দোষ না নাও, তবে বল্‌তে চাই—সাহায্য নেওয়া নয়, বন্ধুত্বের দাবীতেও তো আমার এই যৎসামান্য আয়ের অংশ নিয়ে তোমার চ'ল্‌তে পারে! অনি, সত্যই কি তোমায় বন্ধু হিসাবেও কাছে রাখ্‌বার অধিকারটুকু পেতে পারি না?"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই যেন সহসা লজ্জিত হইয়া ডাক্তার প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—"না—না, আমি অন্য কোনো ভাবে বলি নি। আপনার দাদা মশায়ের মৃত্যুর পর যখন আপনি আমার আশ্রয়ে আস্‌তে আপত্তি ক'রেছিলেন, তখন আপনাকে যে আশ্বাস দিয়েছিলুম, এখনো স্পর্দ্ধার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে ঠিক্ তাই বল্‌ছি, যে আপনি আমার মনুষ্যত্বকে অবিশ্বাস ক'র্‌বেন না; আমার দ্বারা আপনার সম্মান কখনই ক্ষুণ্ণ হবে না। আপনি যদি মনে করেন এখানে কোনো অসুবিধা হ'চ্ছে, আমি আপনার জন্যে আলাদা বাসা ঠিক্ ক'রে দিতেও প্রস্তুত আছি।"

মেজরের সৌজন্যে নিজের তরফ হইতে একটু লজ্জিতা হইয়াই অনি বলিল—

"ও কথা বল্‌বেন না। আমি তো আর কোন দিনের জন্যেই সে কথা ভাবি নি। আপনার কাছ থেকে যা পেয়েছি, তা' আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকেও পাওয়া যায় না। বন্ধু কেন! আপনি আমার পরম আত্মীয় ও আশ্রয়-দাতা। আপনি ও কথা বল্‌ছেন কেন? আমি তো আপনার এইখানে—আপনার কাছেই আছি।"

"না অনি, এ কাছে থাকার মধ্যে যেন কোথায় একটা মস্ত ফাঁক আছে। জীবন আর মৃত্যু অনবরত পাশা-পাশি থাক্‌লেও, একটা সূক্ষ্ম পর্দ্দা যেমন তা'দিগে চিরদিনই তফাৎ ক'রে রেখেছে, কোনো মতেই কেও কারো রহস্য ভেদ ক'র্‌তে পার্‌ছে না; তোমার আমার মধ্যেও যেন কতকটা তেমনি ভাবই র'য়ে গেছে। আমার মনে হয়, কোথায় যেন তোমার একটু শান্তির, একটু তৃপ্তির অভাব—"

মেজরের কথা শেষ না হইতেই অনি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—"আমার কোনও তৃপ্তি, কোনও শান্তিরই অভাব তো নেই। আপনি নিজে কষ্ট ক'রে আমার জন্যে যা ব্যবস্থা ক'রেছেন, তাতে আমার কোন অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্যই থাক্‌তে পারে না। এতখানি কোনো আত্মীয় বন্ধুর কাছ থেকেও আশা ক'রতে পারি নি। দেশে যে দুই একজন আত্মীয় আছেন, বিপদে পড়ে' তাঁদের অনেকের কাছেই সাহায্য চেয়েছিলুম; তাঁরা পত্রের উত্তর দিয়েও আমার এই বিপদের সময় একটু সহানুভূতি দেখাবার অবসর পান নি, বা দরকার বলে' মনে করেন নি। মা তাঁদের আগে থেকেই চিন্‌তেন। তাই তিনি কারও আশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে দেশের ভিটেটুকু আঁকড়ে থাক্‌তে পারেন নি। আপনি যে দয়া করে আমায় আশ্রয় দিয়েছেন—বিদেশে বিপন্ন অবস্থায় রক্ষা করেছেন, তার চেয়ে বেশী আর কি আশা করতে পারি! আপনার অনুগ্রহ পেয়েছিলুম ব'লেই জীবন-জোড়া একটা মস্ত অনুশোচনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। দাদুর সেই দারুণ রোগের সময় কি বিপন্নই যে হ'য়েছিলুম, তা একমাত্র ভগবান জানেন। আপনি দয়া ক'রেছিলেন ব'লেই, তবুও

২১৩৩ / ৩৮. ১২/৬/৭৯

দাদামশায়ের শেষ অবস্থায়—যা হোক্, একটু কিছুও ক'রতে পেরেছি। আপনি দয়া ক'রে আমার ভার হাতে তুলে নিয়েছিলেন; তাই অন্ততঃ মর'বার সময়ও তিনি তাঁর শোক-সন্তপ্ত, জীর্ণ হৃদয়ের শেষ নিঃশ্বাসটা একটু সোয়াস্তির সঙ্গে ফেলে যেতে পেরেছেন। এই নিরাশ্রয়া—অনাথার জন্যে—"

অনিকে নিরস্ত করিয়া মেজর একটু আক্ষেপের সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন—"নাঃ, অনি, শুধু কৃতজ্ঞতার বোঝা চাপিয়ে নিজেকে হাল্কা ক'র্তে চাও; কিন্তু আমি তো তার দাবী করি না।"

"প্রত্যুপকার ক'র্বার ক্ষমতা সকলের না থাক্তে পারে, কিন্তু উপকারীর কৃত উপকারকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার ক'র্বার কৃতজ্ঞতাটুকু সবারই থাকা উচিত। সেটা না থাকাকে আমি সত্যি খুব ঘৃণা করি ডাক্তার বাবু। যাক্ গে সে সব কথা! আপনি আর বেশী ব'কে ব'কে জরটা তুলে ফেল্বেন না। কাছে না পাওয়ার অভিযোগ সর্ব্বদাই করেন; কিন্তু আমি কাছে আস্তে চাই না শুধু ঐ জন্যেই—যে আপনি কোনো লোককে কাছে পেলেই কেবল আবল তাবল বক্তে সুরু করেন। আমি বাতাস দিচ্ছি, আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন; নইলে উঠে যেতে বাধ্য হব।"

মেজর পাশ ফিরিয়া চোখ বন্ধ করিলেন। ইচ্ছা হইলেও বলিতে পারিলেন না—কেন তিনি অবিশ্রান্ত ভাবে বকিয়া যাইতে চান। 'পুরুষেরও হারানোর ব্যথা আছে—সে ব্যথা নারীর চেয়ে কম নয়।'

তিনি নিঃশব্দে পড়িয়া ঘুমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্যর্থতা জ্ঞাপনের ভান করিতেও তাঁহার সাহস হইল না। এই নারীর দৃঢ় আদেশগুলির প্রতিবাদ করিবার, বা তাহা লঙ্ঘন করিবার সাহস তাঁহার ছিল না। সেই দৃঢ়তার মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল, যাহা তাঁহার প্রকৃতির সঙ্গে আদৌ মিল খাইত না; অথচ কেন যে তিনি তাহা না মানিয়া পারিতেন না, তাহার কৈফিয়তও হয়তো নিজের কাছেই দিতে পারেন না। তিনি বুঝিতেন, অনি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ বলিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিলেও, তাঁহাকে ভয় করে না।

স্থির গম্ভীর ভাবে বসিয়া অনি ধীরে ধীরে হাতপাখাখানি সঞ্চালিত করিতে লাগিল। সে ইচ্ছা করিয়াই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল, যাহাতে ডাক্তার পুনরায় কথা বলিবার সুযোগ ও অবসর না পান। এই নিস্তব্ধতা ডাক্তারের ভাল না লাগিলেও ভাঙিবার ইচ্ছা হইল না। স্নেহের আবেশে পোষমানা দুরন্ত শিশুর মত, তাঁহার বাঁধনহারা চঞ্চল চিত্ত-প্রকৃতি অনির এই দৃঢ় অথচ শান্ত ও স্নিগ্ধ শাসনের তলে যেন আপনা আপনি অবশ হইয়া আসিল।

অনি যখন নিঃশব্দে আসন ছাড়িয়া উঠিল তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। ডাক্তার অনেক-ক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। অনি মেজরের ঘুমন্ত মুখখানাকে অতি সন্তর্পণে একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। সুগৌর মুখখানার উপর আলোর ছটা পড়িয়া যেন একটা স্বপ্নময় মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মনকে জোর করিয়া শাসন করিলেও দেখার লোভটুকুকে অনি কোনোমতেই সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। মেজরকে দেখা অবধিই অনির মনের নিভৃত কোণে থাকিয়া থাকিয়া যেন কিসের একটা ক্ষীণ আকর্ষণ জাগিয়া উঠিত; কিন্তু সংযত-স্বভাবা অনি তাহার কোনো কারণই খুঁজিয়া পাইত না। নিজের সেই দুর্ব্বলতাটুকুকে দমন করিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া চলিত।

টেবিলের উপর হইতে সেজ্‌টাকে সরাইয়া আড়ালে রাখিয়া অনি ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(২)

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিতেই, অনি যখন পথের পাশের জানালা খুলিয়া দাঁড়াইল, তখন বেলা প্রায় সাতটা। রৌদ্রের সোণালী আঁচল তখন ঘন পল্লবিত তরুর ছায়ান্তরাল ভেদ করিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। সহসা মেজরের কথা মনে হইতেই অনি একটু লজ্জাবোধ করিল। এত বেলায় সে কখনই শয্যাত্যাগ করে না। ডাক্তার বাবু খুব সকালে উঠিয়া চা ও জলখাবার খাইয়া বাহির হইয়া যান্। এখানে আসিবার পর হইতে অনি তাঁহার সকাল-বিকালের চা ও জলখাবার-টুকু ঠিক্ করিয়া দিবার ভার স্বেচ্ছায় নিজেই গ্রহণ করিয়াছিল। অনি ডাক্তারবাবুর সহিত অবাধভাবে মেলামেশা করিতে পারিত না। একটা অকারণ-সঙ্কোচে সে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু তাহার সেবাপরায়ণা নারী-প্রকৃতি সেই উপকারী

বন্ধুর সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে একবারে উদাসীন হইয়া থাকিতে পারিত না।

বাবুর্চি ও বেয়ারার অনুগ্রহের উপর ডাক্তারের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সুবিধা অসুবিধা নির্ভর করিত। অনি প্রথম প্রথম তাহাদের কাজকর্ম্মের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। এইরূপে, দেখিতে দেখিতে, আপনার অজ্ঞাতসারে সেই বাঁধনহারা উদাস কর্ম্মশ্রান্ত পথিকের সর্ব্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্যের ভার সে ক্রমে ক্রমে আপন হাতে তুলিয়া লইয়াছিল।

মেজরের গত সন্ধ্যার অসুস্থতার কথা মনে হইতেই নিমেষে অনির কর্ত্তব্যজ্ঞান যেন তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে চাবুক্ মারিয়া সচেতন করিয়া তুলিল। যিনি তাহার আত্মীয় অপেক্ষাও মঙ্গলার্থী, বন্ধু অপেক্ষাও হিতৈষী; বিদেশে নিঃসহায় ও বিপন্ন অবস্থায় একমাত্র যাঁহার অনুগ্রহ ও সহানুভূতি তাহাকে আজিও নারীত্বের সকল গৌরব লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার সম্বল দিয়াছে, তাঁহার অসুস্থতায় সে নিজের এই উদাসীনতাকে কোন মতেই ক্ষমা করিতে পারিল না। ত্রস্তপদে ডাক্তারের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিল দ্বার তখনও রুদ্ধ; রাত্রে সে যেরূপভাবে দরজাটী টানিয়া বাহির হইতে আট্‌কাইয়া গিয়াছিল, এখনও ঠিক সেই ভাবেই আছে। গৃহকোণে ক্ষীণ সেজ্‌টী তখনও মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল।

অনি ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মেজর তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই—লাল-ইম্‌লির মোটা র‍্যাগখানিতে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছেন। হঠাৎ এ অবস্থা দেখিয়া তাহার মনটা আঁৎকাইয়া উঠিল। নিঃশব্দে শয্যাপার্শ্বে আসিয়া গায়ে হাত দিতেই, ডাক্তার একটা ক্ষীণ কাতর শব্দ করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। অনি কপালে হাত দিয়া দেখিল—প্রবল জ্বরে তাহা আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া আছে।

নিমেষে অনির সমস্ত সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। অতি নিবিড়ভাবে ডাক্তারের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, কপালে জলপটী দিয়া, সে আস্তে আস্তে তাঁহার চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাইতে লাগিল। অনির মনে হইতেছিল তাহারই সর্ব্বস্বান্তকারী গ্রহদেবতার নিষ্ঠুর প্রকোপেই বোধ হয় এই উদার, মুক্তহস্ত আশ্রয়দাতার মহৎ জীবনকে নির্য্যাতিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে ডাক্তার চোখ মেলিয়া একবার অনির মুখের দিকে চাহিলেন। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তাঁহার বুক ঠেলিয়া উঠিতেছিল। অনি উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার কি খুব কষ্ট হ'চ্ছে?"

ডাক্তার বলিলেন—"বিশেষ কষ্ট হয় নি; তবে জরটা বোধ হয় একটু বেশী হ'য়েছে। বনবিহারীকে একবার খবর দিলে ভাল হ'ত। আপনি একা—"

অনি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"তাতে কি হ'য়েছে! সে জন্যে আপনি মোটেই ব্যস্ত হবেন না। আর বনবিহারী বাবুকেও আমি এখনি খবর পাঠাচ্ছি।" বনবিহারীর নামে যেন সেও মনে মনে একটু ভরসা পাইল।

বনবিহারীবাবু মেজর রায়ের একজন বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি মোগলসরাইএর রেলওয়ে ডাক্তার। ইতঃপূর্ব্বে দুই একবার নিমন্ত্রণ উপলক্ষে বনবিহারীবাবু এখানে আসিয়াছিলেন। অনির সহিতও তাঁহার অল্প-বিস্তর আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। বনবিহারীবাবুর সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও, তাঁহার স্বভাবের ভিতর এমন একটা মিশুক্ ও মোলায়েম ভাব ছিল, যাহাতে তিনি অতি অল্পক্ষণের আলাপেই অনির নিকট অনেকখানি আত্মীয়তার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

টেবিলের উপর হইতে একখানি চিঠির কাগজ টানিয়া লইয়া, অনি ডাক্তার রায়ের প্রবল জ্বরের কথা লিখিয়া বনবিহারীবাবুকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিল। সে বনবিহারীবাবুর পুরা নাম ও ঠিকানা জানিত না। অনি বনবিহারীবাবুর নিকট যাহা শুনিয়াছিল, ডাক্তার রায়ের নিকট হইতেও সেই উপাধিহীন নাম ও রেল কোম্পানী-সংশ্লিষ্ট পদমর্য্যাদাটুকুর বেশী আর কিছুই জানিতে পারে নাই। নাম জিজ্ঞাসা করিলেই বনবিহারীবাবু একটা কাব্যের দোলা দিয়া কেবলমাত্র বলিতেন—"বন্‌-বে-হা-রী," এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দিতেন যে সেইটুকুর বেশী আর কোনো পরিচয়েরই দরকার হবে না। সুতরাং ডাক্তারকে সে বিষয়ে পুনরায় কোন প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া, অনি বেয়ারাকে ডাকিয়া পত্রখানি সত্বর মোগলসরাই-এর রেল-ডাক্তার সাহেবের কুঠীতে পৌছাইয়া দিবার আদেশ দিল। বেয়ারা শিউকিষণ্

বনবিহারীবাবুকে বিশেষরূপে চিনিত; এবং পূর্ব্বেও সে বহুবার বনবিহারীবাবুর নিকট পত্রাদি পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

স্নেহের বন্ধন ও রক্তের কোন যোগসূত্র না থাকিলেও অনি ডাঃ রায়ের অসুখে বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। অদৃষ্ট ও ঘটনার গতিচক্রে তাহার কেন্দ্রচ্যুত জীবন যে বিরাট শূন্য-পথে ছুটিয়া চলিয়াছিল, সেখানে ডাঃ রায়ের আকর্ষণ ও সহানুভূতি না পাইলে, তাহা তো চিরদিনের মতই লুপ্ত হইয়া যাইত। ডাক্তারের সেই কৃত উপকার ও মহত্ত্বকে অনি শ্রদ্ধা করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই দারুণ আকর্ষণের প্রতিক্রিয়া যেন পূর্ব্বে আর কখনো এমন করিয়া উপলব্ধি করে নাই।

* * * *

বিকালের গাড়ীতে বেয়ারার সঙ্গে সঙ্গেই বনবিহারীবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

রোগীকে যথারীতি পরীক্ষা করিয়া ও বিশেষ মনোযোগের সহিত অবস্থাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বনবিহারীবাবু ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। ডাক্তারেরা নিজের চিকিৎসা নিজে কখনই করেন না—সেটা সংস্কার বা অক্ষমতা যে কোন কারণেই হউক্! সুতরাং বনবিহারীবাবুকেই মেজরের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে হইল।

(৩)

অনির আগ্রহ ও অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বনবিহারীবাবু সে রাত্রে মেজরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই আতিথ্য স্বীকারে বনবিহারীবাবুরও যে বিশেষ ইচ্ছা বা আগ্রহ ছিল না—তাহা বলা যায় না। বনবিহারীবাবু স্বভাবতঃ মিশুক ও সঙ্গীপ্রিয় ছিলেন। নিত্য নূতন বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপনের বেশ একটু নেশা তাঁহার বরাবরই ছিল।

তখন সন্ধ্যা। অনি তখনও মেজরের মাথার কাছে বসিয়া তাঁহার কপালে জলপটী ও বাতাস দিতেছিল। বেয়ারা অনেকক্ষণ আলো জালিয়া দিয়া গিয়াছে। বনবিহারী বাবু বাহিরের খোলা বারান্দায় পাইচারি করিতেছিলেন। মেজরের তখন একটু তন্দ্রাভাব হইয়াছে দেখিয়া অনি বনবিহারী বাবুর চা ও জলখাবারের ব্যবস্থা করিবার জন্য আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

খাবার ও চায়ের বাটী বয়ের হাতে দিয়া অনি ঘরে ফিরিয়া আসিল। বনবিহারী বাবু তখন কোট খুলিয়া ইজি চেয়ারখানার উপর বসিয়া ডাক্তারের রেসপিরেশান্ দেখিতেছিলেন। অনি ও তাহার পিছনে চা-সহ বয়কে দেখিয়া তিনি টেবিলের পাশে উঠিয়া আসিলেন।

বয়ের হাতে এক পেয়ালা চা ও একজনের মত খাবার দেখিয়া বনবিহারী বাবু ঈষৎ উষ্ণতা মিশ্রিত দুঃখের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"নাঃ—অনিমা দেবী, এ তো হ'তে পারে না। এ যে কোন্ দেশী ভদ্রতা তা তো বুঝি না। আমি একা খাবো, আর আপনি বসে' থাক্‌বেন!—সে হ'তেই পারে না। এই বয়! মায়ী-জী-কো চা ঔর খানা কাঁহা? যাও—আভি হিঁয়া লেয়াও—তুরন্ত্…"

বেচারা বয় বিব্রত হইয়া অনির দিকে চাহিতেই অনি হাসিয়া বলিল—"বেচারা রয়কে ধমক্ দেওয়া মিছে। সে ওর বেশী কেক্ বিস্কুটও পাবে না—চা'ও আর নেই। আর থাক্‌লেও যে বিশেষ সুবিধে হ'ত—তা নয়। আমি মোটেই ও-সবের ভক্ত নই! ছেলেবেলা থেকে আজ পর্য্যন্ত চা বিস্কুটের সঙ্গে চাক্ষুষ ভিন্ন ব্যবহারিক সম্বন্ধ কখনই হয় নি। যাক্, আপনি আগে খেয়ে ফেলুন। দেরী ক'রবেন না—চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।"

"তা না হয় খেলুম, কিন্তু সেটা কি ভালো দেখায়। আপনি যখন খান্‌ই না, তখন অবশ্য আমার ব'ল্‌বার কিছুই নেই। কিন্তু ছেলে বেলা থেকে খান্ না ব'লেই যে কখনো ভদ্রতা রক্ষার জন্যেও খাওয়া যায় না—তা আমি মান্‌তে পারি না।" বলিয়াই বনবিহারী বাবু চায়ের বাটীতে একটা চুমক দিলেন।

অনি সে অভিযোগের কোন প্রতিবাদ করিল না দেখিয়া বনবিহারী বাবু একটু জয়ের প্রফুল্লতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"অভ্যস্ত না হ'লেই যে সে কাজটা কখনো ক'র্‌তে হবে না—সেটা লেম্ একস্‌কিউজ্ বা বাজে ওজর ভিন্ন কিছুই নয়; বুঝলেন মিস্!"

অনি বনবিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার অকারণ-জয়োল্লাসের ভাবটা লক্ষ্য করিয়া

মনে হাসিতেছিল। বনবিহারী পুনরায় তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কেমন—মিস্! ওটা মানেন তো?"

"কোন্‌টা?" বলিয়াই অনি অল্প হাসিল।

বনবিহারীবাবু এই হাসির অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় কহিলেন—"এই যেমন বল্‌ছিলেন যে, অভ্যস্ত নন্ ব'লেই চা বিস্কুট ভদ্রতা রক্ষার জন্যেও খেতে পারেন না।"

"অন্যায় অভিযোগ! আমি তো তা বলিনি ক্যাপ্টেন! অভ্যস্ত নই ব'লেই যে ভদ্রতা রক্ষার জন্যেও খাবো না—তা ঠিক্ নয়। কেক্ বিস্কুট ইত্যাদি জিনিষগুলো কোন কালেই আমার বাপ পিতামহ খান্ নি। রোষ্ট-ফাউল-কেক্ যাকে আপনারা হয় তো সুখাদ্য ব'লে মনে করেন, সেটা অন্যের কাছে ঠিক্ তা না হতেও পারে তো! খাওয়ার ব্যাপারটা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের চেয়ে রুচির উপরেই বেশী নির্ভর করে। আমি মাছ মাংস ডিম্ চা ইত্যাদি খাই না। নিজে খাই না ব'লেই যে আমি সেগুলোকে ঘৃণার চোখে দেখি, তা ভাব্‌বেন না। খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে একটু নিয়ম নিষ্ঠা থাকার দরকার। পুরুষেরা না মান্‌লেও, মেয়েদের অন্ততঃ কতকগুলো মেনে চলা উচিত। তা ছাড়া চা একটা নেশার সামিল ব'লে আমি আরো বেশী এড়িয়ে চলি।"

বনবিহারীবাবু সহাস্যে উত্তর করিলেন—"চমৎকার। এ যুক্তি খণ্ডন করা যায় না। তবে বাপ পিতামহ খান্ নি, সুতরাং খাবেন না—এটা নিছক্ সংস্কার। আপনাদের মত শিক্ষিতা আধুনিক মহিলাদের ভিতরেও যে কুসংস্কারের বালাই এখনো এত দৃঢ়মূল, তা জান্‌তুম না।" শেষের কথাটুকু বনবিহারীবাবু বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গেই বলিলেন।

অনি তাঁহার শ্লেষটুকু লক্ষ্য করিয়া দৃঢ় অথচ মোলায়েম ভাবে বলিল—"আমাকে শিক্ষিতা শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করাটাই যে আপনার ভুল হ'য়েছে বনবিহারীবাবু! শিক্ষিতা হ'তে পারি নি বলেই তো কুসংস্কারের মোহগুলো এখনো কাটিয়ে উঠ্‌তে পারি নি। আপনাদের পক্ষে ওগুলো উড়িয়ে দেওয়া যত সহজ হ'য়েছে, মূর্খের পক্ষে তত সহজ কখনই হ'তে পারে না। তা' ছাড়া এগুলোকে কুসংস্কার ব'লে যে আপনারা নিতান্ত ঘৃণা ও অবহেলার চোখে দেখেন—সেটাকেও আমি ঠিক্ ভালো ব'লে মেনে নিতে পারি না। আহার ব্যবহার প্রভৃতি প্রত্যেক কাজের ভিতরেই সামাজিক যে সব বাঁধাবাঁধি আছে—সেগুলোকে আমি সংস্কারের বাঁধন বলি না; সেগুলো হ'চ্ছে সামাজিক বা জাতীয় বিশিষ্টতা। অর্থাৎ আপনি যাকে বলেন—কুসংস্কার, আমি তাকে বলি 'স্বাতন্ত্র্য'। এই স্বাতন্ত্র্য হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সবারই আছে। যার নাই—সে দুর্ব্বল—সে কাপুরুষ।"

কথাগুলির মধ্যে যে বেশ একটু উত্তাপ ছিল, তাহা বনবিহারীবাবুর উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না। কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া তিনি অনির দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহু পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন; বিশেষতঃ হিন্দুয়ানির বিষয় লইয়া কোনো তর্ক বা আলোচনা সুরু হইলে অনি অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিত। নিয়ম-নিষ্ঠা সম্বন্ধে অনির গোঁড়ামির কথা তিনি মেজরের নিকট শুনিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে তর্ক বাধাইবার চেষ্টাও বনবিহারী দুই একবার করিয়াছিলেন। কিন্তু সংযত-স্বভাবা অনি সংক্ষেপে দুই একটী উত্তর দিয়াই তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। অনির মধ্যে এতখানি তেজস্বিতার ভাব তিনি কখনই লক্ষ্য করেন নাই।

বনবিহারীবাবুর স্বভাবের মধ্যে একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি উদ্গত ক্রোধ ও ঘৃণাকেও সহসা হজম করিয়া সরল হাসিতে প্রতিপক্ষকে বিব্রত করিয়া তুলিতে পারিতেন। তাঁহার অস্বাভাবিকরূপে সরল ও বিস্ফারিত চক্ষু দুইটীই ছিল সেই আত্মগোপনের একটা মহৎ প্রচ্ছদপট্।

বনবিহারীবাবু সহাস্যে, তাঁহার বিশাল চক্ষু দুইটীতে রাশীকৃত সরলতার হাসি মাখাইয়া, অনির দিকে চাহিতেই অনি যেন বিশেষ বিব্রত ও লজ্জিত হইয়া উঠিল। বনবিহারীর এই স্বভাবসিদ্ধ কৃত্রিম সরলতার অন্তরালে কিছু ছিল কি না তাহা সে লক্ষ্য করিবার চেষ্টাও করে নাই। বরং সে যে এত সরল ও অপ্রাকৃতিক লোকের নিকট অনর্থক কতকগুলো আবল তাবল বকিয়া ফেলিয়াছে কেন, এই কথা ভাবিয়াই মনে মনে না হাসিয়া পারিল না।

মেজরকে ঔষধ দিবার সময় হইয়াছে দেখিয়া অনি তাড়াতাড়ি রোগীর পার্শ্বে গেল। মেজরের তন্দ্রা ভাবটা তখন চলিয়া গিয়াছিল; তিনি এতক্ষণ শুইয়া শুইয়া অনির নিঃসঙ্কোচ যুক্তির আনন্দটুকু উপভোগ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার দিকে চোখ পড়িতেই অনি একটু লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করিল।

বনবিহারীবাবু ক্ষেত্র বিবেচনা করিয়াই প্রসঙ্গটাকে হঠাৎ উল্টাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প একটু উত্তেজনাতেই অনির যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মুখ চোখের ভিতর যে নিঃসঙ্কোচ ভাবটি ফুটিয়া উঠিতেছিল, সে টুকুকে আরও অবাধভাবে দেখিবার লোভ তাঁহার যথেষ্টই থাকিয়া গেল।

মেজরকে ঔষধ খাওয়াইয়া অনি তাঁহার কপালে হাত দিয়া দেখিল, তখন জ্বরের বেগ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে; কিন্তু সম্পূর্ণ ত্যাগ হয় নাই। ইহাতে সে মনে একটু ভরসা পাইল, জ্বরটা রাত্রের মধ্যেই ছাড়িয়া যাইতে পারে।

আলোটা একটু আড়াল করিয়া দিয়া, অনি জানালার পর্দ্দাগুলি ভালরূপে টানিয়া আট্‌কাইয়া দিল; এবং মেজরকে দেখিবার জন্য বনবিহারীবাবুকে আর একবার অনুরোধ করিয়া তাঁহার রাত্রের আহারের আয়োজন করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল।

মেজর ও বনবিহারী উভয়েই বোধ হয় তখন অনির কথা ভাবিতেছিলেন। অনির তৎপরতা ও চলাফেরা প্রভৃতি প্রত্যেকটী গতিবিধিতেই একটা মাদকতা ছিল। সে মাদকতা মনকে চঞ্চল করার চেয়ে আকর্ষণই করে বেশী।

(ক্রমশঃ)

দীনের দাবী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

মহা ভিড় আজ মন্দির-দ্বারে
বাধিয়াছে বড় কোন্দল
দেবালয়-মাঝ ঢুকিতে যে আজ,
হয়লাক রাজি মণ্ডল।
স্বজাতিরা তার বলে বারবার
সবাই নিয়েছি পৈতে,
লজ্জা ঘৃণায় মাথা হবে হেঁট
বাহিরে দাঁড়ায়ে রইতে।
দেবতার দেহ পরশনে হায়
অধিকারী আজ সর্ব্বে,
সব হিন্দুর হৃদয় ভরেছে
অপূর্ব্ব এক গর্ব্বে।
এত প্রাণপণ সত্যাগ্রহ,
এত যে বিপুল চেষ্টা।
হে অনুরক্ত প্রবীণ ভক্ত,
বিফল হবে কি শেষটা?
মণ্ডল রয় দ্বারে দাঁড়াইয়া
ভীত দুরু দুরু বক্ষে,
গলে নামাবলী বিশাল উরস্,
অশ্রু ঝরিছে চক্ষে।
বলে, দীন মোরা ভিতরে যাইতে
মোটেই মোদের নাইরে,
মোরা সেথা গেলে দীনবন্ধু যে
আসিবে না আর বাইরে।
দেবতা এসেছে যুগ যুগ ধরে
আমাদের মাঝে নিত্য,
কে করেছে দান এত সম্মান,
ভেবে হও স্থির-চিত্ত।
হুজুগ করিয়া মন্দিরে যাব
তাহাতে বাড়িবে মান কি?
দেবতা পরশ করিতে চাইনে
দেবের পরশাকাঙ্ক্ষী।
যাব না ভিতরে, যাব না যাব না
রাজি নই দাবী ছাড়তে,
বলি দিয়া হায় যুগের যুগের
বনিয়াদী আভিজাত্যে।
আমাদের টানে আমাদের দ্বারে
নিজে এসেছেন গঙ্গা,
কেন ছুটে যাব পরশ করিতে
জহ্নু মুনির জঙ্ঘা?
মন্দিরে গেলে মোটেই মোদের
বাড়িবে না জেনো দাম গো;
শ্রীরামের কাছে গুহক যায়নি,
গুহকের কাছে রাম গো।
মোরা রহি যেন চিরদিন ধরে'
মানবের অস্পৃশ্য,
দেবের পরশ-আস্পদ হয়ে
দীন শবরীর শিষ্য।
ভাল আমাদের চল কি অচল
ব্যাকুল নহি তা জান্‌তে,
থাক্ অধিকার আঁখি-জল দিতে
হরির চরণ-প্রান্তে।

সিংহভূমের তাম্রখনি

শ্রীপিনাকীলাল রায়

ছেলেবেলায় ঠাকু'মার কাছে শুনতাম—

"খুকুমণির বিয়ে দোব
হপ্তমালার দেশে,
তারা গাই বলদে চষে,
তারা হীরেয় দাঁত ঘষে,
রুই মাছ আর নাল্‌তের শাক
ভারে ভারে আসে—"

ঠাকু'মা তাঁহার প্রতিশ্রুতি রাখিতে পারেন নি; কারণ, সে দেশে আমার বিয়ে হয় নি। তবে, যাহা না হইলে আজকাল লোকে মেয়ে দিতে চায় না, সেই গোলামীর যোগাড়টা কেমন করিয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে, সেই হপ্তমালার দেশেই সংঘটিত হইয়াছিল, এবং গোলামী করিতে আসিয়া, ঠাকু'মার ঐ ছেলেভোলানো ছড়াটি মনে পড়িয়া গিয়াছিল সেই দিন, যে দিন প্রথম গাই ও বলদের লাঙ্গল-টানা দেখিয়াছিলাম। আর সে দেশের লোক হীরেয় দাঁত ঘষে কি না তাহা যদিও কোন দিন দৃষ্টিগোচর হয় নি, তথাপি উক্ত বাক্যের সার্থকতা সম্ভবতঃ এই যে, সে দেশের পাহাড়গুলি নানা রকম মূল্যবান খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ। আর, সে দেশের সুবর্ণরেখা নদীর রোহিত মৎস্যের উপাদেয় ঝোল্ অদৃষ্টে যখন প্রায়ই জুটিয়া যায়, তখন রোহিত মৎস্যের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোনই কারণ নাই। তবে ঠাকু'মা-বর্ণিত নাল্‌তে শাকের উপর আমার যে উচ্চ ধারণা ছিল, তাহাতে ঐ শাক গলাধঃকরণ করার পর হইতে ও-জিনিষটার উপর যদিও আমার কোন লোভ নাই, তত্রাচ কবিরাজের ব্যবস্থাপত্রে দেখিতে পাই যে, নাল্‌তে শাক যকৃতের ব্যারামে মহৌষধের কার্য্য করে এবং সে-দেশে বিনায়াসে যথেষ্ট পাওয়াও যায়।

বলা বাহুল্য, সে-দেশের ঐ সব পারিপার্শ্বিক বিষয়-গুলির সাহচর্য্যে, ঠাকু'মার ছড়াটি ও তাঁহার মধুর স্মৃতি সচরাচর মনে পড়িয়া যাওয়া যে স্বাভাবিক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; এবং যাঁহার কথায়, ছড়ায় ও উপদেশে আমার শৈশব-চরিত্রের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এই প্রবন্ধটি, আমার সেই স্নেহময়ী ঠাকু'মার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে, নগণ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি মাত্র।

"ইণ্ডিয়ান্ কপার করপোরেশন্ লিমিটেড্—" (Indian Copper Corporation Ld) নামে একটি বিলাতী কোম্পানী সিংহভূমস্থ "মোষাবনি তাম্রখনির" আধুনিক স্বত্বাধিকারী ও "এ্যাংলো ওরিয়েণ্ট্যাল্ মাইনিং করপোরেশন্ লিমিটেড্" (Anglo Oriental Mining Corporation Ld) নামক আর একটি বিলাতী কোম্পানী ইহার "ম্যানেজিং এজেণ্ট" (Managing Agent)। মূলধন, স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক সমস্তই খাঁটি বিলাতের হইলেও ইহার অধিকাংশ কার্য্যই ভারতীয় শ্রমিকদের দ্বারাই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

"মোষাবনি তাম্রখনি" সম্বন্ধে কিছু লিখিবার পূর্ব্বে, এই স্থানটি, সিংহভূম জেলার কোথায় অবস্থিত, সে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ, সে স্থানটি জঙ্গলের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নগণ্য মৌজা বিশেষ; কিন্তু অধুনা কয়েক বৎসরের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র মৌজাটি বৃহৎ জনপদে পরিণত হইয়াছে; এবং কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় নগরের ব্যবসায়ী-মহলে এই স্থানটির নাম আজ বেশ সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত ছোটনাগপুর বিভাগের সামিল এই সিংহভূম জেলা। ধলভূম এই জেলার মধ্যে একটি সুবিস্তীর্ণ পরগণা। এই পরগণার মধ্যে ঘাটশীলা একটি প্রসিদ্ধ স্থান এবং বি, এন্, আর, কোম্পানীর মধ্যবিৎ ষ্টেশন। ঘাটশীলা রাজষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত মোষাবনি একখানি ক্ষুদ্র মৌজা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মোষাবনি মৌজায় একটি তাম্রখনির আবিষ্কার হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাকে ঠিক আধুনিক আবিষ্কার বলা চলে না। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে ইং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ঘাটশীলার রাজা দ্বিতীয় চিত্রেশ্বর দেউ

ধবলদেবের সময়ে, জোসেফ্ মার্শাল্ হেথ্ সাহেব কর্ত্তৃক "রাখা মাইন্স্" (Rakha mines) ও তাহার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কয়েকটি মাইন্স্ আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; এবং ঐ রাখা মাইন্সের মালপত্র (Ores) গালাই করিবার জন্য রাজদহা নামক গ্রামে একটি কারখানাও স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত কারখানার চিম্‌নিটি এখনো দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ও "কালের কুটিল ভ্রূকুটি নিরীক্ষণ করিতেছে।"

আবার মিঃ হেথ্ সাহেবই যে প্রকৃত পক্ষে এই সকল মাইন্সের (mines) আবিষ্কারক, তাহাও ঠিক বলা চলে না। কারণ, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, মহারাজা অশোকের রাজত্ব-কালে, ইহার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মহারাজা অশোকের নামাঙ্কিত তাম্রফলক ও তাম্রমুদ্রা এখনও পাহাড়ে ও জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাম্র-নিষ্কাশন নিদর্শনগুলি (Ore workings and slags) এখনও পার্ব্বত্য অঞ্চলের স্থানে স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বৌদ্ধদের আমলে ভারতের হিন্দুরাজত্বের মধ্যাহ্নসূর্য্য যখন অপ্রতিহত প্রভাবে চতুর্দ্দিকে তাহার নগ্ন কিরণজাল, সুদূর চীন, জাপান, সিংহল, সুমাত্রা, বলি, যাভা প্রভৃতি স্থানে বিকীরণ করিতেছিল, অর্থাৎ যে সময়ে ভারত সর্ব্বপ্রকার উচ্চ আদর্শের আশ্রয়ভূমিরূপে, সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই সময়ে খনিজ সম্পদের উৎকর্ষতায় ভারত যে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। রাখা-পাহাড়, সিদ্ধেশ্বর-পাহাড়, চাপুরী, কেন্‌দাডি, মোষাবনি, ধবনি, পুটুর, ভমরু প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধান করিলে ঐ সকল নিদর্শন প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। কেন্‌দাডি তাম্রখনিতে একটি অতি পুরাকালের "তাম্র-প্রস্তর" (copper-ore) উত্তোলনের গহ্বর (Shaft) আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যদিও সে গহ্বর (Shaft) আজকাল জঙ্গলে ও প্রস্তরে মজিয়া গিয়া দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি আমরা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, সেই ব্যাঘ্র-ভল্লুক-ব্যাল-নিষেবিত ভীষণ জঙ্গল ভেদ করিয়া, গহ্বর-মুখে উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। দেখিলাম গহ্বরের মুখ হইতে ৪।৫ গজ দূরে একটি সুবৃহৎ প্রায় ৩৬ ইঞ্চি মোটা কাষ্ঠদণ্ড (Wooden pillar) ঈষৎ বক্রভাবে পাহাড়ের ভিতরকার ঊর্দ্ধদেশে সংযোজিত (Support) রহিয়াছে। এই কাষ্ঠদণ্ডটি অতিক্রম করিয়া, পাহাড়ের অভ্যন্তরে আর অগ্রসর হওয়া চলে না ; কারণ, আলোকবর্ত্তিকা ভিন্ন সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

সেই স্থানের বাসিন্দা জনৈক মাতব্বর রকমের বৃদ্ধ সাঁওতাল আমাদের পথি-প্রদর্শক ছিল। সে বলিল :—

"সে বহুৎ দিনের কথা বাবু,—মেঝেনীর যখন পহিলে ছানাটা হুলেন্, আমার মনটা লাচি উঠলো। কাঁড় বাঁশ ধুরি, শীকার কুরতে গেলি। আগুবাটে, একটা হুরিণ দেখি, সেটার পেছু পেছু গুড়দালীন্।—তার পিছু, হুরিণটা দুঁড়ি দুঁড়ি আসি, এই রাখাটায় সামালো। হুরিণটা দুঁড়িবার ক্ষণে, কাঁড় জস্ করি, বিঁধি দিলি। লুসিব খারাব বাবু, কাঁড়টা লাগলো নাই, এই কাঠটায় আসি বাজলো। ছ্যাখ্না বাবু, কাঁড়টার চিন্‌হৎটা এখনো দেখাছে। এখন আমার উমের হছে, তিনকুড়ি বছর—তা হো দাগটার তেমনি চেহারা দেখাছে।"

সাঁওতাল মিথ্যা বলে না। দেখিলাম বাস্তবিকই একটা লৌহফলক যেন বহু কাল হইতে কাঠের গায়ে অর্দ্ধ-ভগ্ন অবস্থায় প্রবিষ্ট রহিয়াছে। আর দেখিলাম, সেই কাষ্ঠদণ্ডটিতে কাঠের কোনই চিহ্ন নাই, সমস্তটাই যেন কৃষ্ণবর্ণ শক্ত অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে। কয়লা খনির মধ্যে যে পাথুরে কয়লার পিলার (Pillar) থাকে, এটা যেন কতকটা তাহারই মত দেখিতে।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, কোন্ পুরাকালে এখানে এই তাম্রখনির আবিষ্কার হইয়াছিল এবং তখনও এই আধুনিক কালের মত খনির মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠদণ্ড, পিলারের কাজ করিত (Timbering works as Pillar)। তার পর হিন্দু রাজত্বের ক্রমিক অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের খনিজ সম্পদেরও অধোগতি আরম্ভ হইয়া, শেষে একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছিল।

জাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে, জাতির কত বড় বড় সম্পদ যে কত রকমে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর জাতি তখন পায় না। এই সমস্ত খনিজ সম্পদ, যাহা জাতির একদিন খনিজ শিল্পের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল, সেই মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে,

তথাপি এই আত্মবিস্মৃত পরাধীন জাতি, সেই তীব্র আঘাত-জনিত যন্ত্রণাকে ক্রমশঃ সহনশীল করিয়া লইয়া, পিপীলিকা-দংশনের ন্যায়, সেটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে নি। যে জাতি এক দিন অসাধ্য সাধন করিয়াছে, সেই জাতি যদি কোন রকমে একবার পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ হয়, তখনই সে ক্রমে ক্রমে আত্মবিস্মৃত ও জীবন্মৃত হইয়া পড়ে। রামচন্দ্র আত্মবিস্মৃত ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে সীতা উদ্ধারে অতটা বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিনি যে কী, তাহা যদি তিনি জানিতেন, তাহা হইলে সীতা উদ্ধার তো একটি লহমার ওয়াস্তা! ভেবে দেখ সেই রামচন্দ্রের দেশের আত্মবিস্মৃত জাতি, তুমিও আজ সেই পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রাম-চন্দ্রের মতই সমভাবাপন্ন নও কি? দেবতারাও আত্ম-বিস্মৃত হইলে শক্তিহারা হইয়া পড়েন।

অধুনা বহু শতাব্দী পরে বৃটিশ বণিকদের স্বাভাবিক অধ্যবসায় ও কর্ম্মকুশলতায় ভারতের সেই প্রনষ্ট গৌরব পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের রাজার জাতি, এই যে এত বড় লুপ্ত প্রতিষ্ঠানটিকে খাড়া করিয়া তুলিতে, লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী টাকা নিজের দেশের দশের নিকট হইতে আনিয়া, অকাতরে জলের মত খরচ করিয়া, প্রতিষ্ঠানটিকে সাফল্য-মণ্ডিত করতঃ হাজার হাজার বেকারের অন্নসমস্যার সমাধান করিয়া দিতেছেন, ইহা স্বচক্ষে না দেখিলে ইহার স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন। এই এত বড় প্রতিষ্ঠানটিকে খাড়া করিয়া তুলিতে শুধু যে তাঁহারা অজস্র অর্থ ব্যয়ই করিতেছে, তাহা নহে ; পরন্ত সেই সঙ্গে বৃটিশ জাতি আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে, যে অসাধ্য সাধন হাতে-কলমে করিয়া দেখাইয়া দিয়া, জগতের সম্মুখে আমা-দিগকে মানুষের কাঠামো লইয়া খাড়া হইতে শিক্ষা দিয়াছে, ও যাহার অনুপ্রেরণায় আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ভারতের মধ্যে, যে স্বাধীনতার স্পৃহা আজ, আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া উঠিয়াছে,—তাহার মূলীভূত কারণই হইতেছে,—কিঞ্চিন্যূন দুই শতাব্দী কাল যাবৎ, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান জাতি বৃটিশের সহিত সহযোগিতা ও তাহাদের কর্ম্মানুরক্তি, উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায়, স্বাব-লম্বন প্রভৃতি গুণ-নিচয়ের পক্ষপাতিতা।

এই যে পঞ্চমুখ হইয়া লেখক বৃটিশ জাতির গুণ-কীর্ত্তন করিতেছে, ইহাতে হয় তো রাজনীতিবিদেরা লেখকের উপর খড়্গহস্ত হইতে পারেন ; কিন্তু এই প্রবন্ধটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ নয়, এটা যেন তাঁহারা স্মরণ রাখেন। হইতে পারে, তাঁহারা নিজেদের স্বার্থ ষোল আনা বজায় করিয়া, এই সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ভারা প্রয়োজন যে, তাঁহাদের স্বার্থের সঙ্গে আমাদের স্বার্থও অনেকটা আপনা আপনি প্রায় তুল্যমূল্য ভাবেই জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে ; সুতরাং তাঁহাদের যে দিকটা প্রকৃতপক্ষে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে দিকটাকে কোন রকমেই দাবিয়ে রাখা চলে না। দেশের নষ্ট-গৌরব পুন-রুদ্ধারের চেষ্টা একটা মহৎ গুণের পরিচায়ক। হৌক না সে বিদেশী, আর হৌক না সে "কামস্কটকা" কিম্বা "হোনোলুলুর" অধিবাসী, কিম্বা থাক না তাহাদের মধ্যে স্বার্থের প্রলুব্ধতা, তাহাতে কি আসে যায়? আমরা যে কাজ পারি না, তাহারা যদি তাহাই সম্পাদন করিয়া আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেয়, তাহাতে যে আমরা কম লাভবান নহি, তাহা গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ অকপটে স্বীকার করিতে বাধ্য।

"বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী"র ঘাটশীলা ষ্টেশন হইতে প্রায় ছয় সাত মাইল দক্ষিণে "মোষাবনির তাম্রখনি"। মধ্যে বিশালকায়া পবিত্র-সলিলা পার্ব্বত্য নদী সুবর্ণরেখা। ঘাটশীলা ষ্টেশন হইতে খনির অভিমুখে যাইতে হইলে, প্রথমে প্রায় এক মাইলের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই নদীটি গমনপথ রোধ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তার পর ওপারে (দক্ষিণ পারে) ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আমাই নগর। যেখানে একদা প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, ময়ূর-ভঞ্জের রাজা, ধলভূম রাজ্য আক্রমণার্থ যুদ্ধঘোষণা করিয়া, উক্ত স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন। আমাইনগরের ঠিক অপর পারে ধলভূমরাজের বিশালকায় রাজপ্রাসাদ। ময়ূর-ভঞ্জাধিপতি শিবির হইতে বাহির হইয়া প্রত্যূষেই নদীতে স্নান করিতে নামিয়াছেন, এই বার্ত্তা, দিগ্বিজয়ী তীরন্দাজ ধলভূমের অন্ধ নৃপতি নরসিংহ ধবল দেউ চরমুখে জানিতে পারিয়া, প্রাসাদোপরি হইতে একটি শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই শব্দভেদী বাণ ময়ূরভঞ্জেশ্বরের মস্তকে না পড়িয়া, স্নানার্থ ব্যবহার্য্য জলপাত্র মধ্যে সশব্দে নিপতিত হইল। নরপতি তীরখানি লইয়া দেখিলেন, তীরফলকে লেখা রহিয়াছে—"অন্ধ নরসিংহের কাঁড়, যার শিরে পড়িবে

তার স্ত্রী হইবে রাঁড়।" ময়ূরভঞ্জরাজ এই অদ্ভুত কৃতিত্ব দর্শনে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ আমাইনগরের শিবির ভগ্ন করিয়া, স্বরাজ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

যে আমাইনগর একদা ধলভূম রাজ্যের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, কালের অপ্রতিহত গতিতে, সেই সমৃদ্ধিশালী নগর এক্ষণে কয়েকঘর মৎস্যজীবী জেলের বাস-স্থানে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এই আমাইনগর হইতে "মোষাবনির তাম্রখনি" প্রায় পাঁচ ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সেখানে যাইবারও কোন অসুবিধা নাই। আজকাল ট্যাক্সি ও মোটর বাসের কল্যাণে, দুর্গম পাহাড় জঙ্গলেও মানুষ পায়ে হাঁটার ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে।

সুবর্ণ-রেখার উত্তর তীরে মৌভাণ্ডাড় নামক স্থানে, এই কোম্পানীর কারখানা (work-shop) ও জেনারেল অফিস (General office) স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানটি বি, এন্, আর, কোম্পানীর ষ্টেশন ঘাটশীলা ও গালুডির মধ্যস্থলে অবস্থিত। যে স্থান একদিন শ্বাপদ-সঙ্কুল ও দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ ছিল—দিন দুপুরেও যেখানে যাইতে লোকে সাহসী হইত না, সেই স্থানের আজ হঠাৎ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যেন কোন্ যাদুকরের যাদুদণ্ডের স্পর্শে, সেই নিবিড় অরণ্যাণী কোথায় অন্তর্হিত হইয়া, তথায় জনকোলাহল-মুখরিত বৃহৎ এক জনপদে পরিণত হইয়াছে। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে যে পান্থ এই স্থানের নিকট দিয়া যাইবার সময় ইহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া গিয়াছে, সে যদি আজ পুনরায় এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয় মনে করিবে যে, হয় তো সে পথ হারাইয়া এক বৈদ্যুতিক আলোকমালা-ভূষিত দৈত্য-পুরীতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে; কিম্বা হয় তো সে ভাবিবে যে, এটা নিশ্চয়ই সেই "আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপেরই" কাণ্ড! কিন্তু যখন সে জানিতে পারিবে, প্রকৃত পক্ষে এই পুরীর রচয়িতা কে, তখন কি এই বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় কর্ম্মকুশল জাতির প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় তাহার শির অবনমিত হইবে না?

এই স্থানের নৈসর্গিক দৃশ্য এত মনোরম ও চিত্তাকর্ষক যে, দেখিলে মনে হয়, ভগবান তাঁহার ঐশ্বর্য্যসম্ভার, মরি মরি, কি সুনিপুণ হস্তেই সাজাইয়া রাখিয়াছেন! চক্রবাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকটা, খালি প্রকৃতিরাণীর সবুজ অঞ্চল দিয়া ঢাকা, আর তাহার মধ্য দিয়া পার্ব্বত্যনদী সুবর্ণরেখা যেন প্রকৃতিরাণীর সিঁথীর ন্যায় লীলায়িতা। অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণবর্ণ লোহিত রশ্মি, পাহাড়ের শীর্ষদেশ চুম্বন করিয়া যখন নদীবক্ষে প্রতিফলিত হয়, তখনকার সেই ঢল ঢল সৌন্দর্য্য, বিবাহবেশে সজ্জিতা নববধূর চেলাঞ্চলের মাধুরিমা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই স্বর্গীয় সুষমা বর্ণনার অতীত—বরং উপভোগের সামগ্রী!

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মৌভাণ্ডার কারখানাটি নদীর উত্তর তীরে স্থাপিত। খনি হইতে উত্তোলিত "তাম্রপ্রস্তর" (Copper ore) "বৈমানিক রজ্জুমার্গ" দ্বারা (Aerial Rope-Way) ৬ মাইল দূরবর্ত্তী মোষাবনি হইতে এই কারখানায় আনীত হয়। এই নূতন ধরণের প্ল্যাণ্ট্টি (Plant) স্থাপন করিয়া ব্যবসা-বুদ্ধিতে পরিপক্ক বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারগণ তাহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে। এই "বৈমানিক রজ্জুমার্গ" দ্বারা খনি হইতে যে কেবল "তাম্র-প্রস্তরই" (Copper ore) আসিতেছে তাহা নহে; পরন্তু খনি-পরিচালনার্থ যে কোন সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহা সমস্তই, ইহার দ্বারা তথায় প্রেরিত হইতেছে। মোটের উপর এই পার্ব্বত্য-প্রদেশে, মালবাহী কোন যানই, ইহার ন্যায় কার্যকরী হইতে পারিত না এবং কেবলমাত্র এই মালপত্র যাতায়াতের অসুবিধাতেই, এখানে কারখানা স্থাপন করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। আমার মনে হয়, "কেপ্ কপার কোম্পানীর রাখা মাইনস" (Rakha mines) বহু চেষ্টা করিয়াও যে এ দেশে সফলকাম হইতে পারে নাই, তাহার একটি মুখ্য কারণই হইতেছে মালপত্র যাতায়াতের (Transporting) অসুবিধা।

যাহা হউক "কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে" এই নীতি অবলম্বন করিয়া, কোম্পানী আজ যে আদর্শ প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা কয়েকটি বিষয়ের নূতনত্বে, অত বড় টাটা কোম্পানীর চেয়েও আধুনিকতায় (up to date) অগ্রণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

যে সমস্ত "তাম্র-প্রস্তর" (Copper-ore) খনি হইতে উত্তোলিত হয়, সেই সমস্ত প্রস্তর সর্ব্বাগ্রে, "প্রাইমারি ক্রাশার মেসিনের" (Primary Crusher machine)

সাহায্যে চূর্ণীকৃত হইয়া থাকে। তার পর লৌহ-নির্ম্মিত এক প্রকার "হ্যাংইং বাকেটে" (Hanging Bucket) সেই সমস্ত চূর্ণ প্রস্তর মেসিনের সাহায্যে বোঝাই হইবামাত্র বাকেট-সংলগ্ন হুক্‌গুলি (Hooks) আপনা আপনি (automatically) বৈমানিক রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে অগ্রসর হইতে থাকে। এক একটি মালবাহী বাকেট্ প্রায় তিন কি চারি হন্দর পরিমাণ মাল বহন করিয়া আনিয়া প্রতি এক মিনিট কিম্বা দেড় মিনিট অন্তর মৌভাণ্ডাড়ের কারখানাস্থ "ওর বিনে" (Ore-Bin) ঢালিয়া দিতেছে। এই "ওর বিন্" (Ore-Bin) এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, মালবাহী বাকেট্‌টি ঝুলিতে ঝুলিতে যেই "ওর বিনের" (Ore-Bin) উপরে আসিয়া পৌঁছিবে, অমনি সেই মুহূর্ত্তেই বাকেট্-টি উল্টাইয়া যাইবে, ও সঙ্গে সঙ্গেই বাকেটস্থ মালগুলিও "ওর বিনের" মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে যেন মালগুলি বাকেট হইতে আপনা আপনিই "বিনের" মধ্যে পড়িয়া গেল।

এই সমস্ত "তাম্র-প্রস্তর" (Copper-ore) "ওর বিন্" (Ore-Bin) হইতেই সর্ব্বপ্রথম "হার্ডিন্ বল মিলে" (Hardinge Ball Mill) প্রেরিত হয়। এই বিভাগটি (plant) চারি ভাগে বিভক্ত—গ্রাইণ্ডিং (Grinding) ফ্লোটেশন (Flotation) ফিল্‌টারিং (Filtering) ও ড্রাইং (Drying)। প্রথমতঃ তাম্র-প্রস্তরগুলি গ্রাইণ্ডিং মেসিনে গুঁড়া হইয়া আপনাআপনি (automatically) ফ্লোটেশনে (Flotation) উপনীত হয়। এই ফ্লোটেশনের কার্য্য হইতেছে, প্রস্তর-সংশ্লিষ্ট তাম্রকণাগুলি নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তর হইতে পৃথক করা। এই তাম্র ও প্রস্তর কণিকাগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও তরল কাদার আকারে এক সঙ্গেই মিশিয়া থাকে। তার পর এই তরল অবস্থায় সেগুলি "ফিল্‌টারিংএ" গিয়া উপনীত হয়। "ফিলটারিংএর" কার্য্য হইতেছে প্রস্তর হইতে তাম্রকণাগুলি ছাঁকিয়া লওয়া। ছাঁকিয়া লইলেই যে খাঁটি তাম্রকণা পাওয়া যাইবে তাহা নহে, পরন্তু বহুল প্রস্তর কণিকাও তাহার সঙ্গে মিশিয়া থাকিবে। এই রকম অবস্থাতেই সেগুলি "ড্রাইং সেক্‌শনে" (Drying Section) চলিয়া যায়। ড্রাইংএর কাজ হইতেছে, সেগুলিকে শুষ্ক করিয়া বালুকাকারে পরিণত করা।

এইখানেই মিলের কাজ শেষ। এখন এই মিল হইতে যে "ওরগুলি" বাহির হইল, তাহার নাম হইতেছে "কন্‌সেন্‌ট্রেটেড্ ওর" (Concentrated ore) পরে, এই "ওরগুলি" "কনসেনট্রেট্ কারে" (Concentrate Car) বোঝাই হইয়া, ইলেকট্রিক লিফটের (Electric Lift) সাহায্যে "বেডিং বিনে" গিয়া উপনীত হয়। এইবার গালাই হওয়ার (Smelting) পালা:—

মিলের ন্যায় "স্মেলটিং" বিভাগও পর পর তিনটি ভাগে বিভক্ত:—রিভারবারেটোরি ফারনেস (Reverberatory furnace) কন্‌ভারটার (Converter) এবং রিফাইনারি ফারনেস (Refinery furnace)।

ওরগুলি কন্‌সেন্‌ট্রেট্ কারে বোঝাই হইয়া বেডিং বিনে

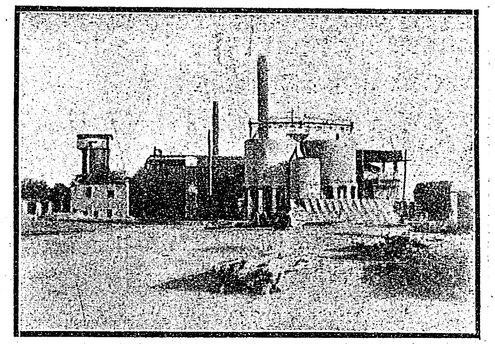

মৌভাণ্ডারের কারখানা
এখানে "কপার-ওর" চূর্ণ করা হয়। এটি কারখানার সাধারণ দৃশ্য। সামনেই শূন্যে রোপ-ওয়ে। এই তারের উপর দিয়া "ওর"-বোঝাই ঝোড়া হইতে "ওর" নামাইয়া দেওয়া হইতেছে

(Bedding Bin) উপনীত হইবামাত্র "রিভারবারেটোরি ফারনেসে" ঢালিয়া দেওয়া হয়। ওরগুলি এই "ফারনেসে" গালাই হইয়া তামার অংশ নীচে থিতাইয়া যায় এবং কতক ময়লা (Slags) যাহা উপরে থাকে, তাহা তরলাকারে বাহির হইয়া যায়। অবশিষ্ট অংশ যাহা তরলাকারে ফারনেসে থাকিয়া যায় সেগুলি বড় বড় ষ্টীলের বালতিতে (Ladle) ভর্ত্তি হইয়া, ওভারহেড ক্রেনের (Overhead crane) সাহায্যে কন্‌ভারটারে (Converter) ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই কন্‌ভারটারেও সমস্ত ময়লা বাহির হইয়া

যায় না, কতকটা থাকিয়া যায়। সুতরাং কনভারটার হইতে যে তামা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করার্থ আর একটি "ফারনেসে" চার্জ্জ (Charge) করিতে হয়। এই ফারনেসের নাম "রিফাইনারি ফারনেস" (Refinery furnace)। এই ফারনেসে সমস্ত ময়লা (Slags) তামা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া যায় এবং এই তামাই "বিশুদ্ধ তামা" বলিয়া পরিগণিত (Refined Copper)। এই বিশুদ্ধ তামা যখন বাহির হয়, তখন তরলাকারে থাকে। তার পর তাহা ছাঁচে (Mould) ঢালিয়া ইষ্টকাকারে (Ingot) পরিণত করা হয়।

অধুনা প্রত্যেক দিন এই রিফাইনারি ফারনেস্ (Refinery furnace) হইতে প্রায় ১২।১৩ টন বিশুদ্ধ

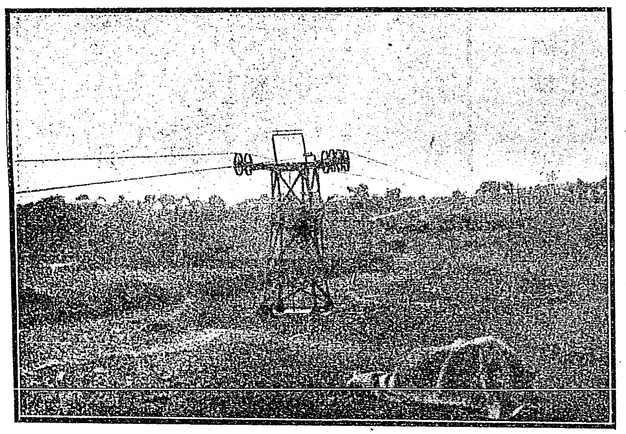

মোষাবনির সাধারণ দৃশ্য—এইখানে খনির মুখ অবস্থিত

তামা উৎপন্ন (Production) হইতেছে। এই সমস্ত তামা বিক্রয় করিবার জন্য কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী "মেসার্স গিল্যাণ্ডার আরবুথনট্ এণ্ড কোম্পানী (Messrs Gillanders Arbuthnot & Co.) ইহার "সোল্ সেলিং এজেণ্ট" (Sole selling-agent) নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতার বাজারে আজকাল যে তামার ইন্‌গট্ (Ingot) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রায় সমস্ত এই কোম্পানীরই তামা।

আর একটি নূতন "প্ল্যাণ্ট" (Plant) এই কোম্পানী স্থাপন করিয়াছে,—তাহার নাম "রোলিং মিল প্ল্যাণ্ট" (Rolling Mill Plant)। এখানে যে কোন প্রকারের পিতলের শিট্ ও প্লেট্ (Sheet & Plate) তৈয়ার হইতেছে। তামার সহিত দস্তা (Zinc) মিশাইলেই পিতলের (Yellow Metal) উৎপত্তি হয় ইহা সকলেই জানেন। কোম্পানীর নিজস্ব তামায়, এই যে পিতলের উৎপত্তি, ইহাতে কোম্পানী যেরূপ লাভবান হইতেছে, তামা অন্যের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া পিতল তৈয়ার করিতে গেলে, আজকালকার বাজারে, কোম্পানীর লাভ হওয়া দূরে থাক্, বরং লোকসান হইবারই বেশী সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কোম্পানীর নিজের প্ল্যাণ্ট (Plant) হইতে তামার উৎপত্তি হইতেছে বলিয়া, সে আজ বাজারে অন্যের চেয়ে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে ও সস্তায় কিস্তি মারিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহারা যে কোন আকারের পাতলা শিট্ (Sheet) হইতে মোটা প্লেট (Plate) পর্য্যন্ত অর্ডার অনুযায়ী তৈয়ার করিয়া দিতে পারে। পিতলের এই শিট্ ও প্লেট (Sheet & Plate) ভারতে ও ভারতের বাহিরে দিন দিন যে রকম সমাদর লাভ করিতেছে ও চাহিদার বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, ভারতের বাহির হইতে পিতলের শিট্ ও প্লেটের আমদানী, ভবিষ্যতে একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা বেশী।

আজকাল প্রত্যেক মাসে কোম্পানীর ৩৫০ টন বিশুদ্ধ তামা উৎপন্ন হইতেছে। এবং কোম্পানী বিশেষ রকম চেষ্টা করিলে মাসে ৫০০ টন পর্য্যন্ত তামা উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বেশী তামা কোম্পানীর এই বর্ত্তমান Plant হইতে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়। তাহা হইলে প্ল্যাণ্টটি আরও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন।

এ দেশে পূর্ব্বে যে প্রকারে তামা উৎপাদন হইত তাহার কতকটা বিবরণ, যাহা আমি দীর্ঘকাল এ দেশে অবস্থান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠকপাঠিকাদের গোচর করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, ইহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাম্র উৎপাদন করার পুরাকালের পদ্ধতির সহিত আধুনিক প্রণালী তুলনা করিলে, আকাশ-পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হইবে।

জগৎ স্বভাবতঃই পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু জড়বিজ্ঞান এই

জগৎকে এত দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল করিয়া, তাহাকে উন্নতির এত ঊর্দ্ধে লইয়া গিয়াছে যে, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে সে স্থানের কোন নামগন্ধই জানা ছিল না। এইজন্য বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক, স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সময়ে সময়ে বলিতেন যে, পূর্ব্বের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, পশ্চিমের জড়বিজ্ঞানের সহিত যদি কখনো সংমিলিত হয়, তাহা হইলে, এমন এক ভাবসম্পদপূর্ণ শক্তিশালী অভিনব বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইতে পারে, যাহার ফলে, সমগ্র জগৎ হয় তো একদিন, মন্ত্র-শিষ্য হইবার জন্য, ইহাদের পাদ-পীঠতলে সমবেত হইতে কুণ্ঠা বোধ করিবে না। সেই মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে কি না জানি না, কিন্তু কখনো কখনো মনে হয়, কোন্ দূরাগত সঙ্গীতের ক্ষীণতম সুরের রেশ বায়ুহিল্লোলে ভাসিয়া আসিয়া, যেন কর্ণ-পটাহ তাহার মধুর 'পরশ' দিয়া যাইতেছে!

বৌদ্ধযুগে জড়বিজ্ঞানের একবার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ভাস্করাচার্য্য, অম্বুজাক্ষ শিরোমণি, প্রভৃতি মনীষিগণ তাহার প্রমাণ; এবং সেকালে এতদ্দেশে যে প্রচুর তাম্র উৎপন্ন হইত তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। কিন্তু তখন এই তাম্র উৎপাদন-প্রণালী কিরূপ ছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে, তাহার পরবর্ত্তী যুগে, কুটীর শিল্পের মত, কিরূপে অতি ক্ষুদ্র প্রণালীতে, এই কার্য্য পরিচালিত হইত, তাহারই একটা মোটামুটি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথমতঃ তাম্র-প্রস্তরগুলি (Copper-ores) ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া তাহার সহিত গোবর (Cow-dung) মিশানো হইত। যেমন করিয়া হিন্দুস্থানীরা হাতে টিপিয়া রুটি প্রস্তুত করে সেই রকমভাবে সেগুলি এক একখানি ৫ ইঞ্চি লম্বা ও সওয়া ইঞ্চি চওড়া করিয়া লইয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লওয়া হইত। পরে চারি ফুট চওড়া ও দেড় ফুট উচ্চ একটি গোলাকার স্তূপের আকারে সেগুলি সাজাইয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইত। পরদিন প্রাতঃকালে দেখা যাইত, সেগুলি সারারাত্রি পুড়িয়া রক্তবর্ণ অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে। পরে সেই "কপার ওর" গুলি (Copper-ores) একটি ক্ষুদ্র ভাটায় (Blast furnace) কাঠ কয়লা (Charcoal) ও হস্ত-হাফরের (Hand Bellows) সাহায্যে, গালাই (Smelting) করা হইত।

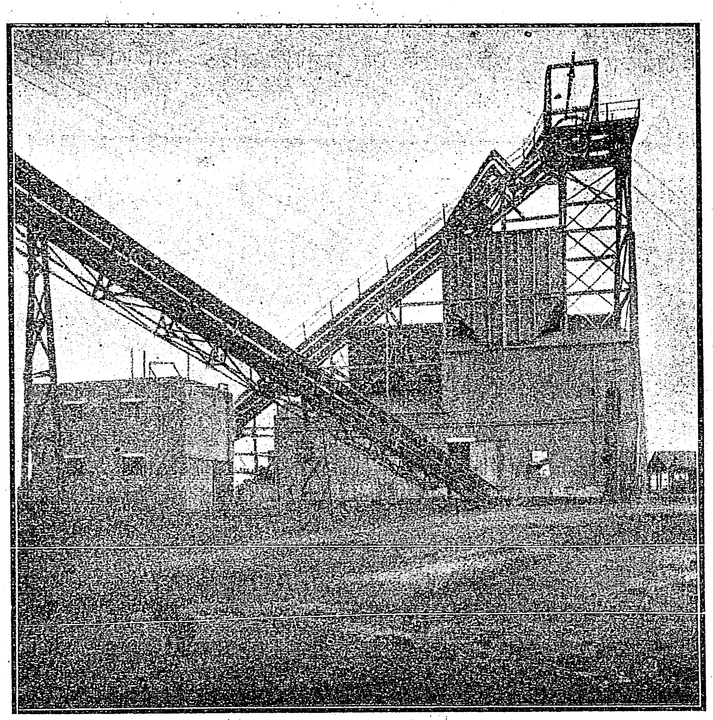

মোষাবনির খনি

এই ভাটাটি গোলাকারে তৈয়ার করিয়া তাহার তলদেশে কিয়ৎ পরিমাণ খাঁটি বালি বিছাইয়া দেওয়া হইত, আর ভাটার ঠিক মধ্যস্থলে একটি গোলাকার গর্ত্ত ১২ ইঞ্চি হইতে ১৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত চওড়া (Di meter) এবং দুই ইঞ্চি হইতে তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত গভীর (Deep) করিয়া লইয়া তাহারও তলদেশে ঐ বালি পূর্ব্বোক্ত রূপে ছড়াইয়া দিয়া, তাহার উপর আর এক স্তর গুঁড়া ছাইএর প্রলেপ দেওয়া হইত। কাঠকয়লার উত্তাপ স্বভাবতঃই খুব বেশী;

এবং স্থায়ীভাবে সমপরিমাণ উত্তাপ অনেকক্ষণ ধরিয়া দিতে পারে। তার পর, ছাইয়ে আল্‌কালি (Alkali) থাকায় সেও উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে কম সাহায্য করে না; তার উপর বালির সংযোগে উত্তাপ আরও বৃদ্ধি পায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাফরের কাজও (Blasting) চলিতে থাকে; সুতরাং এই সমবেত উত্তাপে, কঠিন যে প্রস্তর, সেও ভাটার মধ্যে গলিয়া গিয়া, সম্পূর্ণ তরলাকারে টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করে।

ভাটার চারি ধারে চারিটি গোলাকার গর্ত্ত (Nozzles) এমন বক্রভাবে খনন করিতে হয় যেন ভাটার সহিত সেগুলির সংযোগ থাকে। এই গর্ত্তগুলির তিনটিতে

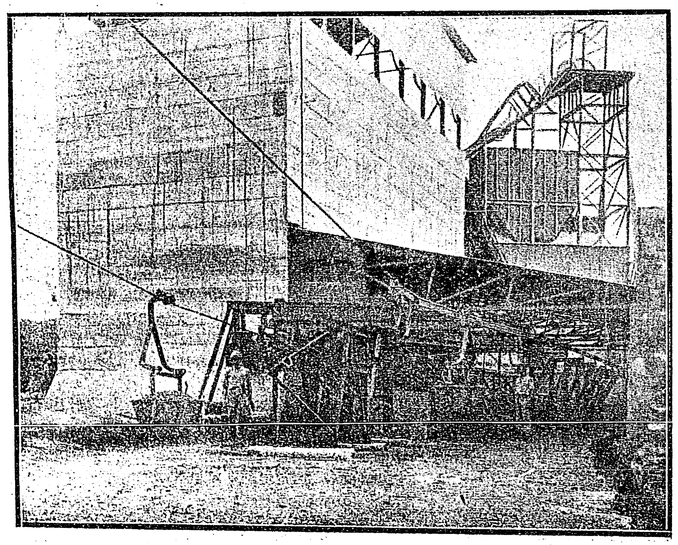

শূন্যে তারের পথ

মোসাবনির খনি হইতে উত্তোলিত "ওর" এখানে গাড়ীতে বোঝাই দেওয়া হয় তিনটি হাফর (Hand Bellows) ভাটায় বাতাস দিয়া (Blasting) উত্তাপ বৃদ্ধি করিবার জন্য সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয় এবং চতুর্থ গর্ত্তটি একেবারে খোলা থাকে। সেই মুখ দিয়া গলিত ময়লা (Slags) বাহির হইয়া যায়, আবার দরকার হইলে এই মুখটি সময়ে সময়ে কাদা দিয়া বন্ধ করিয়াও রাখিতে পারা যায়।

একটি ভাটায় এক দিনে ৯।১০ ঘণ্টার মধ্যে সাধারণতঃ আড়াই মণ গোবর মিশ্রিত "পোড়ানো ওর" (Burnt Ore) গালাই করিবার জন্য, তিন মণ কাঠকয়লা অর্দ্ধমণ ঘুঁটে ও দুইমণ "লৌহপ্রস্তর" (Iron-Ore) দরকার হইত। প্রত্যেক ভাটায় চারিজন হিসাবে শ্রমিকের দরকার হইত এবং এই কাজ এতদ্দেশে তখন কুটীরশিল্পের মত এক একটি পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একজন গৃহস্বামী, তাহার স্ত্রী ও দুইটি পুত্র থাকিলেই একটি ভাটার কাজ তাহারা নিরাপত্তিতে চালাইয়া লইত এবং এই সম্মিলিত পরিশ্রমে, একটি পরিবারের মাসে প্রায় ১৫।২০ টাকা উপার্জ্জন হইত। "শরাক্" নামে এক জাতি পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া তাহাদের অস্থায়ী বাসভবন নির্ম্মাণ করতঃ এ দেশের বনজঙ্গলে বসবাস করিত এবং তাহাদের মধ্যেই এই ব্যবসাটি তখন বেশীর ভাগ প্রচলিত ছিল। তার পর কি কারণে এই ব্যবসা সম্বন্ধে ধলভূম-রাজের সহিত মনোমালিন্য ঘটায়, তাহারা চিরদিনের জন্য এ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং কুটীরশিল্পের আকারেও যাহার অস্তিত্বটুকু কোন রকমে বজায় ছিল, তাহাদের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে সেটুকুও, নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এই ভাটা (Blast furnace) হইতে যে তামা বাহির হইত তাহা বিশুদ্ধ তামা নহে। তাহাতে অনেকটা ময়লা (Slags) থাকিয়া যাইত। পরদিন প্রাতঃকালে এই ভাটা হইতে সেই ময়লা তামা বাহির করিয়া লইয়া আর একটি ক্ষুদ্র ভাটায় (Refineny furnace) সাজানো হইত। এই ভাটায় দুইটি মুখ থাকিত (Nozzles)- একটি মুখ দিয়া ময়লা বাহির হইত ও অপরটিতে একটি হাফর (Bellows) দ্বারা ভাটায় বাতাস দেওয়া হইত। এই ভাটা হইতে বিশুদ্ধ তামা বাহির করিবার পূর্ব্বে একপ্রকার গাছের রস ভাটার মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হইত। সেই গলিত ও ফুটন্ত তামার সহিত এই রসের সংমিশ্রণে এমন একটা রাসায়নিক ক্রিয়ার উদ্ভব হইত যাহার ফলে

সমস্ত ময়লা উপরে ভাসিয়া উঠিয়া উপরের খোলা মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইত এবং খাঁটী তামাটুকু (যাহা ময়লা অপেক্ষা স্বভাবতঃই ভারী) নীচে সঞ্চিত হইত। যেমন, অনেকেই দেখিয়াছেন, চিনি ভিয়ানের সময়, তাহা হইতে ময়লা বাহির করিবার জন্য দুধে জল মিশাইয়া, সেই জলমিশ্রিত দুগ্ধের প্রক্ষেপ দেওয়া হয়; যাহাকে চলিত কথায় ময়রারা বলে "চিনির গাদকাটা।" এই রসের দ্বারা তামার ময়লা বাহির করার প্রক্রিয়াও ঠিক একই রকমের বলিয়াই মনে হয়।

ভাটা হইতে সমস্ত ময়লা বাহির হইয়া গেলে, অবশিষ্ট

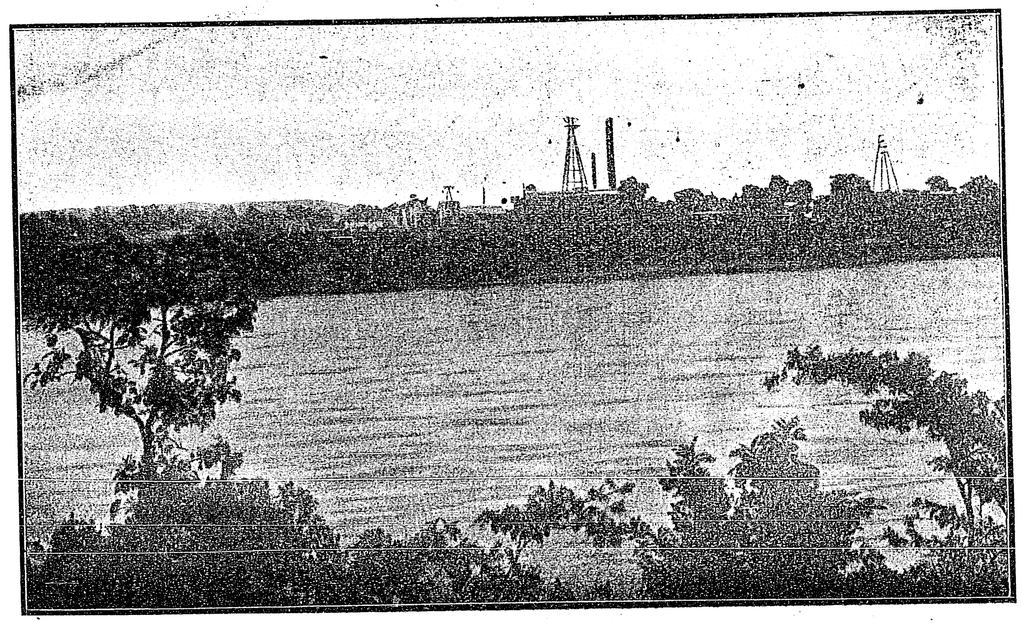

মোভাণ্ডারের কারখানা—সাধারণ দৃশ্য—(সুবর্ণরেখা নদীর অপর পার হইতে গৃহীত চিত্র)

যে তরলাকার বিশুদ্ধ তামা পাওয়া যায়, তাহা কাদায় নির্ম্মিত ছোট ছোট ছাঁচে (moulds) ঢালিয়া, তামার ইন্‌গট্ (Ingot) তৈয়ার করা হইত। ইন্‌গটগুলি ওজনে হইত প্রায় দুই সের ও সেগুলির রঙ হইত—উজ্জ্বল লালিমাভ (Brittce & Lilac coloured).

এই কুটীর শিল্পের পূর্ব্বযুগ হইতেছে বৌদ্ধযুগ। তখন কি প্রণালীতে তামার প্রজনন চলিত সে সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ আজকাল আর পাওয়া যায় না; তবে, সেই বৌদ্ধ যুগেও যে এতদ্দেশে প্রচুর তাম্র উৎপাদনের কাজ চলিত তাহার নিদর্শন—পর্ব্বতাকারে পুঞ্জীভূত তামার ময়লাগুলি (Slags)।

বৈদিক যুগেও তামার প্রচলন ও প্রজনন যে এ দেশের পার্ব্বত্য-অঞ্চলে ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণী ভারতের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকিয়া, ভারতের পশ্চিম প্রান্তে তাহার অভ্রংলিহ শির উত্তোলন করতঃ ক্রমে ক্রমে সেই শির সঙ্কোচন করিতে করিতে, ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়া, সিংহভূম জেলার শেষপ্রান্তে সমতলে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির এই যে লুকোচুরী, এটা ভাবুক হৃদয়কে স্বভাবতই ভাববিহ্বল করিয়া, অজানা দেশের কত "অজন্তার" যে সন্ধান আনিয়া দেয়, তাহা শুধু কবি-কল্পনার খোরাকী নয়, প্রত্যুত বাস্তব রাজ্যেও তাহার দর্শন মিলে।

এই বিন্ধ্য পর্ব্বতশ্রেণী হইতে একটি তাম্রপ্রস্তরের স্তর পশ্চিম দিক হইতে বরাবর পূর্ব্বাভিমুখে সিংহভূম পর্য্যন্ত আসিয়া, পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে, এই স্তরটিরও অস্তিত্ব লোপ পাইয়া গিয়াছে। ইয়োরোপের খনি-

তত্ত্ববিদেরা সিংহভূমের তাম্রপ্রস্তর স্তরের এই অংশের নাম দিয়াছে "সিংভূম কপার বেল্ট" (Singbhum copper Belt)।

এই তাম্রপ্রস্তরের স্তর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোথায় আরম্ভ হইয়াছে ও কোথায় ইহার শেষ, তাহার সঠিক খবর বসুন্ধরার ভিতর হইতে কে দিতে পারে? তবে বৈদেশিক খনিতত্ত্ববিদেরা যন্ত্রপাতির সাহায্যে, এই সকল পর্ব্বত-শ্রেণীর নানা স্থান খনন (Boring) করিয়া, কোনো কোনো স্থানে এই "কপার বেল্টের" অনুসন্ধান পাইয়াছে এবং এখনও তাহার সন্ধানে নিযুক্ত আছে।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে "বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর" "বিলাসপুর—কাটনী" ব্রাঞ্চ যখন খোলা হয়, তখনকার একটি আশ্চর্য্যজনক ঘটনায় * প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কত যুগযুগান্তর পূর্ব্ব হইতে এ দেশে তামার প্রচলন ও প্রজনন হইয়া আসিতেছে। এই লাইনটির কনষ্ট্রাক্সনের (construction) পূর্ব্বে, এই সমস্ত স্থানের দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণী ও ভীষণ জঙ্গলে মনুষ্য সমাগম অসম্ভব ছিল। ব্যাঘ্র ভল্লুক হস্তী প্রভৃতি নানা জাতীয় হিংস্র জন্তু ও নানা রকমের বিষাক্ত সরীসৃপ ও বড় বড় অজগরের প্রিয় বাসভূমি এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর দিয়া যখন কনষ্ট্রাক্সনের কার্য্য চলিতে সুরু হয়, তখন এই রেল কোম্পানীর কত লোক যে এই সকল হিংস্র জন্তুদের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে, তাহা এতদঞ্চলের লোক বিশেষ ভাবে অবগত আছে। জনৈক ইয়োরোপীয়ান অফিসারের উপর এই কনষ্ট্রাকসনের কার্য্য ভার অর্পিত হয়।

সাহেব সম্প্রতি বিলাত গিয়া বিবাহ করিয়া মেম সাহেবকে সঙ্গে করিয়া ভারতে আসিয়াছিলেন এবং এই কনষ্ট্রাক্সনের কার্য্যে আসিবার কালে মেমসাহেবকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ প্রায় দুই শতাধিক লোকলস্কর লইয়া এই জঙ্গলে প্রবেশ করেন।

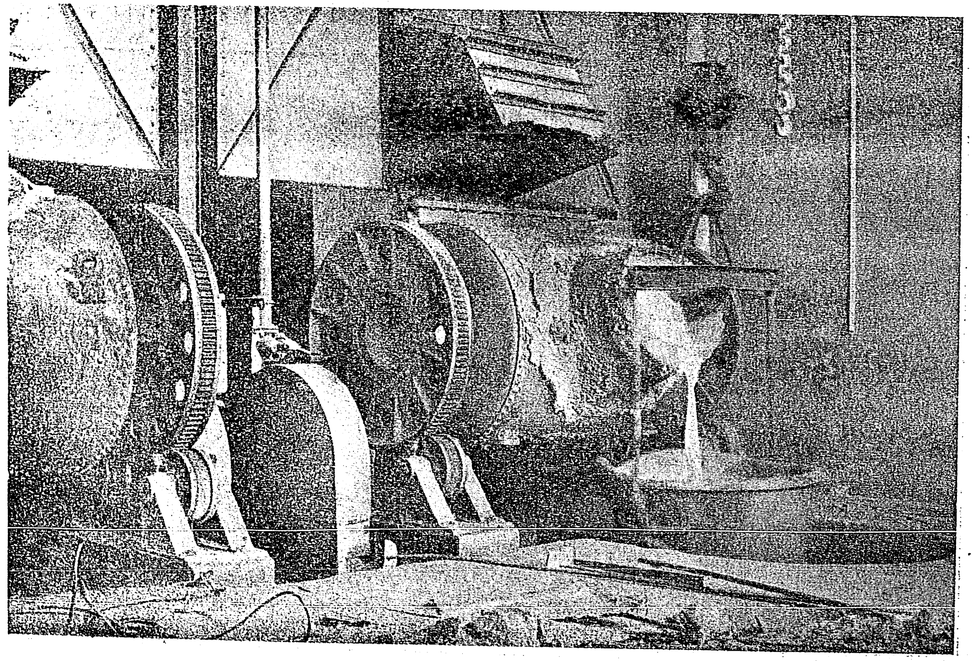

মৌভাণ্ডার কারখানার কলকব্জা

* এই ঘটনাটি প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে "জন্মভূমি" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সর্ব্বাগ্রে দুইটি হস্তী থাকিত। তাহারা পথ পরিষ্করণ ও সম্মুখের বাধা বিঘ্ন অপসারণার্থ ব্যবহৃত হইত। তৃতীয় হস্তীতে সাহেব নিজে ও মেমসাহেব উভয়ে আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া, বিশেষ সতর্কতার সহিত উপবিষ্ট থাকিতেন। তৎপশ্চাৎ প্রায় দুইশতাধিক লোক রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে করিতে অগ্রসর হইত। এই সমস্ত লোকের কোলাহলে ও সর্ব্বাগ্রে চালিত দন্তীদ্বয়ের পৃষ্ঠোপরি স্থাপিত দামামার মেঘগম্ভীর ভীষণ নির্ঘোষে, সম্মুখস্থ হিংস্র জন্তুগণ ভয়চকিত ভাবে ছুটিয়া পলায়ন করিত। কখন কখনও হস্তিযুথ সদলবলে আসিয়া সম্মুখে এমন হানা দিত যে, তাহাদিগকে তাড়াইতে প্রায় সমস্ত দিনটাই কাটিয়া যাইত।

এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, বন্ধুর পার্ব্বত্য অঞ্চলের কত উচ্চ স্থান নিম্ন করিতে হইয়াছে, কত পাহাড় কাটিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে হইয়াছে, কত পাহাড়ের বুক চিরিয়া সুড়ঙ্গ খনন করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অপর কাহারও ধারণাতেই আসে না। এক স্থানে এক সপ্তাহব্যাপী তাম্বু খাটানো থাকিত। এবং সে স্থানের কার্য্য শেষ হইলে আর এক স্থানে তাম্বু খাটানোর ব্যবস্থা হইত। সাধারণতঃ উচ্চ স্থান অনেকটা নিরাপদ বলিয়া সেইস্থানেই তাম্বু খাটানো হইত। সাহেবের নিজের ও তাঁহার অধীনস্থ এঞ্জিনীয়ার, ওভারশিয়ার, সাব্-ওভারশিয়ার, প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের পৃথক পৃথক তাম্বুর বন্দোবস্ত ছিল।

এইরূপভাবে অগ্রসর হইতে হইতে একদিন তাহারা এক কদলীবৃক্ষের জঙ্গলে আসিয়া প্রবেশ করিল। ভীষণ জঙ্গলে কদলীবৃক্ষ ও তাহাতে নানা জাতীয় কদলী বিশেষতঃ সুপক্ক মর্ত্তমান কলার কাঁদিগুলি দেখিয়া, সাহেব ও মেম-সাহেবের আনন্দ ধরে না। এক স্থানে কয়েকটি বৃহদাকার গুহার সম্মুখে তাহারা দেখিতে পাইল, প্রায় শতাধিক তাম্রনির্ম্মিত তৈজসপত্র, যেমন—কোশাকুশী, পারাত্, টাট্,

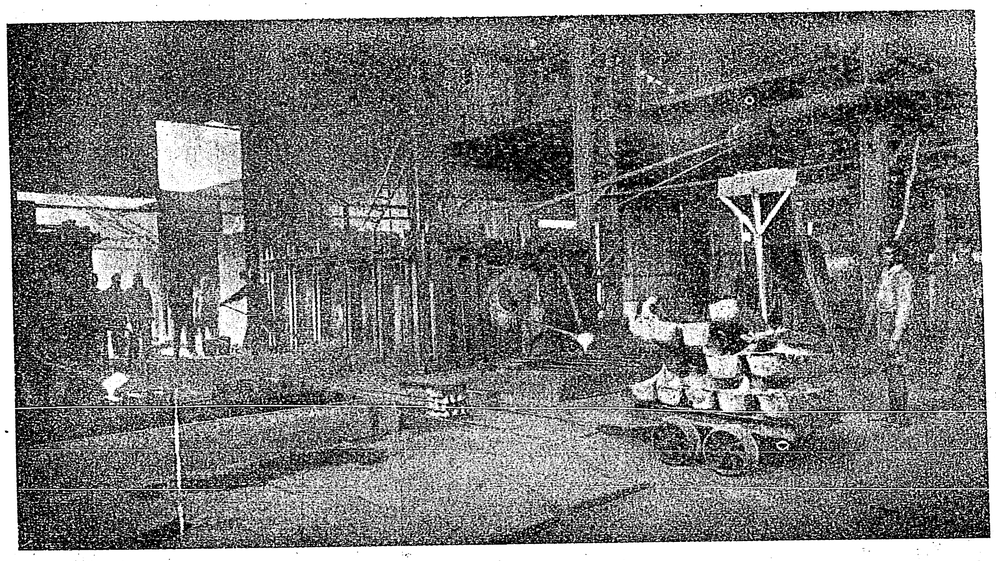

মৌভাণ্ডার কারখানা—এখানে তামা ঢালাই ও শোধন করা হয়

পঞ্চপ্রদীপ, পুষ্পপাত্র, প্রদীপ, কমণ্ডলু প্রভৃতি পূজাকালে ব্যবহারোপযোগী জিনিষপত্র, কে বা কাহারা যেন এইমাত্র সাজাইয়া রাখিয়া, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেগুলি আকারে এত বড় যে, দেখিলে মনে হয়, এই পাত্রগুলি সাড়ে তিন হস্ত দীর্ঘ মানবের ব্যবহারোপযোগী নহে। পরন্তু এই পাত্রগুলি যে যুগের, সে যুগের মানুষ নিশ্চয়ই এই আধুনিক যুগের মনুষ্য অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ দীর্ঘ ছিল।

সাহেব মেমসাহেব এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি সকলে সেই

জিনিষগুলি দেখিয়া স্থির করিলেন যে, এগুলি একত্রে ওজন করিলে প্রায় দেড়শত মণেরও অধিক হইবার সম্ভাবনা। আর গুহার অভ্যন্তরে প্রায় অর্দ্ধমণ ওজনের কয়েকটি তামার চ্যাঙ্গড় পাওয়া গিয়াছিল। সেগুলির ওজনও প্রায় দেড়শত মণ হইবে। পাহাড়ের সমতল স্থানে তাম্র-নিষ্কাশনের ময়লা (Slags) পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

এখানে এত তামা কিরূপে আসিল, ইহাই চিন্তা করিতে করিতে সাহেব সেই চ্যাঙ্গড়গুলি তাম্বুতে বহিয়া লইয়া যাইতে,

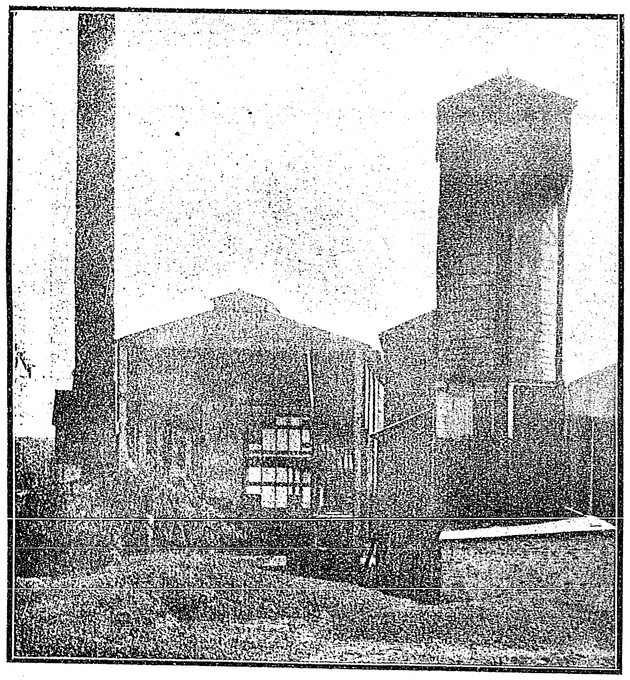

"ওর" গালাইবার চিমনী, বয়লার ও চূর্ণ কয়লার "প্ল্যাণ্ট"

তাঁহার লোকজনদের আদেশ করিলেন। আর সেই তাম্র-পাত্রগুলির সম্বন্ধে বলিলেন, এগুলি এই স্থানেই এখন থাক, যাহাদের জিনিষ তাহারা নিশ্চয় আসিয়া এগুলি লইয়া যাইবে। কিন্তু খুব সাবধান, যাহারা লইতে আসিবে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ আমাকে যেন খবর দেওয়া হয়।

সাহেবের তাম্বু খাটানো হইয়াছিল একটি পাহাড়ের ঊর্দ্ধদেশস্থ খানিকটা সমতল স্থানে। সেই স্থান হইতে চতুর্দ্দিক অনেক দূর পর্য্যন্ত বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যেদিন উপরিউক্ত তাম্রপাত্র ও তামার চ্যাঙ্গড়গুলি দৃষ্টিগোচর হয়, সেইদিনই অপরাহ্ণে সাহেব তাম্বুতে গিয়া মেম সাহেবের ভীতিবিহ্বল মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সাহেবের আগমনে মেমসাহেব প্রকৃতিস্থ হইয়া সাহেবকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই :—

মেম সাহেব তাম্বু হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতে করিতে পাহাড়ে সূর্য্যাস্ত দেখিতে ছিলেন। পাহাড় অঞ্চলে সূর্য্যাস্ত, ঠিক সময়ের পূর্ব্বেই, ঘটিয়া থাকে। সেই স্থানের পরম রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সম্ভার সেই ইংরাজ মহিলাকে এতটা আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, দিবসের অধিকাংশ সময়ই তিনি তাম্বুর বাহিরে কাটাইতে ভালবাসিতেন। তার উপর সূর্য্যাস্ত-কালীন সৌন্দর্য্য যে কত মনোরম তা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অপর লোকের লেখনী মুখে বর্ণনা করা বাতুলের প্রলাপের ন্যায়ই নিষ্ফল। এ হেন সময়ে সেই ইংরাজ মহিলার সৌন্দর্য্য-পিপাসু লোচন দুটির পিপাসা যখন মিটিয়া মিটিতেছিলেন না, সেই সময়ে হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটি পার্ব্বত্য নদীর তটে, প্রায় সাত আট হাত দীর্ঘ পাঁচটি গৌরবর্ণ মনুষ্য-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। তাঁহাদের মুখাবয়ব দীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফে সমাচ্ছন্ন, মস্তকে আপাদলম্বিত জটাজাল, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি বিলিপ্ত, হস্তে কমণ্ডলু, কটিদেশ মোটা রজ্জু-সংবদ্ধ। এই অভূতপূর্ব্ব মনুষ্য-মূর্ত্তি দর্শনে মেম-সাহেব ভয়ে স্থানুবৎ "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় তাঁহাদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন দেখিয়া, তাঁহারা তাড়াতাড়ি সেই ভীষণ বেগে প্রবাহিতা পার্ব্বত্য নদীটি বিনায়াসে এক এক লম্ফে পার হইয়া, জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এতক্ষণে সাহেব বুঝিতে পারিলেন—ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত তাম্র-নির্ম্মিত পাত্রগুলি এক স্থানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল ও যে সব তামার চ্যাঙ্গড়গুলি তাম্বুতে আনা হইয়াছে, সেগুলির প্রকৃত অধিকারী কে? এই রকম বৃহদায়তন

বুদ্ধের বৈরাগ্য

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

COLOURED ILLUSTRATION

তৈজসপত্রগুলি, এই রকম দীর্ঘাবয়ব বিশিষ্ট মনুষ্যগণের ব্যবহারোপযোগী করিয়াই যে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

সাহেব ইহাদের সন্ধানে বহু লোক নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু দুই তিন দিন ধরিয়া বহু অনুসন্ধানেও তাহাদের কোনই খোঁজ পাওয়া গেল না, কিম্বা সেই তাম্রপাত্রগুলিও কেহই লইয়া গেল না। ইহার চার পাঁচ দিন পরে, সাহেব স্বয়ং আবার সেই রকমের মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সাহেবের হস্তে সকল সময়েই একটি দূরবীণ যন্ত্র থাকিত। তিনি এই দূরবীণের সাহায্যে পাহাড়ের শ্রেণীবিন্যাস দেখিতেছিলেন; এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, সেই রকম অবয়ব বিশিষ্ট দুইটি মনুষ্য, পাহাড়ের একটি শৃঙ্গ হইতে আর একটি শৃঙ্গে পর পর লাফাইয়া পড়িল; তার পর আর কিছুই দেখা গেল না। সাহেব স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখিয়া পুনরায় সন্ধান আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কোন রকমেই তাহাদের আর সন্ধান মিলিল না। সাহেব অগত্যা হাল ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই স্থানের অনতিদূরে, "অমরনাথ" নামে একটি পাহাড় বিন্ধ্যাচলের শাখা পাহাড় বলিয়া খ্যাত। সেই পাহাড়ের শীর্ষদেশে "অমরকণ্ঠ" নামে মহাদেব মন্দির মধ্যে বিরাজমান আছেন। মন্দির মধ্যে "গৌরীপট্টের" পার্শ্বে একটি উৎস হইতে অনবরতঃ একটি জলধারা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া গৌরীপট্টের পশ্চাদ্দেশ বিধৌত করতঃ মন্দিরের বাহিরে একটি সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তার পর এই স্থান হইতে কিয়দ্দূরে পাহাড়ের অনেকটা নীচে এই সুড়ঙ্গের মুখ খুলিয়া গিয়া, প্রবল একটি ঝরণার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রবাদ,—এই ঝরণাটিই পবিত্র-সলিলা নর্ম্মদা নদীর সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি স্থল। যে দীর্ঘকায় পঞ্চ মানব উল্লম্ফনে নদী পার হইয়া গিয়াছিলেন, সেইটিই এই নর্ম্মদা নদী।

এই পরম রমণীয় স্থানটি হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর "বিলাসপুর-কাটনী" শাখাস্থ "পেণ্ডারোড" ষ্টেশনে নামিয়া, কিয়দ্দূর পদব্রজে যাইলে, এই স্থানে উপনীত হওয়া যায়। নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তিস্থল এই "অমরনাথ" পাহাড়ে, কোন্ বৈদিকযুগ হইতে কত মুনিঋষি তপশ্চরণ করিয়া যে, ভগবদ্চরণে লীন হইয়া গিয়াছেন, এবং সেই দীর্ঘকাল হইতে কঠোরতপা কত না তপস্বী মুক্তিলাভের কামনায় এখনও পর্য্যন্ত যে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত আছেন, তাহা কে বলিতে পারে? এই যে ঋষিপ্রতিম দীর্ঘকায় পঞ্চ মানব—ইঁহারা যে সেই বৈদিক যুগ হইতে তপঃপ্রভাবে নিজেদের পরমায়ু সুদীর্ঘ করিয়া লইয়া, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সচ্চিদানন্দের "সামীপ্য" লাভ করতঃ পরমানন্দে তাঁহাদের অমর জীবনযাপন না করিতেছেন, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

অনেক তপস্বী ও তপস্বিনী ভগবচ্চরণে একেবারে লীন হইয়া যাইবার জন্য নির্ব্বাণ মুক্তি চান না;—সখারূপে, দাসরূপে, পিতারূপে, পুত্ররূপে, মাতারূপে, কন্যারূপে থাকিতে চান;—লীলাময়ের লীলা দেখিবার জন্য অমর হইয়া থাকিতে চান,—তাহাতে মিশিয়া যাইতে চান না। এই যে দীর্ঘাঙ্গ পঞ্চ মানব ইহাঁরা যে কোন্ যুগের মানব, তাহা সঠিক জানিতে না পারিলেও, ইহাঁরা যে এই শেষোক্ত শ্রেণীর সাধক নহেন, তাহাও কি কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন?

আমরা এই প্রবন্ধে, বৌদ্ধযুগ পর্য্যন্ত, এতদ্দেশের তাম্রখনির অস্তিত্ব, প্রচলন ও প্রজনন সংক্ষেপে দেখাইয়াছি; আর এক্ষণে, উপরিউক্ত ঘটনায় সপ্রমাণ হইল যে, তাহারও ঊর্দ্ধতন বৈদিক যুগ পর্য্যন্ত ইহার সমাদর এ দেশে সমভাবে বিদ্যমান ছিল। ইহার আর একটি প্রধান কারণ এই যে, বসুন্ধরায় যত প্রকারের ধাতু আছে, তাহার মধ্যে তামা হিন্দুদের পরম পবিত্র জিনিষ এবং মানবের দৈহিক উৎকর্ষতার জন্য তামার প্রয়োজনীয়তা কত, সে সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে বিশেষ গবেষণার পর যখন আমাদের মুণি ঋষিরা ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে চরম অনুকূল বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখনই এই ধাতুকে ধর্ম্মের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধিয়া দিলেন যে, দেবপূজার জন্য নির্ম্মাল্য, ভোগরাগ, গঙ্গোদক প্রভৃতি যাহা কিছু পূজোপকরণ সমস্তই এই তাম্রপাত্র ভিন্ন অন্য কোন ধাতুপাত্রে ব্যবহৃত হইবে না। স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মের এরূপ অঙ্গাঙ্গীভাব আর কোন দেশের কোথাও পরিলক্ষিত হয় কি?

একটি জ্ঞাতব্য বিষয় বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সিংহভূমের তামা যে অতি প্রাচীন কালে দেশ বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইত, তাহার প্রমাণ মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত বন্দর বা তমলুক। বৌদ্ধদের আমলে যখন সিংহভূমে প্রচুর তাম্র উৎপন্ন হইত, সেই যুগে এই বন্দরটি স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই স্থান হইতে তামাই বেশীর ভাগ রপ্তানি হইত বলিয়াই এই বন্দরটির নামকরণ হইয়াছিল "তাম্র-লিপ্ত"।

প্রিয়তমা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

তব মর্ম্ম-সুর মোর মর্ম্মে মর্ম্মে রণিতেছে আজি
মুখরি' উঠেছে প্রাণবাঁশী
ওগো প্রিয়তমা !
মিলন-রাগিণী যেন সকল অন্তরে উঠে বাজি
নিরন্তর আনন্দে উচ্ছ্বাসি'
নিত্য মনোরমা !
কর্ম্মের কঠিন বর্ম্মে শৃঙ্খলিত ছিল যার প্রাণ
বেদনায় বন্দী নিশিদিন,
তব ছন্দ-বন্দনায় শুনেছে সে মুক্তির আহ্বান,
লভিয়াছে জীবন নবীন
ওগো প্রিয়তমা !
অঞ্জলি ভরিয়া তুমি আনিয়াছ' সর্ব্ব সার্থকতা
মরু-বক্ষ সিক্ত করি বহায়েছো অশ্রু-বিহ্বলতা
নির্ঝরিণী সমা !
তোমারে পেয়েছি আজি যাত্রা-শেষে জীবনের পথে,
দুখ-সাথী—চির-আকাঙ্ক্ষিতা
ওগো প্রিয়তমা !
আমারে লয়েছ' বরি' আপনার প্রাণ-জয়-রথে
বিজয়িনী প্রণয়-গর্ব্বিতা
প্রেম-সুরঙ্গমা !
তোমার চরণ-পাতে গেহে মোর উঠিয়াছে ফুটি'
সৌন্দর্য্যের অরবিন্দরজি,
ইন্দিরার ইন্দুলেখা—ইন্দ্রাণীর গর্ব্ব পড়ে টুটি'
তোমার ঐশ্বর্য্যতলে আজি
ওগো প্রিয়তমা !
দলিয়া দুস্তর বাধা বধূ হ'য়ে এসেছো কল্যাণী
অন্তরের সত্য তব দৃপ্ত তেজে লইয়াছো মানি
লো' বধূ উত্তমা !
তব মৃদু গুঞ্জরণ হৃদয়ের কুঞ্জবন ঘিরে
রচে কোন্ অপূর্ব্ব কাহিনী
ওগো প্রিয়তমা !
রোমাঞ্চ শিহরি' উঠে কলস্বনা তোমার মঞ্জীরে
কাণে কয় কঙ্কণ-কিঙ্কিণী
তুমি নিরুপমা !
তোমারে চাহিয়াছিনু জন্মে জন্মে আমার জীবনে
মরমের পরম প্রেয়সী,
আজি তাই মূর্ত্তি ধরি' এসেছো এ প্রদোষ-লগনে
অন্তরের সঙ্গিনী শ্রেয়সী
ওগো প্রিয়তমা !
তোমার হাসিতে বাজে উর্ব্বশীর নূপুর ঝঙ্কার
তনুর অণুতে শুনি অতনুর ধনুর টঙ্কার !
তুমি অনুপমা !
জড়ায়ে ধ'রেছে মোরে যেন ওই কালো কেশপাশ
রহস্যের নিগূঢ় বন্ধনে
ওগো প্রিয়তমা !
তোমার আঁখির তারা তোলে কোন্ উতলা নিঃশ্বাস
অকস্মাৎ পরিতৃপ্ত মনে
বিদ্যুৎ-সঙ্গমা !
তোমার গতির লীলা দোলা দেয় সর্ব্ব অঙ্গে মোর
যৌবনের তরঙ্গ আবেগে ;
স্পর্শ তব অভিনব পুলকের আনে স্বপ্ন ঘোর
কল্পনায় স্বর্গ ওঠে জেগে
ওগো প্রিয়তমা !
তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে সৃজনের আনন্দ হিল্লোল
চির-বসন্তের হাসি-অফুরন্ত কূজন কল্লোল
আছে যেন জমা !
আজন্ম-সাধন-লব্ধ তুমি মোর অন্তরের ধন
চিরন্তনী পরাণ-আত্মীয়া
ওগো প্রিয়তমা !
যুগে যুগে কালে কালে চিত্ত মোর করেছো হরণ
অনুরাগে ভরিয়াছে হিয়া
তোমার সুষমা !
আমার যা কিছু শূন্য পূর্ণ করিয়াছো বারে বারে
প্রাণের প্রাচুর্য্য দেছ' আনি,
সকল রিক্ততা মোর ভরিয়াছো তব উপহারে
তোমার দুর্লভ প্রেম দানি
ওগো প্রিয়তমা !
তুমি আসিয়াছো আজি মিলন-অমৃত-দীপ ল'য়ে
ঘুচায়ে দিয়েছো দেবী আমার নিকটতম হ'য়ে
বিরহের !

চিরন্তনীর জয়

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"ওগো, শুন্‌ছ ?"

স্বামী তখন আরাম-কেদারায় শ্রান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিলেন। পত্নীর আহ্বানে তিনি একটু সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "শুন্‌তে ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত। রাণীর কি আদেশ—"

পত্নী তরলিকার সুগৌর আনন ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে কৃত্রিম রোষভরে বলিল, "তোমার সব তাতেই ঠাট্টা। যাও, অমন করলে আমি কিছুই বল্‌ব না।"

প্রতুলচন্দ্র পাকা মুন্সেফী পদ পাইয়া মাস কয়েক হইল এই সহরে আসিয়াছেন। তাঁহার যৌবনের কল্পনা, তারুণ্যের স্বপ্ন এখনও নথিপত্রের নীরস ভাষা এবং আইনের জটাজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই। শান্ত, স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে বাগানের ফুলগাছগুলি দোলাইয়া বাতাস মদির স্বপ্নের আভাস প্রাণে জাগাইয়া তুলিতেছিল।

গড়গড়ার নলটা ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া প্রতুলচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তরুণী পত্নীর পেলব দক্ষিণ করতল চাপিয়া ধরিয়া আকর্ষণ করিতেই, তরলিকা বলিয়া উঠিল, "তোমার যদি লজ্জা-সরম কিছু থাকে। বেয়ারা, চাকর ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখ্‌তে পাচ্ছ না ?"

প্রতুলচন্দ্রের দৃষ্টিশক্তিহীনতা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহ কোন অভিযোগ করে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষা সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া জয়মাল্য লাভের ফলে অনেকের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, কিন্তু সুস্থ, দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ যুবকের দেহ, নয়ন বা মনে কোনরূপ পীড়া দেখা দিতে পারে নাই। সুতরাং তিনি সবই দেখিতে পাইতেছিলেন।

তবে যৌবনের ধর্ম্মকে তিনি অবহেলা করিবার চেষ্টা কোন দিন করেন নাই, করিবার কোন প্রয়োজনও তিনি এ যাবৎ অনুভব করেন নাই। পাণিপীড়ন করিয়া, অগ্নি সাক্ষী করিয়া যাহাকে গৃহলক্ষ্মীর পদে বরণ করিয়া আনিয়াছেন, নিরালায় তাহার কর গ্রহণে কোনও অপরাধ হয়, ইহা তাঁহার আইন-শাস্ত্রে লেখা ছিল না। সুতরাং পত্নীকে পাশের আসনে বসাইয়া প্রতুলচন্দ্র হাসিমুখে বলিলেন, "এখন দাস প্রস্তুত, কি আজ্ঞা বলুন ?"

তরলিকা স্বামীর এরূপ পরিহাসে অভ্যস্ত ছিল। সে জানিত, এ বিষয় লইয়া পীড়াপীড়ি করিলে, অভিনয় ক্রমেই গাঢ় হইয়া উঠিবে। সুতরাং সে স্বামীকে আর প্রশ্রয় না দিয়াই বক্তব্য বিষয়ে অবহিত হইল।

পাণের ডিবা খুলিয়া স্বামীর মুখে সযত্নরচিত পাণের খিলি দিয়া বলিল, "বলছিলুম কি, দাদা আস্‌বেন বলে' পত্র লিখেছেন।"

বিস্ময়ের অভিনয় সহকারে প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "বটে !"

"না, তোমার সঙ্গে পারবার যো নেই। সব তাতেই তোমার ঠাট্টা।"

সহসা গম্ভীর হইয়া প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "না, এবার আদৌ ঠাট্টা-তামাসা নয়। হঠাৎ এদিকে তাঁর আসবার হেতু ?"

তরলিকা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তা জানি নে। খুলে কিছু লেখেন নি। স্পষ্ট করে কোন কালেই ত দাদা কাকেও কিছু বলেন না।"

প্রতুলচন্দ্র গড়গড়ার নল মুখে আবার তুলিয়া লইয়াছিলেন। নিবিষ্ট মনে কয়েকবার টান দিয়া তিনি বলিলেন, "পরীক্ষা দেওয়ার এমন বাতিক বড়-একটা দেখা যায় না। এবার নিয়ে তিনটে বিষয়ে তিনি এম্-এ পরীক্ষা পাশ করলেন না ?"

তরলিকা বলিল, "ইংরাজী, ইতিহাস, আর সংস্কৃত—তিনটেই ত হল। দেখ না, আবার হয় ত আর একটা বিষয় নিয়ে পড়্‌তে থাকবেন।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "দেখ, তোমার বাবার ঐ একটি মাত্র ত ছেলে। পয়সাকড়িও শ্বশুরমশাই যথেষ্ট করেছেন। কিন্তু অনিলবাবু বিয়ে করতে এত নারাজ কেন ?"

একটি ছোট নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তরলিকা বলিল,

"কি জানি, দাদার যে কি মতলব কিছুই বোঝা যায় না। ওঁর আরও ক'জন বন্ধু আছে, তাঁরাও চিরকুমার সভার সভ্য হয়ে আছেন। আমার কিন্তু ভারী রিশ্রী লাগে।"

সন্ধ্যার ছায়া তখন গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। ভৃত্য আলোক লইয়া আসিতেই তরলিকা উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রতুলচন্দ্রও নিবিষ্ট মনে কি যেন চিন্তা করিতেছিলেন। তিনিও আরাম-কেদারার উপর সোজা হইয়া বসিলেন।

বাগানের ফটকের কাছে পদশব্দ শ্রুত হইতেই তরলিকা স্বামীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

পরিচিত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "মুন্‌সেফবাবু আছেন না কি?"

প্রতুলচন্দ্র কেদারা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আসুন, বীরেশবাবু।"

বীরেশবাবু স্থানীয় কলেজের বিচক্ষণ অধ্যাপক। বয়সে প্রবীণ এবং জ্ঞানে বিজ্ঞ। এই তরুণ-বয়স্ক মুন্‌সেফটির বিনয়-নম্র ব্যবহার, পাণ্ডিত্য এবং শিষ্টাচারে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই বয়সের পার্থক্য উভয়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিতে প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ বীরেশবাবুও কায়স্থ বলিয়া উভয়ের মধ্যে অল্পদিনের পরিচয়েও আন্তরিক আত্মীয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

অধ্যাপককে সমাদরে বসাইয়া প্রতুলচন্দ্র ভৃত্যকে তামাক সাজিবার আদেশ দিলেন।

বয়সের মাপকাঠিতে তারুণ্য বা বার্দ্ধক্যের পরিমাণ করা অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত হইয়া থাকে। মানব-মনের সুস্পষ্ট পরিচয় যাঁহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেই সকল তত্ত্বদর্শী মনীষী বলিয়া থাকেন, তারুণ্য বা বার্দ্ধক্য মানুষের দেহে নহে, মনে। সুতরাং ২৮ বৎসরের যুবা প্রতুলচন্দ্রের সহিত পঞ্চাশৎ বর্ষীয় প্রৌঢ় বীরেশবাবুর মনের একতানতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার বিশিষ্ট কোন কারণ ছিল না।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার সঙ্গে উভয়েরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। দর্শনশাস্ত্রে উভয়েই পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কলেজে বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যপনা করিলেও, দর্শনে বীরেশবাবুর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বীরেশবাবুর প্রথম যৌবনে যে সকল সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষিত অধিকাংশ বাঙ্গালীর নিকট তাহাই সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। কেহ বা সে সমস্যার সমাধান করিয়া একটা পথ বাছিয়া লয়, অনেকে গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়াই চলে।

বীরেশবাবু সমস্যার সমাধান পাইয়া আত্মস্থ হইয়াছিলেন। প্রতুলচন্দ্রের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার মতের ও চিন্তাধারার বিশেষ সামঞ্জস্য ছিল। বীরেশবাবু প্রগতি বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু যে দেশে তাঁহার জন্ম, যে ভাবধারায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ অভিষিক্ত হইয়া আসিয়াছেন, দেশের যে অবদান, মাটীর রস, বায়ুর স্নিগ্ধতা, শ্যামা মায়ের বুকের অফুরন্ত স্নেহ-নির্ঝরের শীকরকণায় মিশিয়া মানুষকে সঞ্জীবিত রাখে, তাহার মহিমা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন—বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং প্রতীচ্য শিক্ষার মোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন, অভিভূত করিতে পারে নাই।

প্রতুলচন্দ্র তরুণ হইয়াও এই মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তিনি সকল সময়েই মনে করিতেন, তিনি হিন্দু, তিনি বাঙ্গালী। য়ুরোপীয় সভ্যতার সমুজ্জ্বল দীপ্তি মানুষের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত, সচকিত করিয়া তুলে; কিন্তু তাহার অন্তরাল হইতে বস্তুতান্ত্রিকতার যে ক্ষুধিত, লুব্ধ রূপ দেখা যায়, তাহা প্রতীচ্য মনোবৃত্তির স্পৃহনীয় নহে।

গড়গড়ার নল তুলিয়া লইয়া বীরেশবাবু বলিলেন, "আমাদের কলেজে একজন নূতন অধ্যাপক আস্‌ছেন, তাঁর জন্য একটা বাসা ঠিক করা হয়েছে। আপনার বাংলো থেকে বেশী দূরে নয়।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "এখানে এসে অবধি একদিনও কলেজটা দেখ্‌তে যাওয়া হয় নি। যে কাজের ভিড়। আপনি ছাড়া অন্য কোন অধ্যাপকের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হয় নি। একদিন যাব কলেজে।"

বীরেশবাবু বলিলেন, "আপনি পণ্ডিত মানুষ। পল্লী সহরের কলেজ কেমন চল্‌ছে, আপনাদের জানা দরকার।"

প্রতুলচন্দ্র কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "না, সত্যি, আমি এজন্য লজ্জিত। সোমবার কোর্টে যাবার আগে একবার দেখে আস্‌ব। ভাল কথা, আপনি যে নূতন অধ্যাপককে আমার প্রতিবেশী করে দিচ্ছেন, তাঁর নামটা কি বলুন ত?"

জোরে গড়গড়ায় একটা টান দিয়া বীরেশবাবু বলিলেন, "অনিলচন্দ্র বসু। তিন বিষয়ে এম্-এ।"

প্রতুলচন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব দৃষ্টিতে বীরেশবাবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার শ্যালক অনিলচন্দ্র এখানে অধ্যাপক হইয়া আসিতেছেন, এ সংবাদ তাঁহাকে বা স্বীয় সহোদরাকেও তিনি জানাইলেন না কেন? এ মন্ত্রগুপ্তির সার্থকতা কি?

তিনি জানিতেন, পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অনিলচন্দ্র ভারতীয় সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য দুই বৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদে গিয়াছিলেন। পরীক্ষায় সাফল্য লাভও করিয়াছিলেন। প্রথম স্থান অধিকার করিয়া অনিলচন্দ্র চাকুরীতে যোগ দিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও অনুরোধ-উপরোধে কর্ণপাত না করিয়া তিনি সে আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। পরের কাছে দাসত্ব করাকে তিনি উঞ্ছবৃত্তি বলিয়া এ পর্য্যন্ত কোথাও কোন প্রকার কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন নাই। তবে আজ এতদূরে—পল্লী সহরে অধ্যাপনা-কার্য্য গ্রহণের মনস্তত্ত্ব কি? দাসত্ব হইলেও অধ্যাপনা মহৎকার্য্য, লোকশিক্ষার পীঠস্থান। সহরের কলেজটি সাধারণের অর্থে স্থাপিত—বেসরকারী। সেই জন্যই কি এতদিন পরে অনিলচন্দ্র এ কার্য্য গ্রহণ করিলেন?

প্রতুলচন্দ্রের মুখে চিন্তার রেখা দেখিয়া বীরেশবাবু বলিলেন, "কি ভাব্‌ছেন আপনি?"

নবীন মুন্‌সেফ অকারণ মিথ্যাভাষণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিলেন, "অনিলবাবুর এই মনোবৃত্তির মূলতত্ত্ব খুঁজে পাচ্ছি না। সিবিল সার্ব্বিসের লোভনীয় এবং প্রার্থনীয় পদ পেয়েও যিনি তা অনায়াসে ত্যাগ করতে পারলেন, তিনি কলেজের অধ্যাপনার ভার সামান্য অর্থের বিনিময়ে কেন গ্রহণ করলেন, বুঝতে পাচ্ছি না।"

বীরেশবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনি তাঁকে চেনেন না কি?"

মৃদু হাসিয়া প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "হ্যাঁ, তিনি আমার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়,—আমার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ সহোদর।"

অধ্যাপক বীরেশবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিবার পর বলিলেন, "সিবিল সার্ব্বিসের পদ অনিলবাবু পেয়েছিলেন না কি?"

"হ্যাঁ, ভারতে যে পরীক্ষা হয়েছিল, তাতে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। কিন্তু কাজ পেয়েও অনায়াসে তা তিনি উপেক্ষা করেছেন।"

বীরেশবাবু বলিলেন, "আশ্চর্য্য! আরও বিস্ময়ের বিষয় এখানে তিনি আস্‌ছেন, তাও আপনাদের জানান নি।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আসবার সংবাদ অবশ্য জানিয়েছেন; কিন্তু কি জন্য আসছেন, তা লেখেন নি।"

বড় অদ্ভুত লোক ত!—

বীরেশবাবু নীরবে ধূম পান করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"দাদা, এ তোমার ভারী অন্যায়"—

"কেন, কি হয়েছে, বোন্?"

তরলিকা অভিমানস্ফুরিতাধরে বলিল, "তুমি এখানে চাকরী নিয়ে এসেছ, অথচ অন্য বাড়ী ভাড়া নিলে—একবার আমাদের জানাবার প্রয়োজনও মনে করলে না। আমরা কি এতই পর?"

অনিলচন্দ্র সহোদরার এই অভিমান দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোর ছেলে বেলার স্বভাবটি এখনও ঠিক এক রকমই আছে। অল্পেই অভিমান।"

"তা যাই বল দাদা, তুমি যদি আমাদের পর মনে না করতে, তা হলে নিশ্চয় আমাদের কাছে সব খুলে লিখ্‌তে, আমাদের বাড়ীতেই আস্‌তে, আলাদা বাসা করতে না।"

প্রতুলচন্দ্র এতক্ষণ চুপ করিয়া ভ্রাতা ও ভগিনীর আলোচনা শুনিতেছিলেন। এবার তিনি বলিলেন, "আপনার বোনের এ অভিযোগ কি সত্য নয়, অনিলবাবু?"

তেমনই প্রশান্তভাবে হাসিতে হাসিতে অনিলচন্দ্র বলিল, "না, প্রতুলবাবু। যদি দু'দিনের জন্য বেড়াতে আমি আস্‌তাম, তা হলে আমার বোনের বাড়ীতে ছাড়া আমি আর কোথাও নিশ্চয় যেতাম না। কিন্তু আমাকে স্থায়িভাবে কলেজে পড়াতে হবে। এ অবস্থায় আপনাদের বাসার কাছাকাছি আলাদা থাকা কি সঙ্গত নয়? বিশেষতঃ মহাত্মা গান্ধীর যে একান্তরূপে ভক্ত, তার কি একজন সরকারী চাকুরীয়ার বাড়ীতে স্থায়িভাবে থাকা সঙ্গত, না শোভন? আপনিই বিচার করে বলুন, প্রতুলবাবু?"

পতি ও পত্নীর দৃষ্টি একযোগে অনিলচন্দ্রের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। এতক্ষণ কেহই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করে

নাই। প্রতুলচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার শ্যালকের অঙ্গে আগাগোড়া মোটা খদ্দরের সাধারণ বেশভূষা, পায়ে সামান্য মূল্যের জুতা। তরলিকা লক্ষ্য করিল, দাদার মস্তকে ঈষদ্দীর্ঘ, কুঞ্চিত কেশরাজির শোভা আর নাই। সমগ্র দেহে ও ব্যবহারে বিলাসিতার পূর্ব্বচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া, একটা সংযমপূত অপূর্ব্ব দীপ্তি অনিলচন্দ্রের আননে নয়নে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার জ্যেষ্ঠের—একমাত্র সহোদরের এই পরিবর্ত্তনে তরলিকার মনে কোন্ ভাবের উদ্ভব হইল, তাহার দৃষ্টিতে বা কথায় তাহার স্বরূপ ব্যক্ত হইল না। সে মৃদুস্বরে বলিল, "এ সব খদ্দর কিনেছ ?"

অনিলচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "না বোন্। রোজ আমি চার ঘণ্টা করে চরকা চালাই। তাতেই আমার জামা, কাপড়, চাদর, বালিসের ওয়াড়, বিছানার চাদর সব হয়ে যায়।"

"এখানেও চরকা চালাবে, দাদা ?"

"নিশ্চয়। ওটা যে নিত্য কর্ম্মের মধ্যে বোন্।"

তার পর ভগিনীপতির দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি হাকিম মানুষ। আমার চরকা, তাঁত, মাকু—এ সব হাঙ্গামা নিয়ে কি এখানে থাকা উচিত ? আপনিই বলুন, প্রতুলবাবু ?"

প্রতুলচন্দ্র নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। তার পর বলিলেন, "তোমার দাদার জন্যে চা নিয়ে এস, আর পার ত আমার জন্যও আর এক কাপ—"

অনিলচন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "আমি চা ত খাই না—তবি, আমার জন্য দরকার নেই।"

তরলিকা সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি চা আবার কবে ছাড়্লে ? দিনের মধ্যে চার-পাঁচ বার চা নইলে যে চল্ত না তোমার !"

জ্যেষ্ঠ হাসিয়া বলিল, "তুই ত অনেক দিন আমাদের ওদিকে যাস্ নি, তা জান্বি কি করে ? এখন চা আর ভাল লাগে না। তবে সর্দ্দি কাশি হলে মাঝে মাঝে এক আধ কাপ্ চলে।"

তরলিকা বলিল, "বেশ, চা না খাও, সরবতে ত আপত্তি হবে না। তুমি বস, আমি এখনি আস্ছি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে লঘুগতিতে চলিয়া গেল।

প্রতুলচন্দ্র নিবিষ্ট মনে কি ভাবিতেছিলেন। পত্নী চলিয়া গেলে তিনি শ্যালকের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি, অনিলবাবু ? এখানে সামান্য বেতনের অধ্যাপকের কাজ নিয়ে এলেন, আপনার বাবা তাতে মত দিয়েছেন ?"

অনিলচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "বাবার মতের বিরুদ্ধে এ জীবনে কোন কাজ করি নি। প্রথমতঃ তিনি আমার উদ্দেশ্যের ধারা বুঝতে পারেন নি, তাই হয় ত একটু দুঃখিত হয়েছিলেন ; কিন্তু এখন তিনি আমার কোন কাজে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, বিশেষভাবে উৎসাহই দিয়ে থাকেন। বাবা বছরখানেক হ'ল ওকালতীর কাজও ছেড়ে দিয়েছেন। বন্ধুবান্ধবরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, বয়স হচ্ছে, উৎসাহ নেই।"

বাহিরে ফটকের কাছে বীরেশবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "মুন্সেফবাবু, বাড়ী আছেন ত ?"

সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকের পদধ্বনি নিকটতর হইয়া আসিল।

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "অনিলবাবু, আপনি যে কলেজের কাজে যোগ দিয়েছেন, বীরেশবাবু সেখানে বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক। এখনও বোধ হয় পরস্পরের মধ্যে আলাপ হয় নি ?"

অনিল বলিল, "না, আমি ত সবে এসে পৌঁছেছি। কাল কলেজ খুল্লে দেখা হবে। তবে প্রিন্সিপ্যালের ভাই আমাকে ষ্টীমার-ঘাট থেকে নিয়ে এসেছেন।"

বীরেশবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই প্রতুলচন্দ্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। শ্যালককে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ইনিই অনিলবাবু, আজ ভোরেই এসেছেন। আর ইনি কলেজের মেরুদণ্ড বীরেশবাবু।"

বীরেশবাবু এই প্রিয়দর্শন তরুণ অধ্যাপকের দিকে চাহিয়া অভিবাদন করিতেই অনিলচন্দ্র প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিল, "আমি আপনাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছি। আমাকে কোন রকমে চালিয়ে নেবেন। অভিজ্ঞতা কিছুই নেই।"

বীরেশবাবু মুগ্ধ হইলেন। তরুণ-বয়স্ক উচ্চশিক্ষিত-দিগের মধ্যে এমন বিনয় ইদানীং বড়-একটা তিনি দেখিতে পান না।

তরুণ বৈশাখের প্রভাতে অরুণের দীপ্তি তখনও প্রখর হইয়া উঠে নাই। বাংলোর সম্মুখে বৃক্ষবীথির মধ্য দিয়া কঙ্কররচিত মনোরম পথটি চলিয়া গিয়াছে। সে দিকে চাহিয়া অনিলচন্দ্র বলিয়া উঠিল, "পল্লীর এমন মধুর শ্রী পল্লী সহরেও কদাচিৎ দেখা যায়, প্রতুলবাবু। আপনারা এখানে বেশ আছেন।"

বীরেশবাবু বলিলেন, "সে কথাটা মিথ্যা নয়, অনিল-বাবু। বড় বড় সহরের অনেক কদর্য্যতা, নানা রকমের বিশ্রী আবহাওয়া এখানে দেখ্তে পাবেন না। পল্লীর শান্ত শ্রীর অনবদ্য মাধুর্য্য এখানে অপর্য্যাপ্ত পাবেন।"

ভৃত্য ও পাচক তিনখানা পাত্র লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সম্মুখের টেবলের উপর উহা রক্ষা করিয়া তাহারা নিঃশব্দে চলিয়া গেল। তার পর তিন গ্লাস সরবৎ ও তিন গ্লাস পানীয় জল একে একে উপস্থিত হইল।

বীরেশবাবু বলিলেন, "সকালবেলা এসব কি, মুন্সেফ্ বাবু ?"

প্রত্যুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "হিন্দু গৃহস্থের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য বাঙ্গালার মেয়েরা এখনও ভোলে নি। এ-সব আমার অধিকার-সীমার বাইরের ব্যাপার, বীরেশবাবু।"

প্রবীণ অধ্যাপক অনিলচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনার কি মত, তা জানি না ; কিন্তু লেখাপড়া শিখে—পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে, বাঙ্গালার সনাতন ভাবধারা কলকাতার অনেক হিন্দু পরিবার ভুলে গেছেন। এটা কি খুব লোকসান বলে মনে করেন না ?"

অনিলচন্দ্র একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে অনেক দৃশ্যের স্মৃতি যেন ছায়াচিত্রের মত চলিয়া গেল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "আমাদের লোকসান কতখানি হয়েছে, তার হিসাব নিকাশ করে দেখ্বার প্রবৃত্তি অনেকের মধ্যেই এখনও জেগে ওঠে নি, এ কথাটা আমি জোর করেই বল্তে পারি।"

রবিবারের অবকাশ। কাহারও তাড়া ছিল না। সুতরাং জলযোগের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রসঙ্গের আলোচনা চলিতে লাগিল।

বীরেশবাবু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন, এই উচ্চশিক্ষিত তরুণ যুবক বর্ত্তমান যুগের আবহাওয়ার মধ্যেও একটা সুস্থ, সবল, বিচারসঙ্গত মনোবৃত্তির অধিকারী। শুধু তাহাই নহে, হিন্দুর ভাবরাজ্য ও কর্ম্ম-জগতের অনেক সংবাদ ইহার নখদর্পণে বিদ্যমান। প্রতীচ্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব ইহাকে অভিভূত ও বিচলিত করিতে পারে নাই।

এই তত্ত্বটুকু অবগত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এই নব-পরিচিত অধ্যাপকের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। বিজ্ঞানের বিচিত্র রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার স্বধর্ম্মানুরাগ দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। প্রাচীন হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞানের সমঞ্জসীভূত সূক্ষ্মতম তত্ত্বগুলির সন্ধান পাইয়া যৌবনের অর্ব্বাচীন মনোভাবগুলিকে তিনি নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাই অনুরূপ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন যুবকের প্রতি তাঁহার প্রৌঢ় মন প্রধাবিত হইল।

অনিলচন্দ্র অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেলে, বীরেশবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনার সম্বন্ধী বড় চমৎকার ছেলে। এমন একটি রত্ন সহসা পাওয়া যায় না। ওঁর বিবাহ হয়েছে ?"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "ঐখানেই গোল। উনি কিছুতেই বিবাহে রাজী নন। অনেক ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছিল ; কিন্তু এই তরুণ যোগী এ বিষয়ে স্বামী বিবেকা-নন্দের মন্ত্রশিষ্য।"

সবিস্ময়ে বীরেশবাবু বলিলেন, "কেন বলুন ত ?"

"কারণ কিছুই প্রকাশ নেই। তবে পূর্ব্বরাগ বা অনুরাগের কোন বালাই এতে নেই। শুধু খেয়াল। ওঁর দলের সব ক'টিই এই মন্ত্রের উপাসক শুনেছি।"

বীরেশবাবু চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নদীর জলে উষাস্নান সমাপ্ত করিয়া ভজন গাহিতে গাহিতে অধ্যাপক বীরেশচন্দ্র যখন ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখনও দিক্‌চক্রবালে অরুণ-লেখার দিব্য প্রকাশ দেখা দেয় নাই। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদির পর যখন তিনি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন প্রভাত-কিরণে প্রকৃতির শ্যামল শ্রী সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

বীরেশবাবু গুণ গুণ রবে তখনও একটা ভজন গাহিতে-ছিলেন। অন্তঃপুরের সংলগ্ন উদ্যান মধ্যে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি দেখিতে পাইলেন, প্রতিদিনের ন্যায় তাঁহার তরুণী

কন্যা পুষ্প চয়নে সমাহিত-চিত্ত। প্রাঙ্গণের তুলসীমঞ্চ গোময়লিপ্ত হইয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

পিতার নয়নের স্নেহদৃষ্টি কন্যার নিষ্ঠাভরা পুষ্পচয়ন দেখিতে লাগিল।

প্রাতঃস্নান সারিয়া গৃহিণী হৈমবতী রন্ধনাগারের দিকে যাইতেছিলেন। স্বামীর নিস্পন্দ মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কন্যার প্রতি এমনভাবে চাহিয়া থাকিতে তিনি স্বামীকে কোন দিন দেখেন নাই। তাঁহার সদাপ্রসন্ন মুখমণ্ডলে আজ যেন একটা গম্ভীর ছায়া—চিন্তার রেখাবলী ললাট-দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। স্বামীর মন ও চিন্তাধারার সহিত হৈমবতী এতই সুপরিচিত ছিলেন যে, আজিকার এই ভাব-বৈচিত্র্য তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিল।

গতিবেগ হ্রাস করিয়া তিনি স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বীরেশচন্দ্র এমনই আত্ম-সমাহিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন যে, পত্নীর আগমন পর্য্যন্ত তাঁহার অগোচরই রহিয়া গেল।

হৈমবতী ধীরে ধীরে স্বামীর স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিতেই বীরেশচন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল।

হৈমবতী বলিলেন, "অমন করে কি ভাব্‌ছিলে, এই সকাল বেলা?"

পত্নীর প্রশ্নবোধক উজ্জ্বল স্নেহদৃষ্টির আঘাতে বীরেশ-চন্দ্রের বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "মা আমার সত্যি বড় হয়ে উঠেছে। এ গৌরীর যোগ্য বর কোথায় পাব তাই ভাবছি।"

হৈমবতীর মাতৃহৃদয় এই একমাত্র সন্তানের জন্য কতখানি উদ্বেগাকুল থাকিত, ক্রমবর্দ্ধমানা, যৌবন-পুষ্পিতা কন্যাকে শীঘ্র পাত্রস্থ করিবার দুর্ভাবনায় অধীর হইয়া উঠিত, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু স্বামীকে এতদিন তিনি এ বিষয়ে সচেতন করিয়া তুলিতে পারেন নাই। প্রশ্ন তুলিলেই বীরেশচন্দ্র হাসিয়া বলিতেন "ব্যস্ত কি? মেয়েত আমার এখনও তেমন বড় হয় নি।"

কন্যার নাম গৌরী হইলেও তাহার গাত্রবর্ণ নাম-মাহাত্ম্যের অনুরূপ ছিল না। কিন্তু কবিবর্ণিত "ম্লান ছল ছল" দেহকান্তিতে একটা বিচিত্র মাধুর্য্য ছিল; গৌরীর মুখশ্রীতে একটা পবিত্র স্নিগ্ধ দীপ্তি, নয়ন যুগলে করুণার প্রস্রবণ যেন নিয়তই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

বীরেশচন্দ্র কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করিতেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।" কিন্তু দেশের আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি তাঁহার কোন অনুরাগ বা বিশ্বাস ছিল না। সারাজীবন ধরিয়া শিক্ষাবিভাগের সেবা করিলেও, তিনি উত্তমরূপে জানিতেন, এ শিক্ষার ফল বাঙ্গালীর পক্ষে অমৃত-তুল্য হইয়া উঠিতে পারে না। তাই তিনি কোনও দিন কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠান নাই। কলেজে অধ্যাপনার অবকাশে প্রত্যহ দুই বেলা তিনি স্বয়ং গৌরীর লেখা পড়ার তত্ত্বাবধান ও সহায়তা করিতেন। ইংরাজী ভাষা, ভাষা হিসাবে জানার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া কন্যাকে তিনি অবশ্য ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিতেন, কিন্তু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই দুইটি ভাষার প্রতিই তিনি সমধিক জোর দিয়া কন্যার চরিত্র ও মনকে গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

প্রতীচ্য ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াও তাঁহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, প্রাচ্য মনোভাব এবং শিক্ষাদীক্ষাকে প্রগতির পথে পরিচালিত করিতে হইলে প্রতীচ্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে হইবে। বাঙ্গালীকে স্বতন্ত্রতা ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে হইলে অবাঙ্গালী শিক্ষা ও মনোবৃত্তির গতিরোধ অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

তাই রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি, বঙ্কিম, মাইকেল, নবীন, হেম, রবি, বড়াল প্রভৃতির পাশে পাশে, শেলী, কীটস্, টেনিসন, সেক্সপীয়র, ডিকেন্স, টলষ্টয়, হুগোর মোটামুটী পরিচয় ঘটিবার ব্যবস্থা কন্যার সম্বন্ধে করিয়াছিলেন। এই অষ্টাদশ বর্ষীয়া তরুণীর মনোরাজ্যে জ্ঞানের প্রবাহধারায় ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষার ব্যঞ্জনার তরঙ্গ-মালা যাহাতে নিয়ত সমুচ্ছ্বসিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থায় পিতার অখণ্ড মনোযোগ ছিল।

আজ মধুর প্রভাতে, রবির প্রথম কিরণ-সম্পাতে সমুজ্জ্বল উদ্যান মধ্যে "সঞ্চারিণী পল্লবিনী" লতার ন্যায় কন্যার লীলায়িত গতিভঙ্গী দেখিয়া পিতৃহৃদয়ে যে অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, স্বামীর কয়টি কথায় মাতার অন্তরেও তাহা সুস্পষ্ট জাগিয়া উঠিল।

হৈমবতী একটি মৃদু নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,

"তুমি এতদিন হেসে উড়িয়ে দিয়েছ—তোমরা পুরুষ মানুষ সব কথা বুঝতে চাও না; কিন্তু রাত্রিতে আমার সত্যি ঘুম হয় না। বয়স চলে গেলে তখন বিয়ে দিয়ে কি লাভ তা বুঝতে পারি নে।"

কথাটা বীরেশবাবুর অন্তরে সত্যই আজ প্রচণ্ড আন্দোলন তুলিল। মানুষের মন একটা অবলম্বনকে আশ্রয় করিতে না পারিলে অবিচলিত থাকিতে পারে না। তবু বহুমুখী পুরুষের চিত্তে নানা বৈচিত্র্য, আশ্রয়ের রূপান্তর হিসাবে দেখা দেওয়া সম্ভবপর; কিন্তু নারীর মন বহু বিষয়ে একনিষ্ঠতা অবলম্বন করে না, ইহা দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক সত্য। যৌবন যখন দেহ ও মনে তাহার আগমন-বার্ত্তা বিঘোষিত করে, তখন নারীর পক্ষে একজন সঙ্গীর প্রয়োজন। আশ্রয়-তরুকে বেষ্টন করিয়া লতা আপন গৌরব ও বৈভবে যখন পুষ্ট ও মুকুলিত হইতে থাকে, তখনই লতার জীবনের সার্থকতা ঘটে। এ সত্যকে কোনও বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

না,—পিতা হইয়া, প্রতীচ্য মোহের প্রাবল্যে তিনি কন্যার বিবাহে অধিক বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। নিজ জীবনের যৌবনের অভিজ্ঞতা পুরুষ হইয়াও যদি তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে এত বিলম্ব করিতেন না।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চেষ্টা কি তিনি করেন নাই? কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ উপলক্ষে তিনি ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যে পাত্রগুলি তাঁহার কাছে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তাহাদের তরফ হইতে একে একে অনেকেই গৌরীকে দেখিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহার উজ্জ্বল শ্যাম-বর্ণ কাহারও মনে ধরে নাই। সকলেই সুগৌরী পাত্রীর সন্ধানে ব্যস্ত। শ্যামা বঙ্গভূমির ক্রোড়ে গৌরীর আবির্ভাব যে প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করে, এ যুগের নকল সভ্যতার আলোক-মুগ্ধ বিমূঢ়গণ তাহা বুঝিতে চাহে না। নিজেদের শরীরের দিকে চাহিয়াও তাহারা আপনাদের ভ্রম নিরাকরণ করিবার চেষ্টাও করে না।

বীরেশ বাবু পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "না, এবার আর মোটেই সময় নষ্ট করবো না। যেমন করে হোক আমার মা জননীকে সুপাত্রে দেবার ব্যবস্থা করছি। এখন তাঁরই ইচ্ছা!"

যুক্ত কর ললাটে লগ্ন করিয়া প্রৌঢ় অধ্যাপক কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হৈমবতী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "চল, এ-ভাবে দাঁড়ায়ে থেকো না। গৌরীমা এদিকেই আস্‌ছে। আমাদের এ অবস্থায় দেখে সে হয় ত ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌তে পারে। ওর যা বুদ্ধি, আমাদের মনের দুঃখ ঠিক অনুমান করে নেবে।"

বীরেশচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন। তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানের মধ্য-বিসর্পিত পথে চলিতে চলিতে তরলিকা বিস্ময়ানন্দে বলিয়া উঠিল, "চমৎকার! চমৎকার!"

অধ্যাপক-পত্নী হৈমবতী পথ দেখাইয়া অগ্রে চলিতে-ছিলেন। নবপরিচিতা অপূর্ব্ব সুন্দরী, তরুণী মুন্‌সেফ্-গৃহিণীর এই মন্তব্যে তাঁহার অন্তর প্রসন্ন হইল। তিনিও বিস্ময়মুগ্ধা তরুণীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

সযত্ন-রচিত রজনীগন্ধা, বেলা, যূথিকা, চামেলি, শেফালী প্রভৃতি বাঙ্গালার পুষ্পবৃক্ষগুলির শোভা তরলিকার চিত্তকে অভিভূত করিয়াছিল। কোনও বাঙ্গালীর গৃহপ্রাঙ্গণে পুষ্পবৃক্ষের এমন বিচিত্র সমাবেশ ও সযত্ন পালন-নৈপুণ্য সে পূর্ব্বে দেখে নাই। নদী-তীরবর্ত্তী এই সাধারণ ভবনটি কুঞ্জবনের স্নেহালিঙ্গনের স্পর্শে দর্শকের চিত্ত অভিনব মাধুর্য্যরসে মুগ্ধ করিয়া দেয়!

তরলিকা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এমনটি আমি কোথাও দেখি নি,—আপনারা সত্যি খুব সুখী।"

হৈমবতী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "ফুল আমরা খুব ভালবাসি, গাছপালারও আমরা খুব ভক্ত; কিন্তু এ সবই আমার মেয়ে গৌরীর সাধনার ফল। আপনার ভাল লেগেছে জেনে বড় তৃপ্তি পেলাম।"

তরলিকা সহসা বলিয়া উঠিল, "আমাকে 'আপনি' 'আপনি' বলে লজ্জা দেবেন না। আমি আপনার মেয়ের বয়সী। আমাকে গৌরীর মত তুমি বলেই ডাক্‌বেন। মাসীমা! গৌরী কোথায়?"

হৈমবতী এই তরুণী, সুশিক্ষিতা, মুন্‌সেফ্-গৃহিণীর

সৌজন্য ও সরলতায় মুগ্ধ হইলেন। তিনি চলিতে চলিতে ডাকিলেন, "গৌরী!—"

গৌরী জানিত মুন্‌সেফ বাবুর পত্নী তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিবেন। সে পরম্পরায় শুনিয়াছিল, পিতৃবন্ধু প্রতুল বাবুর স্ত্রী অপূর্ব্ব সুন্দরী এবং শিক্ষিতা—ধনী পিতার কন্যা। তাই সে কুণ্ঠাভরে এতক্ষণ নিজের ঘর হইতে বাহির হইতে পারে নাই। মাতার আহ্বান শুনিবামাত্র সলজ্জ চরণে সে ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

তরলিকা তাড়াতাড়ি গৌরীর কাছে গিয়া বলিল, "এই গৌরী? চমৎকার মেয়ে ত!"

হৈমবতী হাসিয়া বলিলেন, "গৌরীর মত ওর রূপ নেই। তবু উনি কেন যে ওর নাম গৌরী রেখেছেন।"

তরলিকা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার দীর্ঘায়ত, কৃষ্ণতার নয়ন যুগলের স্নিগ্ধ দৃষ্টি, আগুল্‌ফলম্বিত তরঙ্গায়িত কৃষ্ণ কেশরাজির চিক্কণ শোভা, সুস্থ সবল, সুডৌল দেহের লাবণ্য, তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের অভাবেও হিমালয়-নন্দিনী গৌরীর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সন্তান-বাৎসল্যে অভিভূত হইয়া যে পিতা কন্যার এই নামকরণ করিয়াছেন, তাঁহার রুচি নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়।

তরলিকা গৌরীর কোমল করযুগল নিজের অনিন্দিত পীবর কর-প্রকোষ্ঠে ধারণ করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আজ থেকে তুমি আমার বোন্ এবং সই। আমরা প্রায় সমবয়সীই হব বোধ হয়। তুমি আমার নাম ধরে ডাক্‌বে, আমিও ডাক্‌ব। কেমন ভাই?"

গৌরী এই সদ্যঃ পরিচিতা তরুণীর অমায়িকতায় প্রকৃতই মুগ্ধ হইল। সাধারণতঃ সে বড় একটা কাহারও সহিত মেলামেশা করিতে চাহিত না। নিজের মধ্যে অনেক প্রকার দীনতা আছে মনে করিয়া সকল সময়েই সে অনাবশ্যক কুণ্ঠা অনুভব করিত। কিন্তু মুন্‌সেফ্-পত্নীর অমায়িক ও অন্তরঙ্গ ব্যবহারে তাহার অন্তরের সকল সঙ্কোচ অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সযত্ন-গোময়-লিপ্ত তুলসীমঞ্চ দেখিয়া তরলিকার মন আরও মুগ্ধ হইল। নিজের বাসাবাড়ীতে আসিবার পর হিন্দু নারীর প্রাত্যহিক নিত্যক্রিয়ার এই বেদ-পীঠ সে প্রাঙ্গণ-ভূমিতে নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছিল। প্রতি সন্ধ্যায় সে ভক্তি-বিনম্র হৃদয়ে তুলসীতলে প্রদীপ দিয়া বাল্যের অভ্যাসকে সে সঞ্জীবিত রাখিত। গৌরীরও এই অভ্যাস আছে জানিয়া সে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিল। সমধর্ম্মী, সমমতাবলম্বী নরনারীর মধ্যে বন্ধুত্বের বীজ যত শীঘ্র উপ্ত হয়, এমন অন্যত্র সম্ভবপর নহে।

গৌরী তরলিকাকে সঙ্গে লইয়া বসিবার ঘরে গেল। পরিচ্ছন্ন গৃহমধ্যে গৃহবাসীদিগের রুচি ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের অপর্য্যাপ্ত নিদর্শন দেখিয়া তরলিকার মন একদিনেই এই পরিবারের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইল। স্বামীর নিকট সে বীরেশবাবুর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা পর্য্যন্ত যে সকল বিষয়েই তাহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিবে, ইহা সে পূর্ব্বে প্রত্যাশা করিতে পারে নাই।

সায়াহ্নের সূর্য্য নদীর ওপারে বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিতেছিল। ঘরের বাতায়ন-পথে নদীর জলস্রোত দেখিতে পাওয়া যায়। তরলিকা মুগ্ধ হৃদয়ে বাতায়ন সন্নিধানে একখানি আসনের উপর বসিয়া পড়িল। পল্লীর শান্ত শ্রী, নদীর বিচিত্র শোভা তাহার চিত্তকে অভিভূত করিল। গৌরীর শান্ত মুখশ্রী অপরাহ্ণের মৃদু আলোক-রেখায় বড় মধুর দেখাইতেছিল।

তরলিকা বলিল, "ভাই, শুনেছি তুমি না কি বেশ গাইতে পার। গান আমার বড় ভাল লাগে। একটা গাও না, ভাই। যা তোমার ইচ্ছে।"

গৌরীর মুখ লজ্জার অরুণরাগে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমার গান শুন্‌তে কি আপনার ভাল লাগবে?"

তরলিকা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "আমাকে তুমি আপ্‌নি বলছ! না ভাই, ও সব লৌকিক শিষ্টাচার বোনের কাছে, সইএর কাছে আমি পেতে চাই নে। তোমার বাবা খুব চমৎকার গাইতে পারেন শুনেছি। তুমি তাঁর কাছেই গান শিখ্‌ছ, জানি। তোমার ও রকম বিনয়ে আমি ভুলছি না।"

গৌরী বলিল, "বাবা খুব ভাল গান জানেন, সে কথা সত্যি; কিন্তু ভাই আমি ত কিছুই এখনও শিখ্‌তে পারি নি।"

তরলিকা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, সে বুঝব'খন। এখন তুমি একটা গাও ত, ভাই।"

লঘুচরণে গৌরী গৃহপ্রান্তে রক্ষিত এস্রাজটা তুলিয়া আনিয়া বলিল, "আমি এস্রাজের সঙ্গেই গেয়ে থাকি। অর্গান আমার ভাল লাগে না।"

তরলিকা বলিল, "সেই ভাল।"

এস্রাজটা লইয়া গৌরী তারগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তার পর সুরের ঝঙ্কার তুলিয়া সে গান ধরিল—

"আমি ত তোমারে চাহিনি জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ;
আমি না ডাকিতে, হৃদয় মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ!"

ছায়া ও আলোক পৃথিবীর বুকে তখন নৃত্য করিতেছিল। অগ্রগামিনী নারীর লঘু, মন্থর চরণ-ক্ষেপের তালে তালে ম্লান মুখে বিরহ ব্যথিত আলোক শ্রান্ত চরণে বিদায় লইতেছিল। গানের সুরে সুরে ভক্ত হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা ও আশার বাণী যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে!

গায়িকা কণ্ঠস্বর উচ্চ সপ্তকে তুলিয়া গাহিল—

"চির আদরের বিনিময়ে, সখা,
চির অবহেলা পেয়েছ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দু'হাত পসারি,
ধরে টেনে কোলে নিয়েছ;
'ও পথে যেও না, ফিরে এস'—বলে
কাণে কাণে কত কয়েছ!
(আমি) তবু চলে গেছি; ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ!"

তরলিকা স্পন্দনহীন নেত্রে সুকুমারী তরুণীর ভাব-সমৃদ্ধ আননের প্রতি চাহিয়া এই অপূর্ব্ব সুর-তরঙ্গের খেলা সমস্ত প্রাণ দিয়া শুনিতেছিল। ইহা ত শুধু সুর-তান-জ্ঞান-প্রবীণা গায়িকার গীতির ঝঙ্কার নহে। ইহা যে একনিষ্ঠ সাধকের অন্তর্নিহিত ভক্তি নিবেদন!

না, সত্যই কোনও নারীকণ্ঠে এমন অভিব্যক্তিপূর্ণ মধুর সঙ্গীত সে পূর্ব্বে কখনও শুনে নাই। বিমুগ্ধ চিত্তে সে শুনিতে লাগিল—

(এই) চির অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসি মুখে তুমি বয়েছ;
(আমার) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে,
বুকে করে নিয়ে রয়েছ!"

ঘুরিয়া ফিরিয়া সঙ্গীত-ধ্বনি কক্ষমধ্যস্থ বায়ুরাশিকে পুলকিত করিয়া বাহিরের সন্ধ্যার বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল।

এস্রাজের তারে শেষ ঝঙ্কার তুলিয়া গৌরী যন্ত্রটি এক পাশে রাখিয়া দিল।

তরলিকা প্রগাঢ় আলিঙ্গনে গৌরীকে আবদ্ধ করিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিল, "সার্থক তোমার গান শিক্ষা, সই! সত্যি তোমার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে হচ্ছে!"

গৌরী কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, "ছিঃ! দিদি! আমাকে আর লজ্জা দিও না।"

তরলিকা গাঢ়কণ্ঠে বলিল, "একটুও অত্যুক্তি নেই, খাঁটি সত্য কথা, প্রাণের কথা বলছি। তোমার এ গান শুন্‌লে অতিবড় পাষাণের চোখেও জল আস্‌তে বাধ্য।"

দাসী ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল।

তরলিকা মুহূর্ত্ত পরে বলিল, "ভাই, দুঃখের গান শুন্‌লে চোখে জল আসে। হাসির গান কি তোমার ভাল লাগে না?"

"না, ভাই, এই রকম গানই আমার প্রিয়। আমি বাবার কাছ থেকে বেছে বেছে রজনী সেন, রামপ্রসাদ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির গানই শিখেছি। অন্য গানও গেয়ে থাকি, কিন্তু আমার মন তাতে যেন ঠিক সাড়া দিতে চায় না।"

তরলিকা বাহিরে চাহিয়া দেখিল, নদীর জলে অন্ধকারের তরল ছায়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পর পারের শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজির যবনিকার অন্তরালে যেন কত রহস্য আত্মগোপন করিয়া আছে। সে নিবদ্ধদৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে চাহিল। এই তরুণীর দেহান্তরালস্থিত অন্তরের ভাবধারার সন্ধান কি সে পাইয়াছে?

তাহার মনে হইল, গৌরীকে যদি সে ভ্রাতৃজায়ারূপে পাইতে পারিত, তাহা হইলে তাহার দাদা নিশ্চয়ই সুখী হইতেন। কিন্তু অনিলাচন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্যের গভীরতা ও নিষ্ঠার কথা মনে পড়িতেই তাহার অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া গৌরী তরলিকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি হল, দিদি ?"

কিন্তু তরলিকা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই হৈমবতী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, একটু মুখ হাত ধোবে চল।"

গৌরী বলিল, "আমিও ততক্ষণ তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে, লক্ষ্মীর আসনটা দিয়ে আসি।"

তরলিকা বলিল, "তুমি রোজ লক্ষ্মীর আসন দেও না কি, বোন্ ?"

গৌরী মৃদু হাসিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

তরলিকার মনে হইল, পিতৃগৃহে সে প্রত্যহ সন্ধ্যায় মা লক্ষ্মীর পূজা করিয়া লক্ষ্মী ব্রতের কাহিনী সুরে সুরে গান করিত। কিন্তু বিবাহের পর আর সে কার্য্যের অবকাশ পায় নাই। স্বামীর সহিত কর্ম্মস্থলে আসিবার পর লক্ষ্মীর আসন প্রতিষ্ঠা করিতেও সে ভুলিয়া গিয়াছে। হিন্দু নারীর পক্ষে এ অবহেলা সঙ্গত নহে। সে মনে মনে সংকল্প করিল, আগামী কল্য হইতেই সে আবার স্বামী-গৃহে দেবীর পূজার ব্যবস্থা করিয়া ধন্য হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

বীরেশচন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তোমার পছন্দ আছে ; কিন্তু উপায় নেই। অনিলচন্দ্রের ধনুকভাঙ্গা পণ, বিয়ে সে কোন দিনই করবে না।"

হৈমবতী বলিলেন, "তুমি একটু যত্ন করে দেখ না। তরলিকাকে বলেছিলাম, তার খুব আগ্রহ আছে। প্রতুল বাবুরও মত আছে বলে শুনেছি।"

বীরেশ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে ত আমিও জানি। প্রতুলবাবুর ভারী ইচ্ছে গৌরীর সঙ্গে তাঁর শ্যালকের বিয়ে হয়। কিন্তু যে বিয়ে করবে, তারই যে শুকদেব গোস্বামীর মত প্রতিজ্ঞা।"

হৈমবতী কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না ?"

অধ্যাপক পত্নীর দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চাহিলেন।

হৈমবতী মৃদুস্বরে বলিলেন, "একদিন কৌশল করে গৌরীকে দেখিয়ে দাও—তার গান শুনিয়ে দাও। মানুষের মন ত !—"

বাকী যে কথাগুলি হৈমবতী বলিতে চাহিতেছিলেন, তাহা বাক্যে পরিস্ফুট হইল না।

বীরেশচন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তুমি ছেলেটির পরিচয় ভাল করে পাও নি ; তাই বলছ। আজ ক'মাস ধরে আমি ওর সকল বিষয় লক্ষ্য করে আস্‌ছি—ওর সকল মন্তব্য মন দিয়ে শুনে আস্‌ছি। নারীজাতিকে অনিল মায়ের মত শ্রদ্ধা ভক্তি করে। শক্তিরূপিণী নারীর প্রতি তার গভীর সম্ভ্রমবোধ ; কিন্তু কোন নারীকে অঙ্ক-লক্ষ্মী করে তোলবার ও ঘোর বিরোধী। কেন এমন মত, তার কোন সঙ্গত কারণ তার মুখ থেকে এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নি।"

বিরস বদনে হৈমবতী বলিলেন, "তবু একবার ভাল মতে চেষ্টা করে দেখ না! সেদিন ডেপুটীবাবুর বাড়ী ছেলেটির কি প্রশংসা শুনে এলুম !"

অধ্যাপক অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "সারা সহর শুদ্ধ লোকই অনিলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জেলার হাকিম, জজ, ডাক্তার সাহেব—একবাক্যে সকলেই এই শান্ত স্বভাব, ক্রীড়াবিদ্, পণ্ডিত ছেলেটির প্রশংসা করে থাকেন। আমাদের প্রিন্‌সিপাল বলছিলেন, দশ হাজারে এমন একজনও পাওয়া যায় না।"

আনমনে হৈমবতী বলিয়া উঠিলেন, "কি সুন্দর, মিষ্টি চেহারা !—"

উত্তেজিত ভাবে বীরেশ বাবু বলিলেন, "শুধু তাই ? গুণের কথা শোন। কাল ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী নৌকোয় বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর দাঁড় ভেঙ্গে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জলে পড়ে যান। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সঙ্গে ছিলেন, তিনিও জুতাজামা সমেত তাড়াতাড়ি জলে লাফিয়ে পড়েন। কিন্তু মেম সাহেবকে রক্ষা করা দূরে থাকুক, সেই বোঝা সমেত তিনি নিজেই হাবুডুবু খেতে আরম্ভ করেন। অনিল তখন নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। সেদিকে লোকজন মোটেই ছিল না। অনিল দেখ্‌তে পেয়েই তাড়াতাড়ি জুতা জামা খুলে ফেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছোকরার গায়ে যেমন অসীম ক্ষমতা, সাঁতারেও তেমনি ওস্তাদ। সাহেব মেমকে সে কৌশলে দুই হাতে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে তীরে নিয়ে আসে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এজন্য তার ওপর এমন খুসী হয়েছেন যে, কাল সন্ধ্যার

পরই সহরের যে সকল সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাঁদের কাছেই মুক্তকণ্ঠে অনিলের প্রশংসা করেছেন। আজ এজলাসে এসে উকীল মোক্তারদের কাছেও সে সব কথা বলেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী নিজে আজ তাকে বাংলোয় ডেকে নিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।"

বলিতে বলিতে বীরেশচন্দ্র সোজা হইয়া বসিলেন। তাঁহার আননে একটা প্রসন্ন দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনিলচন্দ্রের প্রশংসা শুনিয়া হৈমবতীর নারীহৃদয় এই যুবকের জন্য আরও আকুল হইয়া উঠিল। এমন পাত্রে যদি তাঁহার গৌরীমাকে অর্পণ করিতে পারিতেন !

অধ্যাপক কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সহরের ছেলের দল অনিলের এমন ভক্ত হয়ে পড়েছে যে, তার মুখের সামান্য কথায় তারা যেন প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। মহাত্মাজীর আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের এই সহরেও তার প্রবল ঢেউ এসেছে। কিন্তু অনিলের আদর্শে ছেলেরা এমন মুগ্ধ যে, তারা নিঃশব্দে চরকায় সুতো কেটে চলেছে। কোথাও কোন উত্তেজনা নেই। নীরবে কেমন করে মাতৃভূমির সেবা করা যায়, এই ক' মাসে অনিল তা দেখিয়ে দিয়েছে। এজন্য জেলার কর্ত্তারাও তার উপর রাগ করা দূরে থাকুক ভারী সন্তুষ্ট।"

হৈমবতীর হৃদয় যেন গৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তুমি অনিলকে একদিন এখানে নিয়ে এস। গৌরীর গান শুনিয়ে দাও। তাকে দেখ্‌লে অনিলের মন হয় ত ফিরে যেতেও পারে।"

বীরেশ বাবুর পিতৃহৃদয়, পত্নীর এই আশ্বাস বাক্যে হয় ত বা একটু আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না। কিন্তু অনিলের যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে ত ভরসা হয় না।"

হৈমবতী দ্বার-পথে প্রাঙ্গণের দিকে চাহিয়া ছিলেন। সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে তুলসীমঞ্চের তলে প্রদীপ জ্বলিতেছে। বস্ত্রাঞ্চল গলদেশে রাখিয়া গৌরী নত হইয়া প্রণাম করিল। প্রদীপের আলোক শিখা গৌরীর স্নিগ্ধ মুখে নৃত্য করিয়া উঠিল।

মাতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রাপ্ত-যৌবনা কন্যাকে আর এমন ভাবে রাখা কোন মতেই চলে না। জীবনের সুন্দরতম মুহূর্ত্তগুলি স্বামিগৃহে, স্বামি-সহবাসে যদি সার্থকতা লাভ করিতে না পায়, তাহা হইলে জীবন কি দুর্ব্বহ হইয়া উঠে না—ব্যর্থ হইয়া যায় না ?

বীরেশ বাবু ডাকিলেন, "গৌরী মা, তোমার হয়েছে ?"

"যাই, বাবা," বলিয়া গৌরী ধীর পদে সোপান পথ অতিক্রম করিয়া পিতার দিকে অগ্রসর হইল।

তাহার প্রসন্ন মুখে পূর্ণ শান্তির মধুর শ্রী।

কন্যা পিতার পার্শ্বে আসিয়া উপবিষ্টা হইলে বীরেশচন্দ্র তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "তোমার সব কাজ হয়ে গেছে ত, মা ?"

গৌরী উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, বাবা।"

"তবে এইবার বই নিয়ে এস। আজ বাল্মীকির রামায়ণের বনবাসের অধ্যায়টা তোমাকে শেষ করতে হবে।"

গৌরী ধীরপদে মূল রামায়ণখানি আনিয়া উজ্জ্বল প্রদীপালোকে পড়িতে বসিল।

শ্রীরামচন্দ্র সহধর্ম্মিণী সীতাদেবীকে বনগমনে নিবৃত্ত করিবার জন্য নানাবিধ বিপদ ও আশঙ্কার কথার উল্লেখ করিবার পর জনকনন্দিনী তেজোগর্ভ বাক্যে যখন পতিকে বলিলেন যে, তাঁহার পিতা কি একজন কাপুরুষের হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ ? তখন গৌরীর হৃদয় যেন আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে পিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা, হাজার হাজার বছর আগের হিন্দু স্ত্রীর এই কথা বাল্মীকির লেখায় অমর হয়ে নেই কি ?"

কন্যার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বীরেশচন্দ্র বলিলেন, "তুই ঠিক ধরেছিস্ মা। সীতা বীরের কন্যা, বীরের পুত্রবধূ, মহাবীরের সহধর্ম্মিণী। তাঁর মুখে এই রকম উক্তিই শোভন। কিন্তু হিঁদুর মেয়েরা এ যুগে সে মহা আদর্শের কথা ভুলে গেছে।"

তখন পিতা ও পুত্রী আবার রামায়ণের মধুর কাব্য মাধুর্য্য ও চরিত্র সৃষ্টির অনবদ্য মহিমার মধ্যে আপনাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দিল।

হৈমবতী নিজের কাজ সারিয়া তাঁহাদের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। (ক্রমশঃ)

নারী—পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দু-সমাজে

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি-এ, এটর্ণী-এট-ল

প্রথম প্রবন্ধ

আজকাল সর্ব্বত্রই নারী-জাগরণের কথা শুনা যাইতেছে। তাঁহারা চিরকালই অত্যাচারিত হইয়া আসিয়াছেন—এখন তাঁহারা শিক্ষিতা হইয়া তাঁহাদিগের ন্যায্য স্বত্বাধিকার চাহিতেছেন। পুরুষদিগের মতন সকল কর্ম্ম করিবার—বিশেষতঃ অর্থকরী কর্ম্ম করিবার তাঁহাদিগের অধিকার থাকা উচিত—তাঁহারা সকল অর্থকরী কর্ম্ম করিতে না পাওয়ার নিমিত্ত পুরুষদিগের দাসী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পুরুষরা যথেচ্ছা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে—নারীরা সেরূপ করিলেই যত দোষ—তাহা করিলে তাঁহাদিগকে ইহলৌকিক অনেক নির্য্যাতন সহিতে হয়—পারলৌকিক অনেক ভয় দেখান হয়। নিজেরা পচ্ছন্দ করিয়া বিবাহ করা উচিত—বিবাহ অসুখকর বোধ হইলেই বিচ্ছেদ করিতে দেওয়া উচিত—পারিবারিক জীবনে স্বামীর কোনরূপ আধিপত্য তাঁহাদের উপর থাকা উচিত নয়—রাজনৈতিকক্ষেত্রে তাঁহাদিগের ভোট থাকা উচিত—ব্যবস্থাপক সভার সভ্যা হইতে পাওয়া উচিত ইত্যাদি নানাপ্রকার স্বত্বাধিকার প্রসারের দাবী শুনা যাইতেছে। হিন্দু-সমাজ চিরকালই নারীদের উপর ঘোর অত্যাচারী—তাহাদিগকে অবজ্ঞা করে—এই সকল স্বত্বাধিকার দিতে অসম্মত—বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত মনে করে না—বালিকাদিগকে অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া তাহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি বিকাশের পথ রুদ্ধ করে। সুতরাং হিন্দু-সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক—তাহা না করিলে আমাদের উন্নতির কোন প্রত্যাশাই নাই, ইহা অনেক তরুণ তরুণীরা প্রমাণিত সত্য বলিয়া ধরিয়া লয়েন; বোধ হয় পাশ্চাত্যের নারীদিগের উক্তপ্রকার স্বত্বাধিকার প্রসার দেখাইয়া আমাদিগের গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

যাঁহারা প্রথম হইতেই ধরিয়া লয়েন যে হিন্দু-সমাজ সকল পুরাতন অসভ্য সমাজের মতন নারী-নিগ্রহী, তাঁহাদিগকে দেখিতে বলি যে হিন্দু ভিন্ন কোন সভ্য সমাজ এ পর্য্যন্ত ভগবানকে নারী আকারে দেখে না—কল্পনাও করে না। যদি সত্য সত্যই আমরা নারীকে হেয় বা নীচ মনে করিতাম—অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতাম, তাহা হইলে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে নারী আকারে দেখিতাম না—কল্পনা করিতাম না—দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতারা বার বার নারী-দেবতার শরণাপন্ন হইয়া অসুরদিগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার কথা আমাদের ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত হইত না—আপদকাল উপস্থিত হইলেই গৃহে গৃহে চণ্ডীপাঠ হইত না—জীবনের প্রধান কাম্যবস্তুর—শক্তি, অর্থ ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আমরা নারীভাবে কল্পনা করিতাম না—এরূপ কল্পনা করা অসঙ্গত হয়। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিবারস্থ সকল নারীদিগের প্রতি—(ভগিনী, দুহিতা, পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ, জ্ঞাতি, বন্ধুপত্নী, শিষ্যা প্রভৃতি) কেবল নিজের নিজের পত্নীটির প্রতি নয়—সসম্মান ব্যবহার করিবার যেরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ আছে—সেরূপ ব্যবহার না করিলে যে সে কুলের ইহকালও নাই পরকালও নাই বলা আছে—সেরূপ অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায় না। * আমরা

* যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বস্তত্রাফলা ক্রিয়াঃ॥ মনু ৩ অধ্যায় ৫৬
শোচন্তি জাময়ো ‡ যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥ ৫৭
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যা হতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥ ৫৮
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতি কামৈনরৈ নিত্যং সৎকারেষুৎসবেষু চ॥ ৫৯

‡ জাময়ঃ—ভগিনী, পত্নী, দুহিতা, পুত্রবধূ, ইত্যাদি। কৃত্যাহতা—অভিচারহতা

সকল স্ত্রীলোককেই মাতৃসম্বোধন করিয়া থাকি—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—আমাদের চলিত প্রবাদ মধ্যে গণ্য।

ইহা হইতে প্রমাণ হয় কোন সমাজই হিন্দুদের মতন নারীদের এত সম্মান করে নাই—এত উচ্চ স্থান দেয় নাই। সুতরাং সকল ক্ষেত্রে নারীদিগের পুরুষদিগের মতন সমান অধিকার না থাকার নিমিত্ত হিন্দু-সমাজকে নারীনিগ্রহকারী ধরিয়া না লইয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখা যাউক সমাজে নারীর স্থান ও কর্ম্ম কি হওয়া উচিত—হিন্দু আদর্শই বা কি, ও তাহা নারীদের পক্ষে, সমাজের পক্ষে, সচরাচর সাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না—পাশ্চাত্য আদর্শ অধিকতর মঙ্গলজনক কি না। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক বিধি নিষেধ, নিয়মাবলি সাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না দেখিতে হয়—ব্যক্তিগতভাবে তাহাতে অনেকের পক্ষে অন্যায় হইতে পারে—কিন্তু সমষ্টির সুবিধা ও মঙ্গলের জন্য সকল সমাজকেই ব্যষ্টির সুবিধা উপেক্ষা করিতে হয় তাহা অপরিহার্য্য—তাহা যেন মনে থাকে।

আর একটি কথা আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিলে তাহাদিগের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার হয় না—তাহাদিগের মঙ্গলজনক হয় না। বাঘকে ও গরুকে একই আহার দিলে তাহাদিগের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার হয় না—সকল লোককে একই রকম আহার দিলে তাহাদের উপযোগী হয় না। একই রকম কার্য্য করিতে দিলে তাহাদিগের অনেকের প্রতি অত্যাচার হইতে পারে। হৃদ্‌রোগগ্রস্ত লোকদিগকে যানবাহকের কার্য্য করিতে দেওয়ায় তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়। যাহার যে কার্য্য করিতে উপযুক্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প আছে, তাহাদিগকে সেই কার্য্য করিতে না দেওয়া,—ও যাহাদের যে কার্য্য করিবার সহজ পটুতা আছে তাহাদিগকে সেই কার্য্য করিতে দেওয়া, সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। এইজন্য যাহাদের স্বাস্থ্য ভাল নয় তাহাদিগকে সৈনিক হইতে দেওয়া হয় না। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষমতা ও গুণাগুণ বিচার করিয়া তবে লোকেদের কার্য্য নির্দ্দেশ করাই সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর—ইহা সকল সভ্য সমাজে একবাক্যে স্বীকৃত।

পুরুষ ও নারীর শরীর গঠনের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে সাধারণতঃ নারীর শরীরের আয়তন, দেহের ও পেশীর শক্তি, পুরুষের অপেক্ষা কম, অস্থিও দুর্ব্বলতর, দেহও কোমলতর। তাহাদের মস্তিষ্কের ওজন ও জটিলতা (convolutions) মস্তিষ্কের অগ্রভাগের (cerebrum) ও পশ্চাদ্ভাগের (cerebellum) ও স্নায়ুগ্রন্থির (nerve ganglia) ওজনও পুরুষের অপেক্ষা কম। কিন্তু থ্যেলেমাস, (Thalemus) যাহা সম্প্রতি ভাবপ্রবণতার (emotions) উৎপত্তি স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা পুরুষদিগের অপেক্ষা বড়। শুধু এই শরীর ও মস্তিষ্কের পার্থক্য হইতে দেখা যায়, যে পুরুষ ও নারীর একই প্রকার কর্ম্ম হওয়া বিধেয় নহে। একই প্রকার কর্ম্ম করিতে হইলে নারীদিগেরই দুর্গতি হইতে বাধ্য, কারণ, তাহারা দুর্ব্বলতর। আবার নারীদিগের মাতৃত্ব উপযোগী অঙ্গ সকল আছে (fallopian tube, uterus, ovary, breast) এবং সেই সকল অঙ্গ, কাম উপভোগ উপযোগী অঙ্গ অপেক্ষা বৃহত্তর—শেষোক্ত অঙ্গ পূর্ব্বোক্ত অঙ্গের কতক অংশের সহিত জড়িত। নারীর শরীর গঠন এরূপ যে মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশের নিমিত্ত—পূর্ণ গর্ভাবস্থায় মাতৃত্বের অঙ্গের নিকটস্থ সকল অঙ্গকে অবকাশ দিতে হয়। মাতৃত্বের অঙ্গ সকলে বহু স্নায়ু ও স্নায়ুগ্রন্থি আছে তাহা শরীরের অন্য অংশের সহিত জড়িত। তাহাদের স্নায়ু সকল তাহাদের মাতৃত্বের উপযোগী—অধিকতর সূক্ষ্মানুভূতিশীল—সহজেই উত্তেজিত হয়। তাহারা বহুকাল অল্প পরিশ্রম করিতে পারে—পুরুষরা সময়ে সময়ে অধিক পরিশ্রম করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের তজ্জন্য অধিক বিশ্রাম আবশ্যক। মাতৃত্বের অঙ্গ সকল আছে বলিয়াই তাহাদের মাতৃত্বের প্রকৃতিজ প্রেরণা আছে। শিশুদিগকে স্তন্যপান করাইয়া, পালন ও আদর করিয়া তাহারা যে পরিমাণে সুখী হয়—পুরুষরা সেরূপ হয় না। মাতৃত্বের উপরই সৃষ্টি নির্ভর করে—সুতরাং মাতৃত্বের অঙ্গগুলি তাহাদের প্রধান অঙ্গের মধ্যে গণ্য। পুরুষ ও স্ত্রীর পার্থক্য

ইহা 'নার নিগ্রহী' মনুরই আদেশ। নারী ব্যবহার সম্বন্ধে "পূজ্যন্তে" শব্দের ব্যবহারটির দিকে তরুণদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মিতাক্ষরা আইন প্রবর্ত্তক যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

ভর্ত্তৃ, ভ্রাতৃ, পিতৃ, জ্ঞাতি, গুরু, শ্বশুর দেবরৈঃ।
বন্ধুভিশ্চস্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ॥

এই মাতৃত্বেই—সুতরাং মাতৃত্বই স্ত্রীত্ব। জীবজগতের ভিতর মানুষই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত (evolved) ; সুতরাং নারীদিগের মাতৃত্বও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকশিত। তজ্জন্য মাতা ও অপত্যদের সম্বন্ধ জীবনব্যাপী ও মাতৃত্বের অঙ্গীভূত সেবাপরায়ণতা, ত্যাগশীলতা, পরার্থপরতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকশিত—ক্রমে মানবজাতিতেই বহুবিস্তৃত। সেইজন্য লোকেরা যত পরস্পর সহায় ও নির্ভরশীল তত কোন জন্তু নয় ও পরস্পর সহায়শীলতার জন্যই মানবজাতি এত উন্নতি করিতে পারিয়াছে। Benjamin Kidd on Science of Power বা ১৩৩২ সালের মাঘ সংখ্যার "বিবাহ ও সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। জন্তুদের ভিতর দেখা যায় যে স্ত্রী জন্তুরা কাম উপভোগের পরেই গর্ভবতী হয়—যাহাদের গর্ভবতী হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহারা কাম উপভোগ করে না। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে প্রকৃতির নির্দ্দেশে স্ত্রীলোকের কাম তাহাদের মাতৃত্ব বিকাশের সহায়ক মাত্র—তাহাদের কাম ও মাতৃত্বের অঙ্গ জড়িত বলিয়া অনেক সময়ে মাতৃত্বের প্রকৃতিজ প্রেরণা কাম বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই সকল কারণে নারীদিগের কর্ম্ম এরূপ হওয়া উচিত যে তাহাতে মাতৃত্বের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়—মাতৃত্বের অঙ্গগুলির সম্যক ব্যবহার হইতে পায়। অঙ্গ থাকিলেই তাহার ব্যবহার করিবার প্রেরণা প্রকৃতি হইতেই আসে—অধিকদিন ব্যবহার না করিতে পাইলে সেই অঙ্গের স্নায়ু সকল শুষ্ক (atrophied) হইয়া যায়—সেই অঙ্গ ক্রমেই অব্যবহার্য্য হয়—অনেক সময়ে তজ্জন্য অনেক ব্যাধি হয়। মাতৃত্বের অঙ্গগুলি বহুকাল ব্যবহার করিতে না পাইলেও সেইরূপই হয়—মাতৃত্বের প্রকৃতিজ আকাঙ্ক্ষাও ক্রমে লুপ্ত হয়। হস্তপদাদি প্রধান অঙ্গ কোন লোককে ব্যবহার করিতে না দিলে তাহার উপর যেরূপ অত্যাচার করা হয়, স্ত্রীলোকদিগের মাতৃত্বের অঙ্গগুলি বহুকাল বা চিরকাল ব্যবহার করিতে না দিলে তাহাদের উপর সেইরূপই ঘোর অত্যাচার হয়। যাবৎ স্ত্রীলোকদিগের রজোনিঃসরণ হয় তাবৎ, তাহারা মাতা হইতে পারে—তাহার পূর্ব্বেও পারে না—তাহার পরেও পারে না। সুতরাং রজোনিঃসরণের আরম্ভ হইতেই নারীরা মাতা হইবার উপযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সকল স্ত্রী জন্তুরাই তৎকাল হইতেই কাম উপভোগ করে ও গর্ভবতী হয়—তাহার পর সামান্য দিনও অপেক্ষা করে না। সুতরাং প্রকৃতির নির্দ্দেশ এই যে তৎকাল হইতেই স্ত্রীলোকদিগকে কামের ও মাতৃত্বের অঙ্গ সকল ব্যবহার করিতে দেওয়া বিধেয়। এই সকল বিষয়ে সর্ব্ববাদী সম্মত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত—Havelock Ellis লিখিয়াছেন যে রজোনিঃসরণের প্রারম্ভই নারীদিগের যৌন পরিপক্কতা নির্দ্দেশ করিতেছে—("Sexual maturity is determin d in women by a precise biological event the completion of puberty on the onset of menstruation." See Psychology of Sex, Vol. VI, Page 524.) রজোনিঃসরণের পর স্ত্রীলোকদিগকে বহুকাল কামের ও মাতৃত্বের অঙ্গ সকল ব্যবহার না করিতে দেওয়ায় তাহাদের উপর অত্যাচার করা হয় এবং এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে অবিবাহিতা কন্যাদের তৎকালে হিষ্টিরিয়া, রজোসংক্রান্ত নানান ব্যাধি, অজীর্ণ, মাথাধরা, মাথাঘোরা প্রভৃতি নানা ব্যাধি ও অনেক সময়ে অতি দুস্য রক্তহীনতা, (Chloro is, Persistent Anæmia) হৃৎপিণ্ডের ব্যাধি হয়—ইহা সকল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত স্বীকার করেন। সুতরাং আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগের অল্প বয়সে বিবাহ দিবার প্রথা তাহারা রজোদর্শনের প্রারম্ভ হইতেই যাহাতে কাম ও মাতৃত্বের অঙ্গ ব্যবহার করিতে পারে ও তাহা করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত না হইতে হয়, তজ্জন্যই হইয়াছে। এইরূপ ব্যবহার না করিতে পাইলে তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা হইত—তাহা নিবারণ করা অল্পবয়সে বিবাহ দিবার এক প্রধান উদ্দেশ্য। সংস্কারকেরা এই প্রথাকে যে দোষনীয় বলেন তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। তাঁহারা যে বলেন বাল্যে বিবাহ হওয়ায় বালিকাদিগের শিক্ষা হইতে পায় না—সে কথাটিও ভ্রমাত্মক। কারণ বধূরা তাহাদের স্বামীর বংশের পোষ্যকন্যা—তজ্জন্য তাহাদের বিবাহের সময় গোত্রান্তর হয়—সুতরাং তাহাদের শিক্ষার ভার তাহাদের পোষক পিতা—অর্থাৎ শ্বশুর ও স্বামীর উপর সমর্পিত হয়—তাহাদের সংসারের উপযোগী ভাবে শিক্ষা দেওয়া তাহাদেরই কর্ত্তব্য,—দিয়াও থাকেন। পিতৃগৃহে প্রাপ্ত শিক্ষা স্বামীর বংশের অনুপযোগী হইতে পারে—অনুপযোগী শিক্ষাতে বিরোধের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই তাহা নিরাকরণ করিবার

উদ্দেশ্যেই—দাম্পত্য-প্রেমের পূর্ণ-বিকাশের উদ্দেশ্যেই—বধূদের শিক্ষার ভার স্বামীর বংশের উপর সমর্পিত। যদি তাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষা না পান, তাহা আমাদের সমাজ-গঠনের দোষ নয়—শ্বশুর-শাশুড়ী বা স্বামীরই দোষ।

স্ত্রীলোকদিগের রজোনিঃসরণ-কালীন তাহাদের শারীরিক নানা বিপর্য্যয় হয়—স্নায়ু সকল এত উত্তেজিত হয়, এত বিকৃত ভাবাপন্ন হয় যে তৎকালে তাহাদের বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক—সকল ডাক্তারেরাই স্বীকার করেন। এই বিশ্রাম না পাইলে তাহাদের বিশেষ কষ্ট হয়—নানা ব্যাধি হয়—অনেক সময়ে তাহা দুরূহ আকার ধারণ করে। গর্ভকালীন ও অপত্যেরা যতদিন ছোট থাকে, ততদিন তাহাদের সেবা ও তত্ত্বাবধারণের জন্য, সে সময়ে অন্য কর্ম্ম করিতে হইলে নারীদের বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা হয়—শিশুদেরও কষ্ট ও অনেক সময়ে দুর্গতি হয়। ধনী স্ত্রীলোকেরা হয় তো শিশুর পরিচর্য্যা অন্য স্ত্রীলোকদিগের দ্বারায় করাইতে পারেন—কিন্তু সাধারণ স্ত্রীলোকরা তাহা পারে না। সুতরাং তাহাদেরও শিশুদের দুর্গতি হয়। সুতরাং নারীর শরীর গঠন ও তাহার ক্রিয়া হইতে প্রতীয়মান হয় যে তাহাদের কর্ম্ম এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে (১) তাহাদের মাতৃত্বের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়—অর্থাৎ (ক) রজোনিঃসরণের প্রারম্ভ হইতেই মাতা হইবার স্বাধীনতা থাকে (খ) গর্ভকালীন ও যাবৎ অপত্য ছোট থাকে তাবৎ তাহাদের তত্ত্বাবধারণ, যত্ন ও সেবা করিবার পূর্ণ অবকাশ থাকে, ও তাহাদের তজ্জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা-ভারগ্রস্তা না হইতে হয় বা বিশেষ কষ্ট না সহ্য করিতে হয়। (২) মাসিক রজোনিঃসরণ কালীন বিশ্রাম পায় (৩) শরীরের আপেক্ষিক দুর্ব্বলতা ও স্নায়ুর ক্রিয়া পার্থক্যের অনুপযোগী না হয়। যদি তাহাদের কর্ম্মে উপরিউক্ত কোনটির ব্যাঘাত হয় তাহা হইলে সেরূপ কর্ম্ম করায় বা করিতে পাওয়ায়, বা বাধ্য হওয়ায় তাহাদিগের স্বত্বাধিকার প্রসার না হইয়া তাহাদের উপর অত্যাচারই করা হয়।

পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকরা সম্প্রতি বহু অর্থকরী কর্ম্ম করিতেছে—তাহাদিগকে ভোট-অধিকার দেওয়া হইয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অনেক কর্ম্ম করিতেছে বলিয়া আমাদের তরুণ-তরুণীরা অনেক বৃদ্ধরাও মনে করেন যে এইরূপ কর্ম্ম করিতে পাওয়ায়, নারীদের স্বত্বাধিকার প্রসার করা হইতেছে এবং আমাদেরও সেইরূপ করা উচিত। পাশ্চাত্যে কেন এরূপ হইয়াছে তাহা পরে বুঝিবার চেষ্টা করিব। এখন দেখা যাউক এরূপ করিতে পাওয়া সাধারণতঃ নারীদিগের মঙ্গলজনক, কি, না।

অতি অল্প অর্থকরী বা রাজনৈতিক কর্ম্ম আছে যাহাতে নারীরা প্রথমতঃ মাসিক তিন চারি দিন বিশ্রাম পাইতে পারেন ও গর্ভাবস্থায় ও অপত্য হইবার পর কিছুকাল বিশ্রাম পাইতে পারেন। সুতরাং এই সকল কর্ম্ম, যাহাতে তাহারা সেইরূপ বিশ্রাম পায় না তাহা করিতে দেওয়া বা পাওয়া তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়—সমাজের পক্ষেও মঙ্গলজনক নয়। কেবল লুপ্ত-গর্ভধারণশক্তি নারীদের জন্য ঐ সকল কর্ম্ম করিতে পাওয়া হয় তো দোষাবহ না হইতে পারিত, কিন্তু ঐরূপ স্বত্বাধিকার সাধারণভাবে সকল নারীদের জন্য চাওয়া হইতেছে—পাশ্চাত্যে তাহাই হইয়াছে এবং তাহার ফলে কি কুমারী, কি বিবাহিতা, কি বৃদ্ধারা সকলেই অর্থকরী কর্ম্মে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। কিন্তু সকল স্ত্রীলোকরা এইরূপ কর্ম্মে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে যে শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা আবশ্যক বা অনুপযোগী নয়, তাহাদের সেইরূপ কর্ম্ম পাইবার পথই সঙ্কুচিত হইতেছে ; কারণ তাহাতে ঐরূপ কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে। এই সকল কর্ম্ম পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় করিতে হইলে যে মাসিক বিশ্রাম তাহাদের একান্ত আবশ্যক তাহা পাইতে পারে না, তজ্জন্য তাহাদের শারীরিক কষ্ট অবশ্যম্ভাবী—স্বাস্থ্যহানিও হয়—সুতরাং নারীদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়—এরূপ কর্ম্ম করিতে পাওয়ায় তাহাদিগের স্বত্বাধিকার প্রসার বলা সঙ্গত নয়, বরং এইরূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হওয়াই তাহাদের উপর অত্যাচার ; সুতরাং এইরূপ কর্ম্ম যত কম করিতে বাধ্য হয় ততই তাহাদের পক্ষে ভাল এবং সেইরূপে সমাজ-গঠন হওয়াই বিধেয়। একে তো গরীবদের অর্থকরী কর্ম্ম করিতে গেলেই তাহাদিগকে অশেষ ফৈজিয়তী ভোগ করিতে হয়, তাহা কি পুরুষদিগের কি নারীদিগের। এখনও পাশ্চাত্য-সমাজে সদুপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করা যুবতী-শিক্ষিতা নারীদিগেরও বিশেষ অপমানজনক অনেকের সে জ্ঞানই নাই। জগদ্বিখ্যাত লেখক Hall Caineএর

'The Woman thou gavest me', H. G. Wellsএর 'Ann Veronica', Victor Hugoর Les Miserablesএতে Fantineএর উপাখ্যান পড়িলে তাহা দেখিতে পাইবেন। অনেক সময়ে চরিত্রহীনতা আর্থিক উন্নতির সহায়ক হয়—সেইজন্য অনেকেরই পদস্খলন হয়। এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে পাশ্চাত্যের বারবনিতাদের ভিতর অধিকাংশকেই অর্থকরী কর্ম্ম করিতে গিয়া ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। Havelock Ellis (See Psychology, of sex Vol. VI. 557 to 558) লিখিয়াছেন যে কলকারখানায় কর্ম্মকারিণী (Factory girls) বাড়ীর পরিচারিকা, দোকানে বিক্রয়কারিণী (Shopgirls) হোটেলাদিতে পরিচারিকা (waitresses) হইতে অধিকাংশ বারবনিতা আসে। যাহারা দরজীর কাজ করে তাহাদের অনেকেই যখন ব্যবসা ভাল না চলে তখন বেশ্যাবৃত্তি করে, অনেকে দুই কার্য্য একত্রেই করে। মুক্তি ফৌজের (Salvation army) খাতা হইতে প্রকাশ হইয়াছে যে লণ্ডন্ সহরের পশ্চিমাংশে যেখানে অধিকাংশ গরীবরা বাস করে সেখানে শতকরা ৮৮টি বেশ্যা চাকরাণী শ্রেণী হইতে আসিয়াছে। লণ্ডন সহরে ১৬০২২টি বেশ্যাদের ভিতর তদন্ত করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে যে ৫০৬১টি বেশ্যা আনন্দ উপভোগ করিবার নিমিত্ত বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, ৩৩৬৩টি দৈন্যের নিমিত্ত, ৩১৫৪টি প্রতারিত হইয়া, ১৬৩৬টি পুরুষরা বিবাহের প্রতিজ্ঞা করায় ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। The Great social Evil নামক পুস্তকে Logan সাহেব লিখিয়াছেন যে বেশ্যাদের ভিতর এক-চতুর্থাংশ পূর্ব্বে হোটেলাদিতে কর্ম্ম করিত—এক-চতুর্থাংশ কলকারখানায় কর্ম্ম করিত, এক-চতুর্থাংশ কুট্টনী দ্বারায় প্রতারিত, এক-চতুর্থাংশ কর্ম্মাভাবে, (তাহা কতক নিজেদের দোষে) আর বিবাহের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়ায় বেশ্যাবৃত্তি করে। বার্লিন ও ভিয়ানা সহরের শতকরা ৫১টি ও ৫৮টি বেশ্যা চাকরাণী শ্রেণী হইতে আসিয়াছে। Havelock Ellis আরও লিখিয়াছেন যে অনেক শ্রমিক ও গরীব মধ্যবিত্তদের কন্যারা যে গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তি করে তাহা নিশ্চয়। Acton সাহেব On prostitution নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে অসংখ্য বৃটিশ নারী মধ্যে মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া থাকে। বেশ্যা হওয়ার প্রধান কারণ তাঁহার মতে কর্ম্মের অভাব ও পারিশ্রমিকের অল্পতা। আবার অনেকে মনে করেন যে চাকরী করিতে গিয়া ধনীদিগের ভোগাতিশয্য দেখিয়া প্রলোভিত হইয়াই অধিকাংশ এইরূপ বেশ্যাবৃত্তি করে। লালা লজপত রায় তাঁহার Unhappy India নামক পুস্তকে ১৮ অধ্যায়ে James marchant এর The master problem ও Dr. Blochএর Sexual life of our time, Glass of fashion ও অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য সমাজতত্ত্ববিৎদিগের লেখা হইতে দেখাইয়াছেন যে অধিকাংশ দোকানের বিক্রয়কারিণীদের গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তি করিতে হয়। অনেক সেবাসদন (nursing homes) স্নানাগার (baths) গা, হাত, পা টেপাইবার স্থান (massage establishment) নাচ ও গানের স্থান, থিয়েটার, মদের দোকান, হোটেল, গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তির স্থানের মধ্যেই গণ্য—সেখানে যে সকল তরুণীরা কার্য্য করে তাহাদের প্রকৃত কার্য্যই বেশ্যাবৃত্তি। * অনেক কর্ম্মপ্রার্থিনীদিগকে নানাপ্রকারে প্রলোভিত করিয়া,—ভয় দেখাইয়া,—বিপদগ্রস্তা করিয়া বেশ্যাবৃত্তি করিতে বাধ্য করে বলিয়া ইংরাজ সরকার হইতে ইস্তাহার জারি করিয়া সাবধান করা হইয়াছিল যে যেন তরুণীরা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়া চাকরী সন্ধান আপিস হইতে খবর পাইয়া,—বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া—চাকরী করিতে না যায়—অপরিচিত লোকের সহিত কথা না কহে—রবিবারের স্কুলে ও বাইবেল ক্লাসে অপরিচিতের আহ্বানে যোগ না দেয়—নিজের গন্তব্য পথ জিজ্ঞাসা না করে—কাহারও হঠাৎ বিপদের কথা শুনিয়া সাহায্য করিতে তাহার সহিত না যায়—ইত্যাদি † (যাঁহারা অবরোধ

* The Master Problem P. 186.

† The notification is quoted in extenso (see Ibid P. 188.)

Warning to Girls, Forewarned is Forearmed.

"Girls should never speak to strangers, either men or women, in the Street, in shops, in stations, in trains, in lonely country roads, or in places of amusemen .

Girls should never ask the way of any but officials on duty, such as policemen, railway officials, or postmen,

Girls should never loiter or stand about alone in the Street and if accosted by a stranger (whether man or woman) should walk as quickly as possible to the nearest policeman,

Girls should never stay to help a woman who apparently faints at their feet in the street, but should immediately call a policeman to her aid.

Girls should never accept an invitation tc join Sunday School or Bible Class given them by strangers, even if they are wearing the dress of a sister or nun, or are in clerical dress.

Girls should never accept a lift offered by a stranger in a motor, or taxi-cab, or vehicle of any description,

Girls should never go to an address given them by a stranger, or enter any house, restaurant, or place of amusement on the invitation of a stranger,

Girls should never go with a stranger (even if dressed as a hospital nurse) or believe stories of their relatives' having suffered from an accident or being suddenly taken ill, as this is a common device to kidnap girls.

Girls should never accept sweets, food a glass of water, or smell flowers offered them by a stranger ; neither should they buy scents or other articles at their door as so many things may contain drugs.

Girls should never take a situation through an advertisement or a stranger, or registry office either in England or abroad, without first making enquiries from the Society to which they belong.

Girls should never go to London or any large town for even one night without knowing of some safe lodging".

প্রথা দোষাবহ মনে করেন, তাঁহারা যেন তরুণীদিগের এই সকল বিপদের কথা মনে রাখেন)। তরুণীদিগের অর্থকরী কর্ম্ম করিতে যাওয়ায় পাশ্চাত্যেই ফল কিরূপ বিষময় হয় তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিলাম। গরীবদেরই অর্থকরী কর্ম্ম করিবার আবশ্যক—পেটের দায়ে যখন যে কর্ম্ম করিবার সুবিধা পায়, তাহাই লইতে বাধ্য হয়—তাহার ভালমন্দ বিবেচনা করিবার অবসরই থাকে না—প্রতারকদিগের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিবার ক্ষমতাও তরুণীদিগের নাই—আমাদের দেশের অনেক বয়োবৃদ্ধদিগেরও নাই—আড়কাঠিদের দ্বারায় কুলি সংগ্রহের কাহিনী যেন স্মরণ থাকে—সুতরাং গরীব তরুণীদিগকে অর্থকরী কর্ম্ম করার প্রলোভন অধিকাংশ স্থলে কুট্টনিদিগের দ্বারায় প্রলোভন দেখাইয়া গৃহ হইতে বাহির করার প্রথম সোপান মাত্র হইয়া পড়ে। ইহাকেই 'নারীস্বত্বাধিকার' প্রসার বলিয়া সংস্কারকেরা আমাদের গৃহলক্ষ্মীদিগকে বোঝাইতেছেন!

পাশ্চাত্যের ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ গঠনের দোষে সকলকে নিজের নিজের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া অধিকাংশ লোকেরা বহুকাল—অনেকে চিরকাল বিবাহ করিতে পায় না—অধিকাংশেরই যৌবন উত্তীর্ণ হইয়া যায়; সুতরাং বহু নারীরা বহু কাল—অনেকে চিরকাল—অবিবাহিতা থাকে; সুতরাং পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থকরী কর্ম্ম করার নিগ্রহ ভুগিতে হয়—তজ্জন্যই তাহারা সকল অর্থকরী ও অন্যান্য কর্ম্ম পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় করিতে চাহিতেছেন—এবং ইহাই উন্নতির চিহ্ন—নারী স্বত্বাধিকার প্রসার বলিয়া ধরিয়া লইতেছি এখানে সেইরূপ করিতে অনেকে চাহিতেছেন। ইহার ফল কি হইতেছে ও হইয়াছে তাহা স্থির চিত্তে দেখিতে বলি। বহু অবিবাহিতা নারী এইরূপ অর্থকরী কর্ম্মে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে—Law of supply and demandএর নিমিত্ত—সকল কর্ম্মের পারিশ্রমিকের হার কমিয়া যায়। যত নারীরা এইরূপ কর্ম্ম করে তত পুরুষরা সেই সেই কর্ম্ম করিতে পায় না—তাহারা কর্ম্ম পাইলে হয় তো অনেকে বিবাহ করিয়া অন্য কতকগুলি স্ত্রীলোককে অর্থকরী কর্ম্ম করিবার ফৈজয়তী হইতে অব্যাহতি দিতে পারিত—তাহা তাহারা পারে না—সুতরাং সেই সকল নারীরাও অর্থকরী কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং যত অধিক নারীরা অর্থকরী কর্ম্মে নামিতেছে তত বিবাহের সংখ্যা কমিতেছে—পাশ্চাত্যেই তাহাই হইতেছে—তাহা নারীদিগের পক্ষে ভাল কি মন্দ পরে আলোচনা করিব। এইরূপ বহু নারীরা বহুকাল অবিবাহিত থাকায় ও প্রতিযোগিতায় পুরুষদিগের সহিত অর্থকরী কর্ম্ম করায়—পুরুষ ও নারীদিগের ভিতর একটা রেশারিশি—একটা বিদ্বেষভাব উপস্থিত হয়—(যাহার অন্য গৌণ কারণও আছে)—যাহা পাশ্চাত্যে আসিয়াছে ও ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ইহা সকল নারীস্বত্বাধিকার প্রসারের নেতারাই স্বীকার করেন। এইরূপ প্রতিযোগিতায় পুরুষদিগের সহিত বহুকাল কর্ম্ম করায় তাহাদের স্ত্রীস্বভাবসুলভ কোমলতার পরিবর্ত্তে পুরুষসুলভ কাঠিন্য আসে—সহানুভূতির প্রেরণা কমিয়া যায়, যাহা পরে তাহাদিগকে মাতৃত্বের

ও বিবাহিত জীবনের ও গৃহস্থালী কর্ম্ম করিবার বহুকাল অভ্যাস অভাবে অনুপযুক্ত করিয়া তোলে—মাতৃত্বের ও গৃহস্থালী কর্ম্মে আর তাহারা সেরূপ সুখ পায় না—বরং কষ্ট হয়—অপরের সুখ সুবিধার নিমিত্ত নিজের সুখ সুবিধা বলি দিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা—যাহার উপর বিবাহিত জীবনের সুখ ও শান্তি প্রধানতঃ নির্ভর করে—তাহাই কমিয়া যায়—সুতরাং বিবাহিত জীবনের সুখ শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা আনিতে অপারগ হইয়া পড়ে—তাহাদের বিবাহিত জীবন অশান্তিময় হয়—এইরূপ সাধারণতঃ হওয়া অপরিহার্য্য—পাশ্চাত্যে তাহাই হইতেছে। সেইজন্য বিবাহ বিচ্ছেদ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে এবং তাহাই নারীস্বত্বাধিকার প্রসার ও উন্নতির চিহ্ন তরুণ তরুণীরা ধরিয়া লইতেছেন। যদি অপত্য থাকে বিবাহ বিচ্ছেদে তাহাদের কিরূপ দুর্দ্দশা হয় তাহা দেখিয়া মাতাদের কিরূপ কষ্ট হয় তাহা ভাবিতে বলি। নিজেরাই পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন—প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিলেন—কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ; সেই সকল চূর্ণ হইয়া গেল—প্রেমাস্পদের কুব্যবহার অসহ্য হইল—গৃহ ভগ্ন হইল—আবার নূতন করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে—আবার হয় তো মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে—কত মনোমত স্থানে প্রত্যাখ্যানের অবমান নীরবে সহ্য করিতে হইবে। ইহা ভালবাসাপ্রবণ নারী হৃদয়ের কিরূপ মর্ম্মাঘাতী তাহা ঈষৎ কল্পনা সাহায্যে তরুণ তরুণীদিগকে ভাবিতে বলি এবং ইহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি তাহাদিগের স্বত্বাধিকার প্রসার বলা কত অসঙ্গত তাহাও ভাবিতে বলি। ইহা কেবল পাশ্চাত্য বিবাহ প্রণালীর দোষ ও বিফলতা স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে। যাহারা কিছুদিন অর্থকরী কর্ম্ম করিয়া তাহাতে অভ্যস্তা হইয়াছে, একে তো তাহাদের গৃহস্থালী কর্ম্ম ভাল লাগে না, তাহাতে অর্থ সচ্ছলতার মোহে তাহারা বিবাহিতা হইয়াও অনেকে অর্থকরী কর্ম্ম করিতে থাকে। বিবাহিতারা অর্থকরী কর্ম্ম করায় প্রথমতঃ অবিবাহিতা নারীদিগেরও পুরুষদিগের যাহাদের অর্থোপার্জ্জনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়—পারিশ্রমিকের হার কম হয়—সুতরাং তাহাদের দুর্দ্দশা হয়—তাহাতে নারী সমষ্টির কোনরূপ মঙ্গল হয় না—ধনী প্রভুদেরই সুবিধা হয়। বিবাহিতা নারীরা অর্থকরী কর্ম্ম করায় তাহাদের বিবাহিত জীবনও শান্তি ও প্রীতিদায়ী হয় না—অপত্য থাকিলে তাহাদেরও দুর্দ্দশা হয়। যখন দুই জনেই অর্থকরী কর্ম্মান্তে পরিশ্রান্ত, নানা ঝঞ্ঝাটগ্রস্ত ও বিরক্তি ভাবাপন্ন হইয়া গৃহে ফিরিবেন তখন কে কাহাকে, কখন, যত্ন, সেবা, ও সহানুভূতির শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া স্নিগ্ধ করিবেন ? আর যদি আবশ্যক মত পরস্পরের যত্ন সেবা ও সহানুভূতি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিবাহের সাফল্য কোথায় ? তখন তাহাদের গৃহ, আর গৃহ রহিল না—মেশে পরিণত হইল। এরূপ হওয়ায় সামান্য কলহও ভীষণ আকার ধারণ করে—অনেক সময়ে তাহার ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। অপত্যদেরও যত্ন সেবা ও আদর করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়—সুতরাং অপত্যরা পিতামাতার যত্ন, আদর, ভালবাসা ও শিক্ষা তত্তি অল্পই পায়—তাহাদের পিতামাতার প্রতিও ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা বিকশিত হইতে পায় না—সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে যখন পরের সেবা ও সাহায্য একান্ত আবশ্যক হয়, তখন তাহারা অপত্যদের নিকট তাহা পাইতে পারে না—পাশ্চাত্যে পিতামাতারা এখনই পায় না—সুতরাং ভাড়াটিয়া সেবার উপর নির্ভর করিতে হয়—গরীবদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হয়—অধিকাংশ বৃদ্ধদিগকে নির্জ্জন কারাবাসের দুঃখ ভোগ করিতে হয়—সেই জন্য পাশ্চাতে বার্দ্ধক্য এত আতঙ্কজনক। ভালবাসার পাত্র যত নিকটে থাকে ও যত তাহাদিগকে সেবা ও যত্ন করিতে পাওয়া যায় ততই অধিক বিকশিত হয়। এইজন্য দেখা যায় মাতৃহীন শিশুকে যখন পিতা অধিক যত্ন ও সেবা করিতে বাধ্য হন, তখন পিতাও মাতার মতন অধিক স্নেহশীল হইয়া পড়েন। পিতামাতার অপত্য সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই তাহাদের প্রতি ভালবাসা বিকশিত হইতে পায় না—ভালবাসিয়া, তাহাদের যত্ন ও সেবা করিয়া যে সুখ আছে—তাহাতে জীবন যে সরস থাকে—তাহা হইতে বঞ্চিত হয়—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপভোগ জিনিস—ভালবাসা—তাহারই প্রসারের পথ সঙ্কুচিত হয়। অপত্যদের জন্ম ও প্রতিপালন হইতেই পরার্থপরতা, সহানুভূতি, দয়া প্রভৃতি সকল সৎগুণেরই প্রকাশ ও বিকাশ হইয়াছে (১৩৩২ সালের মাঘমাসের ভারতবর্ষে "বিবাহ ও সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন)।

এইরূপে পরার্থপরতা ভালবাসা ও সহানুভূতির বিকাশের পথ সঙ্কুচিত হওয়ার ফলেই স্বার্থপরতা নির্দ্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা প্রকটভাব ধারণ করে—অর্থই জীবনের কাম্য হয় এবং তাহা পাইবার জন্য সকল সদ্‌বৃত্তি বলি দিতে লোকে বাধ্য হয়। Ellen Key যিনি নারী স্বত্বাধিকার প্রসারের একজন প্রধান ও চিন্তাশীলা নেতা বলিয়া স্বীকৃত—যাহার Love & marriage নামক পুস্তক সাত আটটি পাশ্চাত্য ভাষায় অনুদিত হইয়াছে তিনি লিখিয়াছেন যে বিবাহিতা নারীদের কর্ম্ম করার ফলে অবিবাহিতা নারীদের পারিশ্রমিকের হ্রাস হইয়াছে—তাহাদের সংসারের স্বচ্ছন্দতা দেখিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা লোপ হইয়াছে—তাহারা তাহাদের অসাবধানতাবশতঃ যাহা উপার্জ্জন করে তাহার অপেক্ষা অধিক লোকসান করে—অনেকের বন্ধ্যাত্ব হয়—তাহাদের শিশুমৃত্যু অধিক হয়—শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানি হয়—বিবাহিত জীবনও ঘৃণ্য হয়—তাহাদের গৃহ আরাম ও শান্তিহীন হয়—মদ্য সেবন ও পাপের বৃদ্ধি হয়। ("These married women who are partly maintained by their husbands, have by their supplementary earning reduced the wages of self-supporting unmarried ones and when these in their turn are married, they lack the desire and the capacity to look after the home and waste through negligence more than they earn. The consequence of the outside employment of wives has further more been sterility, high infantile mortality and the degeneration of the surviving children both physically and psychically – a debased domestic life, with its consequences discomfort drunkenness and crime. (See Love & Marriage, ch. V, P. 169).বহু ধনী পাশ্চাত্যেই নারীদিগের অর্থকরী কর্ম্ম করার ফল এইরূপ বিষময় হইয়াছে—আমাদের এই গরীব দেশে নারীদিগকে অর্থকর কর্ম্ম করিতে দিলে—আমাদের সমাজ গঠন পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভাঙ্গিলে, নারীদিগের দুর্দ্দশা আরও কত ভীষণ হইতে বাধ্য তাহা পরে দেখাইবার চেষ্টা করিব। পাশ্চাত্যেই যাহার ফল এত বিষময় হইয়াছে তাহাকে কিরূপ নারী স্বত্বাধিকার প্রসার বলা হয়—কোন আশায় সেইরূপ করিতে আমাদের সংস্কারকেরা চাহেন তাহা তো আমাদের ক্ষীণ বুদ্ধিতে আসে না। নারীদিগের এইরূপ স্বত্বাধিকার গান্ধীদিগের ঘাড়ে জোয়াল তুলিয়া দিয়া খোলা মাঠে লাঙ্গল টানিয়া মুক্ত বায়ু সেবন করার বা গাড়ী টানিয়া পৃথিবীর নানাস্থান বেড়াইবার ও দেখিবার স্বত্বাধিকার দেওয়ারই—ও তজ্জন্য অলঙ্কার স্বরূপ হয় তো গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে পাওয়ারই—অনুরূপ তাহাও কি আমরা দেখিব না ? আমরা যৌথ পরিবার প্রথার দ্বারায় লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সকল নারীদিগকে তাহাদের পিতৃমাতৃকুল ও স্বামীর পিতৃমাতৃকুলের দ্বারায় আজীবন অবশ্য প্রতিপাল্য করিয়া—সকল পুরুষদিগকে বিবাহ করিবার আদেশ থাকায় প্রায় সকল অবলাদিগকে পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থকরী কর্ম্মের লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলাম—সকল নারীদিগকে প্রথম যৌবন হইতে-ই—যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রবল থাকে—কাম উপভোগ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলাম—তজ্জন্য যাহাতে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি করিতে না হয়—তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলাম—নারীর নারীত্ব যাহাতে—নারীজীবনের প্রধান কার্য্য (function) ও সার্থকতা যাহাতে—জীবন সরস রাখিবার প্রধান উৎস যাহাতে—সেই মাতৃত্ব, যাহাতে সকলে উপভোগ করিতে পায়—অপত্য প্রতিপালনে যৌথ পরিবারস্থ অন্যান্য স্ত্রী পুরুষের সাহায্য পাওয়াতে বিপদগ্রস্তা বা অধিক দুশ্চিন্তা-ভারগ্রস্তা না হইতে হয়, তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলাম—আমাদের গৃহে মাতার স্থান সকলের উচ্চে—অথচ পাশ্চাত্য পদাঙ্কানুসারী সংস্কারকরা আমাদিগকে নারী-নিগ্রহী বলেন—আর পাশ্চাত্যেরা যাহারা নারীদিগের প্রথম যৌবনের প্রকৃতিজ প্রেরণা ও উচ্ছ্বাস রুদ্ধ করিতে বাধ্য করে—বা উপভোগ করিতে গিয়া সংসারানভিজ্ঞা তরুণীদিগকে বিপদ সাগরে নিমজ্জিত করে—মনোমত তরুণদিগকে পাইবার নিমিত্ত অশেষ চেষ্টা করিতে বাধ্য করে—বহু অভীপ্সিত স্থলে বার বার প্রত্যাখ্যানের অবমাননার গুরুভার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গোপন করিতে বাধ্য করে—তজ্জন্য হৃদয় বিষময় করে—পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় স্বাস্থ্যহানিকর শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুপযোগী অর্থকরী কর্ম্ম করার ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়িতে অবলাদিগকে নিক্ষিপ্ত করে—তজ্জন্য নারীসুলভ কোমলতা,

সহৃদয়তা, সেবাপরায়ণতা, পরার্থপরতা ক্রমে লীন করিয়া দেয় ও গৃহস্থালী কর্ম্ম করিবার অনুপযুক্ত করিয়া তোলে—মাতৃত্বের অঙ্গ সকল ও তৎযুক্ত স্নায়ু ও স্নায়ুগ্রন্থি সকল বহু-কাল ব্যবহারাভাবে শুষ্ক করিয়া জগজ্জননীরূপিণী জগদ্ধাত্রীরূপিণী নারীর নারীত্ব যে মাতৃত্বে—তাহাই তাহাদের "উন্নত" সমাজ যন্ত্রে পিষিয়া নিষ্কাশিত করে ও মাতৃত্ব নিরোধকারী উপায় অবলম্বন করিয়া পুরুষদিগের কাম-সহচরী ও চিত্তবিনোদিনী সখী হইয়া নারী-জীবন সার্থক করিতে বলে ও বাধ্য করে—নারীর নারীত্ব বর্জ্জন করাইয়া নকল পুরুষ সাজায়—যাহারা বিবাহ করিতে পায়, তাহাদেরও অধিকাংশকেই অমনঃপূত স্থানে বিবাহ করিতে বাধ্য করে—(পরে দেখিবেন যে পাশ্চাত্যে শতকরা ৭৫টির উপর বিবাহ অর্থের বা অন্য সংসারিক সুবিধার জন্যই হইয়া থাকে—তরুণীদিগের কাম্য প্রেম-পরিণয় নহে); ও যাহাদের অধিকাংশের বিবাহিত জীবন অশান্তিগ্রস্ত—বিবাহ-বিচ্ছেদ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত—যাহাদের অনেক নারীদিগকে গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তি করিতে হয়—যাহাদের গৃহে কাম-সহচরী নারী (ও অপ্রাপ্ত-বয়স্কা কন্যা) ভিন্ন কেহ—এমন কি মাতাও গৃহে স্থান পায় না—বৃদ্ধ বয়সে প্রায় সকল নারীদিগকে নির্জ্জন কারাবাসের দুঃখ ভোগ করাইয়া প্রিয়জন বিরহিত বৈতনিক বা অবৈতনিক সেবাসদনে পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় লইতে বাধ্য করায়—তাহারাই "অবলা বান্ধব" "নারী স্বত্বাধিকার প্রসারক" পাশ্চাত্যেরা বোঝাইতেছেন—আর আমাদের "শিক্ষিত" সম্প্রদায় তাহাদের চিরাভ্যস্ত প্রথামত তাহাই নতশিরে মানিয়া লইতেছেন—আমাদের সমাজ গঠন ভাঙ্গিয়া পাশ্চাত্যদের অবিকল নকল করিয়া তাহাদের মতন "উন্নত" "নারীপূজক" সমাজ গঠন করিতে বদ্ধপরিকর ; আর আমাদের "শিক্ষিতা" নারীরা পাশ্চাত্যের দৃষ্টি-মনোহর সমাজ গঠনের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়া মরিবার স্বাধীনতা পাইতে উদ্‌গ্রীব! হা, সর্ব্বদর্শী ভগবান! আমাদের এ সখের গোলামীর শেষ পরিণতি কোথায়!!

ত্রিযামার দিগ্বিজয়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(ALLEGORY)

বাজিল দামামা—"যাবে
সাড়া দিল কত রথী
বাহিরিল রাজবর্ত্মে
নিস্তল নয়ন যাঁর

চলে···চলে···তুরঙ্গমী···
"অজানার আবাহন!!"—

ক্রমে স্বপ্নসভা ছাড়ি
"যাত্রা কেন মন্দাক্রান্তা?"—

বাহিনীপতির মৌন
শুধু বাহিনীর নেত্রে

কে গো নিরুদ্দেশ-পথে?—
দেশ দেশান্তর হ'তে
মর্ম্মতলে স্বপ্ন রচি',—
নক্ষত্রের নিমন্ত্রণ!

ঢাকে দিক্-চক্রবাল
উল্লাস-গরবে তারা

পথ ব্যাপ্তি হেরে আঁখি···
পুছে কেহ, কেহ কহে ঃ

সান্দ্র বৈজয়ন্তী ভাতি
প্রশ্নের ম্লানিমা নামে···

অজানার দিগ্বিজয় তরে?"
কম্পিত অনামা আশা ভরে!
নমি' সেনানীরে পুরোভাগে—
প্রাণে তার দীপ্তি এসে লাগে!

লক্ষ-ক্ষুরোৎকীর্ণ-ধূলিধূমে···
ধূলিকারে পূর্ব্বরাগে চুমে।···

কেহ কহে ঃ "আর কত দূর?"
"শুনি কই পথান্তের সুর?"

শ্রান্তি গ্লানি স্পর্শিতে না পারে,
ধীরে···দীর্ঘায়িত ছায়াধারে!

বহু লুব্ধ এসেছিল···
কেহ পূর্ণ রাজ্য, কেহ—
রহে তারা পিছে পড়ি'···
বিশ্রব্ধ স্বপনী সঙ্গী

অগণন গুপ্ত অরি
অন্তরীক্ষে···জলে···স্থলে ;

সে-অদৃশ্য-শরাহত
ধূসরিমা সাথে তার
"অজানার অভিসার?
প্রাহ্লের বৈদূর্য্য-তূর্য্য
কার পানে ধায় তারা?
ত্রিযামা?—পরাণ কাঁপে!

দ্বন্দ্বের শ্রীহীন জ্বরে
—"চিন্তাকুল কেন পান্থ?"
—"চিনি সে প্রচ্ছন্ন দৈত্যে,
—"কোন্ শান্তিজলে তারে
—"রহি' শুধু ঊর্দ্ধপাণি
—"সে ভরসা যদি হায়!
"জপি'—যাহা অন্তর্লীন
—"হায় কোথা সে-চেতন?
—"অণু হ'তে অণু হৃদে
"ঋষি হৃদে শ্রুতি ছন্দে
—"কেমনে শুনিলে তারে
—"হায়! তুমিও কি বন্ধু,
—"ত্রিযামা তামসী!!—তার
—"তবে পান্থ তার কাছে

"ঊষালোকে ফুটে যাহা
"সাঙ্গহীন ফেনপুঞ্জ
"অসহ্য অনল-অব্ধি
"ত্রিযামারই বহ্নি বাণী
"রূপায়ন-পারাবারে
"লক্ষ শান্তি-মণিহারা

কেহ প্রার্থি' মুক্তা মণি
অর্দ্ধেক রাজত্ব সাথে
নায়ক চাহে না ফিরে···
সাথে ল'য়ে কতিপয়

ত্যজে লক্ষ গুপ্ত বাণ ;
বাধা অনীকিনী চাহে

দুর্ব্বল পদাতি এক
হৃদয়ে বিরুব লুটে···
কেন?"—বুঝে না সে—তবু
সায়াহ্নে অনচ্ছ কেন?—
দিশারীর আঁখি শুধু
অরূপ সার্থক তবে

বসে এক বৃক্ষতলে ;
কহে তরু স্নেহানত।
আমারেও একদিন
নিভাইলে বল বল—
নীলিমায় মাল্য দানি'
দিনান্তে ডুবিয়া যায়?"—
মগ্নছন্দে বাজে আজি
কোথায় দেবতা বন্ধু?
কুহেলি-মঞ্জীরে বাজে
বাজে জাগরণে—যাহে
কহ সেই ইতিহাস।"
প্রহেলিকা বাসো ভালো?—
দেখেছ স্বরূপ কভু?"
শুন—যে দেখেছে তারে—

বীজ রস উপ্ত তার
বুদ্বুদের আস্ফালন
ব্রহ্মাণ্ডে তরঙ্গায়িত
শুনি' ব্যোম তারাঙ্কিত
সংক্ষুব্ধ বাসনা ঝড়ে
লিপ্সাফণী—হয় তারা

কেহ যাচি' কীর্ত্তি উগ্রতপা,
রাজকন্যা অলোকসম্ভবা।
দৃষ্টি তার দূর অনাগতে···
চলে···চলে···নিরুদ্দেশ-রথে।

বিষদিগ্ধ শিলীমুখ ঘুরে
লক্ষ্যেরে ঠেলিতে শুধু—দূরে।

নিরুৎসাহ লয় যেন মানি' ;
ভুলে সূর্য্য-দুন্দুভির বাণী।
কণ্ঠভরা জাগে তারি তৃষা,
ভাবিয়া না পায় তার দিশা!
কহে ঃ "ত্রিযামার দিগ্বিজয়ে।"
নহে কি রূপেরি পরিচয়ে?

সহসা কে মর্ম্মরিয়া উঠে?
—"সংশয়ে"—সৈনিক মুখে ফুটে।
দহিত সে তুষের দাহনে।"
বড় তৃষ্ণা বহি আরাধনে!"
পথান্ত ভরসা বুকে ধরি'।"
"রহি প্রাণ-দেবতারে স্মরি',
মুঞ্জিবে চেতনে একদিন।"
কোথা বাজে তব মগ্ন বীণ?"
কবি-হৃদে বাজে স্বপ্ন-দলে ;
কল্পলোক নামে চলাচলে।"
—"পাতি' কান দীপ্র ত্রিযামায়।"
নহে দীপ্র কহ তমসায়?
—"স্বরূপ?—না, তবে—" ক্রম কহে ঃ
তার মাধ্বীধারা বুকে বহে।"

ত্রিযামারই মর্ম্মকোষ-মাঝে।
ত্রিযামারই বিস্ফারণে নাচে।
ত্রিযামারই বিচ্ছুরণে শুধু।
পুষ্পাঙ্কিত পৃথ্বীপীঠ ধূ ধূ!
ঊর্ম্মিবুকে জাগে আচম্বিতে
মন্ত্রশান্ত—ত্রিযামা-ইঙ্গিতে।

"করাল দানবী চমূ প্রেমের সঙ্গীত-সদ্ম উৎসাদিত করে হাহাকারে,
"সে-ক্ষণে ত্রিযামা সেই শ্মশানে নন্দন রচে মৃত সঞ্জীবনী সুধাসারে।

"যে-স্তোম বাহিরে মন্দ্রে স্বরিত উদাত্ত ছন্দে পল্লবিয়া সুষমা অতুল,
"উৎস তার নাহি রাজে ঊর্দ্ধায়িত স্বরগামে,— পাতাল-সাম্রাজ্যে তার মূল।
"ত্রিযামা-সম্রাজ্ঞী একা শাসে সে অলখ-রাজ্য ধরি নিত্য নব ছদ্ম বেশ ;
"শব্দহারা রাজ্যদণ্ডে নিয়ন্ত্রে স্তনিত সৃষ্টি নামরূপ ঝঙ্কারি অশেষ।

"প্রবাহে সে জ্যোতিষ্পথে কোটি জ্যোতি-ঊর্ণাজাল প্রতি ঊর্ণা কোটি স্পন্দ বহে,
"প্রতি স্পন্দ বেড়ি' কোটি রূপের নিগড়ে—একা ত্রিযামা-ঊর্ণায়ু মুক্ত রহে।
"সংখ্যাহারা লূতাতন্ত্র কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে বিদ্যুত্বান্ জ্বলদ্-গর্জ্জনে ;
"ত্রিযামা সে-বজ্রদোল করে উপশান্ত হাসি' মুহূর্ত্তের তর্জ্জনী-হেলনে।

স্ফুরদ্-বিলীয়মান সীমাহীন সমারোহে ধায় কোটি ভঙ্গিমা মুখরা
"নটরঙ্গে ;—কেন্দ্রে তার বিরাজে ত্রিযামা একা নটেশ্বরী নিসন্দী নির্জ্জরা।
"আসঙ্গে যে আত্মহারা, বহিরঙ্গ বিশ্বোৎসবে অপ্রমত্ত রহিতে না চায়
"তারে না ত্রিযামা চাহে যে না বরে লীলোৎসবে অন্তরের অন্তঃপুরিকায়।
"অনাসক্ত দিগ্বিজয়ে পাঠায় সে যাহাদের— পড়ে তারা বাঁধা নিজ জালে—
"কল্লোলে সমাধি রচি', সিংহনাদে নাহি শুনি' ছায়াশঙ্খ আলো-অন্তরালে।
"সে-আখ্যান শুনে যে-ই শব্দ-ভ্রান্ত নাহি হয় ত্রিযামা-শঙ্কায় নাহি কাঁপে ;
"শুনে না যে—হয় সে-ই হৃতধ্বজ মন্ত্রহারা, প্রাণ-মধ্যমণি মুখ ঝাঁপে।

প্রোল্লোল মর্ম্মরে তাই গণি না চরম বন্ধু, প্রার্থি বর্ণ-রললরোল-পারে
"হেরিতে সে নিরঞ্জনা নিখিল-বিজয়-মন্ত্রা দিবা-উৎসারিণী ত্রিযামারে।"

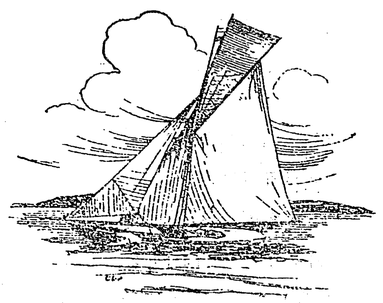

ভারতীয় কুস্তি ও তাহার শিক্ষা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"উতার"

যখন পরস্পরে বাঁ হাত ঘাড়ে রাখিয়া দাঁড়ায়, তখন যদি অপরের বাঁ পাঁয়তারা থাকে, তবে নিজের ডান হাতের পুরবাহু দিয়া তাহার বাঁ কনুইয়ের কাছে ধাক্কা দিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়া তাহার ঘাড়টী নিজের বাঁ দিকে টানিয়া, ঘুরিয়া পিছনে যাওয়া বা নিচে আনাকে "উতার" বা "লোকান" বলে। পিছনে যাইয়া বাঁ পা-টী সঙ্গে সঙ্গে পিছাইয়া লইতে হয় (চিত্র "উতার বা লোকান")।

"টাং"

(ক) যদি অপরের বাঁ পাঁয়তারা থাকে, তবে বাঁ হাতটী তাহার ডান গুলির উপর দিয়া লইয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে ডান দিকে ঘুরিয়া আসিয়া, বাঁ পা-টী তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া ঊরুতের উপরে নিজের ঊরুতের পিছনটী লাগাইয়া জোরে পিছনে তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে সামনে শরীরের ঝোঁক দিতে দিতে একটু ডান দিকে ঘুরিয়া নিচু হইয়া চিৎ করাকে "টাং" বলে। তাহার বাঁ কনুইটী ডান হাত দিয়া ধরিয়া টানিলে প্যাঁচটী আরো সহজ হয়। (চিত্র "ক-টাং")

(খ) বাঁ পা টী তাহার পায়ের মধ্য দিয়া না লইয়া গিয়া দুই পায়ের বাহির দিক দিয়া লাগাইয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে শরীরের ও হাতের কাজ করিয়া জোর দিয়া চিৎ করাকেও "টাং" বলে। (চিত্র "খ-টাং")

(গ) যখন পরস্পরে বাঁ হাত ঘাড়ে রাখিয়া দাঁড়ায়,

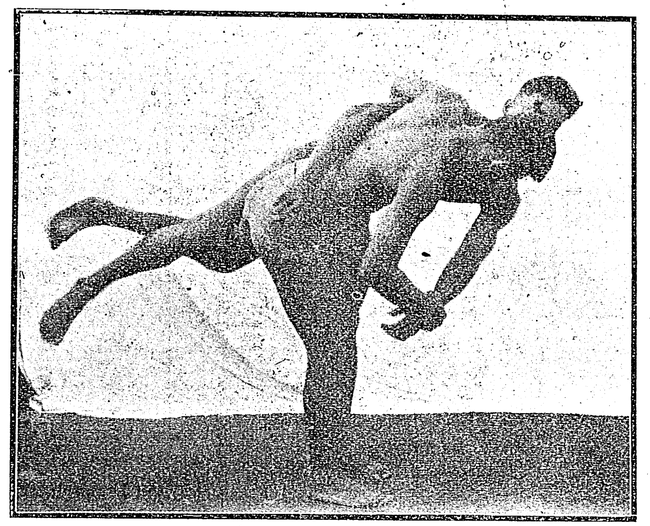

'ক-টাং'

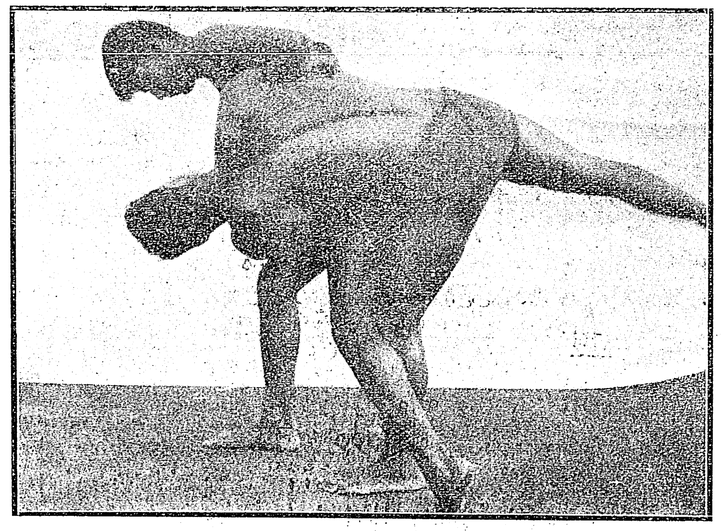

"খ-টাং"

তখন যদি অপরের বাঁ পাঁয়তারা থাকে, নিজে ডান দিকে ঝোঁক দিতে দিতে একটু ডান দিকে ঘুরিয়া তাহার ঘাড়টী ঘুরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ টানিয়া নিচু করিয়া চিৎ করাকেও "টাং" বলে। কব্জীটী ধরিয়া ও বাঁ পা-টী তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া

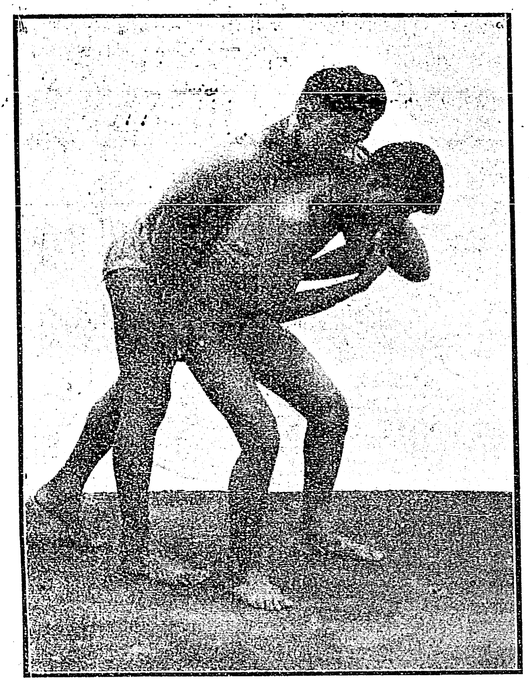

ধবি পট ১ম

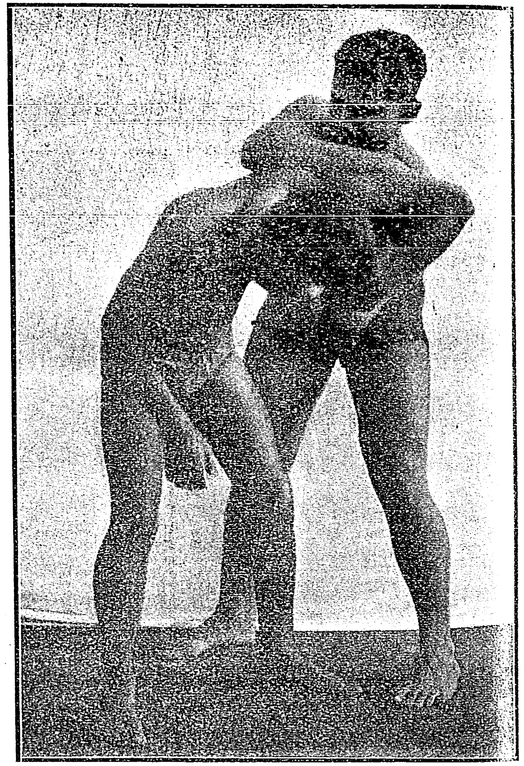

"উতার বা লোকান"

লইয়া গিয়া, উরতের উপরে নিজের উরতের পিছনটী লাগাইয়া জোরে পিছনে তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্‌নে শরীরের

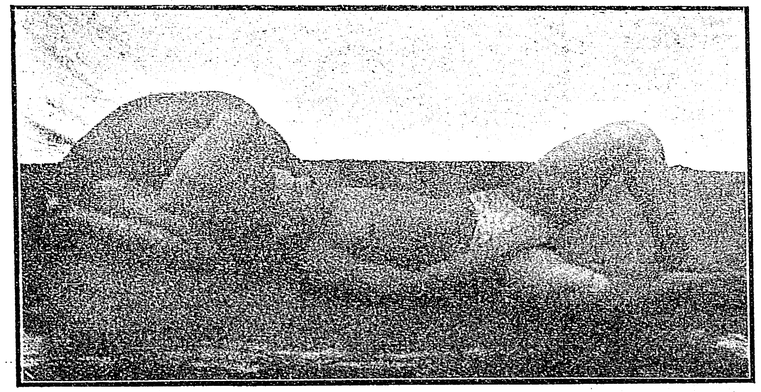

ধবি পট ২য়

"ঢাক"

(ক) যদি অপরের বাঁ পাঁয়তারা থাকে, তবে বাঁ হাতটি তাহার ডান বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া, অপর কাঁধটী জোরে ধরিবার (কিংবা বাঁ হাত দিয়া তাহার গলাটী জড়াইয়া ধরিবার) সঙ্গে সঙ্গে নিজে ডান দিকে ঘুরিয়া আসিয়া কোমরের পিছনটি তাহার কোমরে লাগাইয়া জোরে সাম্‌নে ঝোঁক দিয়া কোমরটী নিচু করিতে হয়। তবে ফেলিবার সময় তাহার শরীরটী যেন নিজের কোমরের উপর দিয়া যাইয়া পড়ে। এইরূপ প্যাঁচে চিৎ করাকে "ঢাক" বলে। তাহার বাঁ কব্জীটী ডান হাত দিয়া ধরিয়া টানিলে প্যাঁচটী আরো সহজ হয়। (চিত্র "ঢাক")

(খ) দুই হাত তাহার দুই বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে কোমরের কাজ করিয়া চিৎ করাকেও "ঢাক" বলে। কোন কোন দেশে এই প্যাঁচটিকে "দো-দস্তি ঢাক" বলে (চিত্র—"দো-দস্তি-ঢাক")।

"ঢাক-বাহাল্লী"

ঠিক "ঢাক" প্যাঁচের ন্যায় যদি অপরের বাঁ পাঁয়তারা থাকে, তবে বাঁ হাতটী তাহার ডান বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া অপর কাঁধটী জোরে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে ডান দিকে ঘুরিয়া আসিয়া কোমরের পিছনটী তাহার কোমরে লাগাইয়া জোরে সাম্‌নে ঝোঁক দিয়া কোমরটী নিচু করিবার সময় ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ কনুইয়ের কাছে ধরিয়া টানিয়া চিৎ করাকে "ঢাক-বাহাল্লী" বলে।

চিৎ করাকেও "ঢাক—বাহাল্লী" বলে (চিত্র-"ঢাক-বাহাল্লী")।

"কুল্লা"

যদি অপরের বাঁ পাঁয়তারা থাকে, তবে বাঁ হাতটী তাহার

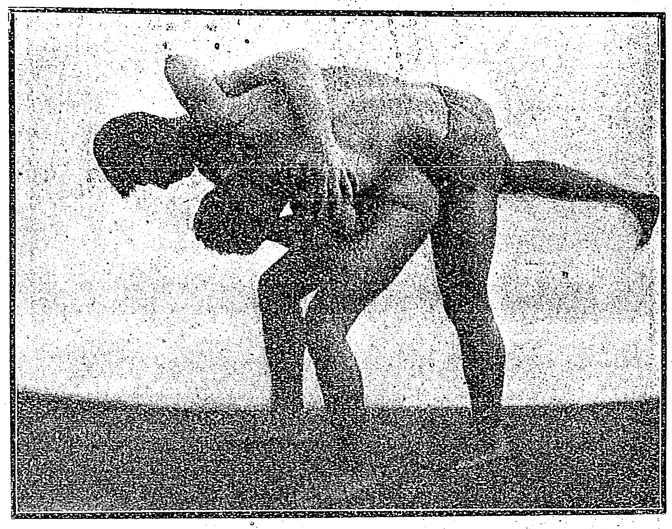

"ঢাক"

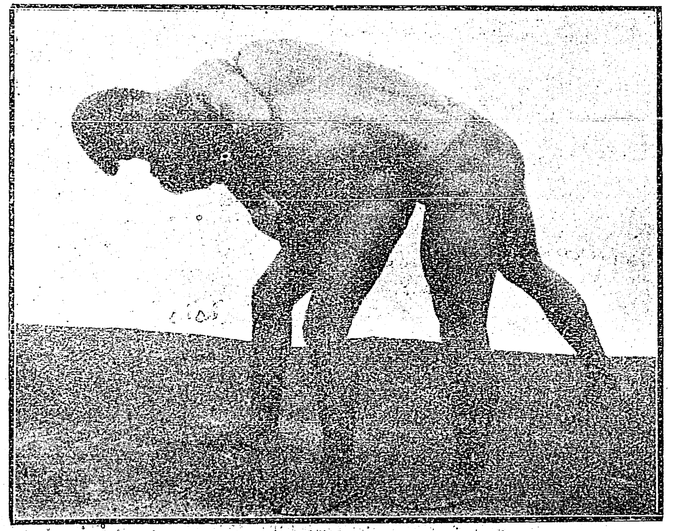

ঢাক "বাহাল্লী"

হাতটী তাহার বগলের মধ্য দিয়া না লইয়া গিয়া গলাটী জড়াইয়া ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে কোমরের কাজ করিয়া কোমরের ডান ধার দিয়া লইয়া গিয়া লেঙ্গটের পিছনের বাঁ দিকটা ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজে ডান দিকে ঘুরিয়া আসিয়া

ঠিক "ঢাক-বাহাল্লী" প্যাঁচের ন্যায় কোমরের পিছনটী তাহার কোমরে লাগাইয়া তাহার শরীরটী জোরের সহিত একটু

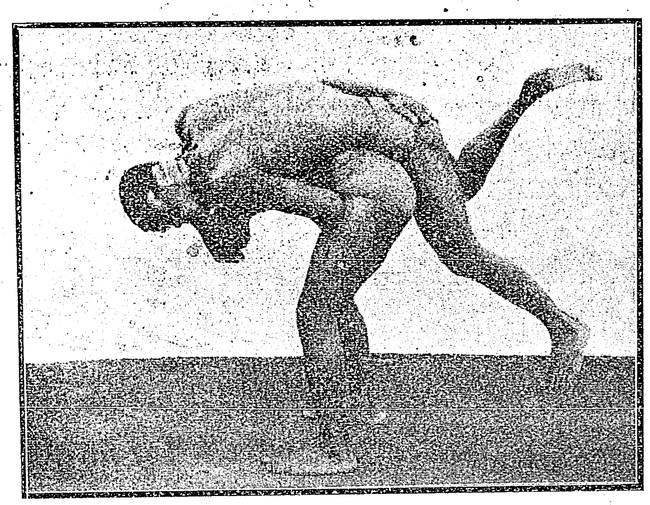

"কুল্লা"

তুলিয়া লইয়া জোরে সাম্‌নে ঝোঁক দিয়া কোমরটী নিচু করিবার সময় ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ কনুইয়ের কাছে কিংবা মাথাটী ধরিয়া টানিয়া চিৎ করাকে "কুল্লা" বলে (চিত্র—"কুল্লা")।

"ধবিপট"

অপরের পাঁয়তারা দেখিয়া, যদি তাহার ডান পাঁয়তারা থাকে, তবে তাহার বাঁ কনুইটী ডান হাত দিয়া ধরিয়া লইয়া বাঁ পা-টী তাহার বাঁ দিকে আগাইয়া দিয়া, নিজে ডান দিক ঘুরিয়া আসিয়া বাঁ কাৎটী তাহার বাঁ বগলের নিচে ও কোমরটী তাহার কোমরে লাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়া তাহার বাঁ মোড়টী চাপিয়া ধরিয়া জোরে সাম্‌নে ঝোঁক দিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া চিৎ করাকে "ধবিপট" বলে (চিত্র— "ধবিপট ১ম," "ধবিপট ২য়")।

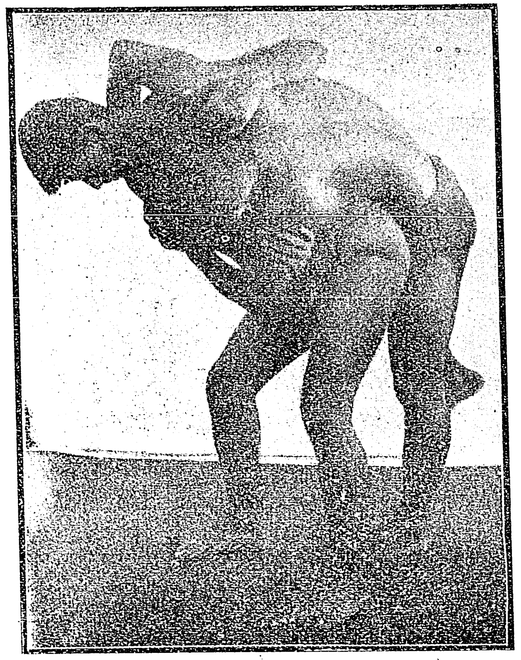

"দো-দস্তি-ঢাক"

* ভ্রম সংশোধন।

বিগত কার্ত্তিক মাসে এই প্রবন্ধের কিছু অংশ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে ছাপার কতকগুলি ভুল রহিয়া গিয়াছে। নিম্ন ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল। আশা করি পাঠকগণ সংশোধন করিয়া পড়িবেন।

" ক-বাহাল্লী-১ম" হইবে পৃ ৭২৩ চিত্রের নিম্নে "বাহাল্লী-১ম" স্থানে

পৃঃ	৭২৩	চিত্রের নিম্নে	"দস্তি-১ম"	স্থানে "খ দস্তি-১ম" হইবে
ঐ	৭২৫	ঐ	"দস্তি-১ম"	ঐ "চাপরাস" হইবে
ঐ	ঐ	ঐ	"বাহাল্লী-২য়"	ঐ "ক-বাহাল্লী-২য়" হইবে
ঐ	ঐ	ঐ	"ক-১ম লোকান"	ঐ "নিকাল-১ম" হইবে
ঐ	৭২৬	ঐ	"দস্তি-২য়"	ঐ "ক-দস্তি-১ম" হইবে
ঐ	ঐ	ঐ	"পট"	ঐ "পট-১ম" হইবে
ঐ	৭২৭	ঐ	"দস্তি-২য়"	ঐ "ক-দস্তি-২য়" হইবে
ঐ	৭২৮	ঐ	"বাহাল্লী-১ম"	ঐ "খ-বাহাল্লী-১ম" হইবে
ঐ	ঐ	ঐ	"ক-২য়-লোকান"	ঐ "নিকাল-২য়" হইবে
ঐ	৭৩০	লেখায়	"এক-পট-টা"	ঐ "এক-পট-টাং" হইবে
ঐ	৭৩১	ঐ	"লোকান"	ঐ "নিকাল" হইবে
ঐ	৭২৮	চিত্রের নিম্নে	"দস্তি-২য়"	ঐ "খ-দস্তি-২য়" হইবে

বদ্‌লি মঞ্জুর

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ছোট একটি ব্র্যাঞ্চ্-লাইন। এক জংসন্-ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া আর-এক জংসন-ষ্টেশনে গিয়া মিশিয়াছে। মাঝে-মাঝে ছোট ছোট কয়েকটি ষ্টেশন।

তা লাইনের সব-কয়টি ষ্টেশনই দেখিতে প্রায় একরকম।

পয়েন্টিং-করা লাল ইঁটের তৈরি ছোট্ট একখানি ঘর, সুমুখে একটুখানি ঢাকা বারান্দা, বারান্দার এক পাশে কাঠের বেঞ্চি পাতা, তাহার পাশেই ওজন করিবার লোহার যন্ত্র, জানালার গায়ে টিকিট কিনিবার ঘুল্‌ঘুলি।

ভিতরে একটি টেবিলের উপর টেলিগ্রাফের যন্ত্র সাজানো। যিনি টেলিগ্রাফ্ করেন, তাঁহাকেই টিকিট দিতে হয়, তিনিই ষ্টেশন-মাষ্টার,—তিনিই সব। এ্যাসিষ্টেণ্টের বালাই এ-লাইনে নাই। এ্যাসিষ্টেণ্ট্ বলিতে একজন খালাসী। ষ্টেশনেও কাজ করে, আবার মাষ্টারের বাড়ীর কাজও করিয়া দেয়। মাষ্টারের চাকর রাখার খরচটা অন্তত বাঁচে।

মন্দ নয়।

ষ্টেশন-মাষ্টার এইচ্, পি, ব্যানার্জ্জি। আসল নাম—হরিপদ। মাহিনা বাহাত্তোর টাকা। সুখে-স্বচ্ছন্দেই সংসার চলে। ষ্টেশনের কাছেই ঠিক তেমনি পয়েন্টিং-করা ইঁটের তৈরি দু'খানি ঘরের একটি কোয়ার্টারে—হরিপদ-মাষ্টারের সংসার। সংসার বলিতে একমাত্র তাহার স্ত্রী—বীণাপাণি। ছেলেপুলে নাই, একা মানুষ,—একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট্।

বীণার কাজকর্ম্ম একরকম নাই বলিলেই হয়। ইন্দারা হইতে রামধনিয়া-খালাসী জল আনিয়া দেয়, তাহার স্ত্রী লছ্‌মীর কল্যাণে ঘর ঝাঁট দিতে হয় না, বাসন মাজিতে হয় না,—শুধু দু'বেলা দু'টি রান্না।

আছে একরকম ভালই, কষ্টের মধ্যে শুধু সে নিঃসঙ্গ, একাকিনী। এখানে আসিবার পূর্ব্বে বীণা ছিল এক পল্লীগ্রামে—তাহার মামার বাড়ীতে। সেখান হইতে আসিয়া অবধি কোথাও যাওয়া তাহার আর একটিবারের জন্যও ঘটিয়া ওঠে নাই। মনে হয়, এই আট বৎসর ধরিয়া সে যেন এই ছোট্ট খাঁচাটির মধ্যে বন্দিনী হইয়া আছে। আশে-পাশে এমন কেহ নাই যে, ডাকিয়া দুটা কথা কয়; উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে শুধু ওই খাঁচার মত ছোট ঘরখানি,—এত অপরিসর যে, দুদণ্ড নড়িয়া-চড়িয়া ছুটিয়া-খেলিয়া বেড়াইবারও উপায় নাই,—এক লছ্‌মীর সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা কথা কহিতে তাহার ভালও লাগে না।

হরিপদ খাইবার সময় বাসায় আসে। স্নান করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া খাইতে বসিলে, পাখা হাতে লইয়া বীণা তাহাকে বাতাস করিতে করিতে বলে, 'হ্যাঁগা, আর কতদিন? এখান থেকে তোমার বদ্‌লি কি আর হবে না ছাই?'

হরিপদর সেই এক জবাব।

বলে, 'কই আর হয়!'

বলে, 'কেন, জায়গাটা তেমন মন্দ ত' নয়! সব জিনিসই সস্তা। তরি-তরকারি ত' একরকম কিনতেই হয় না, তা ছাড়া কাল থেকে আধসের করে' দুধের বন্দোবস্ত করেছি, খাঁটি দুধ,—একবারে বিনি-পয়সায়।'

বলিয়া একটুখানি গর্ব্বের হাসি হাসিয়া হরিপদ তাহার মুখের পানে তাকায়। ভাবে হয় ত বীণা তাহার এই বুদ্ধিমত্তার তারিফ্ করিবে। কিন্তু তারিফ্ করা দূরে থাক্, হাতের পাখা তখন তাহার অত্যন্ত মৃদু গতিতে চলিতে থাকে, হেঁট্‌মুখে বুকের আঁচলের পা'ড়টা সে বাঁ-হাত দিয়া টানিয়া টানিয়া সোজা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, মনে হয়, কথাটায় যেন সে কানই দেয় নাই।

হরিপদ কিন্তু না শুনাইয়া তৃপ্তি পায় না, বলে, 'ওইখানে ওই জান্‌লায় দাঁড়ালে বাইরে দক্ষিণ দিকে উ-ই যে ওই গাছপালায়-ঢাকা গাঁ'টা দেখা যায়, ওই গাঁ থেকে চ্যষাদের আর গয়লাদের ছেলেগুলো সব লাইনের ধারে গরু চরাতে আসে। কচি-কচি অমন ঘাস ত' আর কোথাও পাবে না। রামধনিয়াকে দিয়ে গরুগুলো কাল আটক্ করেছিলাম। বললাম, খবরদার বেটারা, ওই একটা গরু কি বাছুর কোনোদিন যদি লাইনের ওপর কাটা পড়ে ত' হাজার টাকা জরিমানা—একেবারে ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তারা ত' কেঁদেই অস্থির! বলে, গাঁয়ে

আর কারও বাড়ী এক আঁটি খড় নাই হুজুর, গরু চরাবার 'বাথান্' নাই, ছেড়ে দিলেই পেটের জ্বালায় হাঁ-হাঁ করে' লোকের ফসলে গিয়ে মুখ দেয়, এই লাইনের ধার ছাড়া আমাদের আর উপায় নাই হুজুর। বললাম, আমি যে চরাবার হুকুম তোদের দেবো, তাতে আমার লাভ? রামধনিয়া একসের বলেছিল, কিন্তু একসের আর হলো না, শেষে আধসের করে' খাঁটি দুধ, ঠিক হলো যে, ওরা নিজেরাই এসে' কাল থেকে পৌঁছে দেবে।'

বলিয়া একটুখানি থামিয়া সে আবার বলে, 'কেমন, ভাল হয়নি?'

হাসিয়া একবার ঘাড় নাড়িয়া বীণা নীরবে সে কথার জবাব দেয়।

কিন্তু অমন বসিয়া বসিয়া গল্প করিয়া করিয়া খাইতে গেলে ত' হরিপদর চলে না।

রামধনিয়া ছুটিয়া একেবারে ঘরে ঢুকিয়া বলে, 'বাবু, টেলিগিরাপ্…'

বাস্! সেদিনের মত হরিপদর খাওয়া ওই খানেই শেষ।

হাতে জল ঢালিয়া দিয়া পান আনিয়া যে বীণা তাহার হাতে দিবে তাহারও অবসর নাই।

'পান ওই রামধনির হাতে দিও।' বলিয়া হন্তদন্ত হইয়া হরিপদ ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

আবার কখন্ ফিরিবে কে জানে।

বীণা তাহার জানালার কাছটিতে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন হুস্ হুস্ করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়ায়। কোনোটা বা এই দিক্ দিয়া, কোনোটা বা ওই দিক দিয়া। কিন্তু যেদিক দিয়াই হোক, তাহার এই জানালাটির পাশ দিয়া সকলকেই পার হইতে হয়। এই ট্রেণে চড়িয়াই সেই যে আট বৎসর আগে সে এইখানে আসিয়া নামিয়াছে, তাহার পর আর কোনোদিনই তাহাকে ট্রেণে চড়িতে হয় নাই। ট্রেণ দেখিতে তাহার বড় ভাল লাগে। জানালার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া ট্রেণের যাত্রীরা তাহারই দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া চোখের সুমুখ দিয়া পার হইয়া যায়। বীণার দুটি ব্যথিত ম্লান ব্যগ্র ব্যাকুল চক্ষু পরম ঔৎসুক্য ভরে তাহাদের মুখের পানে তাকাইয়া থাকে। কোনোদিন হয় ত বা একটি মুখের চেহারা সে সারাদিন মনে করিয়া রাখে, আবার কোনোদিন-বা সব মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায়, মনে করিয়া রাখিবার মত একখানি মুখও তাহার নজরে পড়ে না।

ট্রেণ চলিয়া যায়; বীণা দেখে, দিগন্তবিস্তৃত শূন্য প্রান্তর, এদিকে ধানের মাঠ, ওদিকে ওই মাঠের মাঝখানে গাছপালায়-ঢাকা ছোট্ট একখানি গ্রাম,—দূরে—বহুদূরে, মাঠ প্রান্তর পার হইয়া গিয়া অস্পষ্ট বৃক্ষশ্রেণীর মাথার উপরে নীল আকাশ যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। দিনের পর দিন, ঋতুর পর ঋতু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে, বীণার চোখের সুমুখে তাহার ওই সঙ্কীর্ণ সঙ্কুচিত খণ্ড-পৃথিবীটির রং বদ্লায়।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্রতাপে দেখে, চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, মাঠের মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেছে, দূরে শুধু শুষ্ক প্রান্তরের মাঝখানে পত্রহীন কয়েকটি পলাশের গাছে রক্ত-রাঙা পুষ্পের সমারোহ! বৈকালের দিক পশ্চিমের আকাশ অন্ধকার করিয়া কাল বৈশাখীর কালো মেঘ দেখা যায়, মাঠের ধূলা উড়াইয়া ঘূর্ণীবায়ু ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া বেড়ায়, তাহার পর কোনোদিন-বা বৃষ্টি নাম, কোনোদিন-বা ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে সুরু করে।

দেখিতে দেখিতে বর্ষা আসে। দিবারাত্রি ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়ে। নিদাব-তপ্ত তৃষিত ধরিত্রী যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচে। বীণা তাহার সেই ছোট্ট জানালার পাশে তখনও বসিয়া থাকে,—দেখে, বহুদূর হইতে বৃষ্টির ধারা ঝম্ ঝম্ করিয়া তাহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে, চোখে-মুখে তাহার বৃষ্টির ঝাপ্টা আসিয়া লাগে, তবু সে কোথাও উঠিয়া যায় না। তাহারও তৃষিত আত্মা যেন অজান্তে বর্ষণ কামনা করে, এদিকের দরজার ফাঁকে ঘন-ঘন ষ্টেশনের দিকে তাকায়, স্বামী তাহার কাজ করিতেছে, কখন্ যে আসিবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই। মাঠ-ঘাট সব জলে ভরিয়া যায়, দুপুরে দূরের গ্রাম হইতে জালি কাঁধে লইয়া লাইনের ধারের ডোবায় বাগ্দীর মেয়েরা মাছ ধরিতে আসে, ধানের মাঠে চাষীদের নিড়ান্ চলে, সূর্য্যাস্ত হইতে না হইতেই কড়্ কড়্ করিয়া ব্যাঙের ডাক সুরু হয়।

তাহার পর শরতের নির্ম্মল আকাশে চাঁদ ওঠে। জ্যোৎস্নার আলোয় সবুজ ধানের মাঠের উপর দিয়া

বাতাস বহিয়া যায়। রোমাঞ্চিত শস্যক্ষেত্রের শিহরণ যেন বীণার দেহে আসিয়া লাগে।

দেখিতে দেখিতে সবুজ ধানের মাঠ হলুদ হইয়া ওঠে। উত্তর দিক হইতে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বয়। বীণা তখনও তাহার সেই ক্ষুদ্র বাতায়নপার্শ্বের নির্দ্দিষ্ট স্থানটি পরিত্যাগ করে না, গায়ে কাপড় জড়াইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে, চাষীরা ধান কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে, গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া কাটা ধানের আঁটি লইয়া তাহারা গান গাহিতে গাহিতে গ্রামের দিকে চলিয়াছে।

তাহার পরেই বসন্ত। সৃষ্টিছাড়া এই প্রান্তরের মাঝখানে তাহাদের ওই ছোট্ট ঘরখানির ততোঽধিক ছোট জানালার পথেও বসন্তের হাওয়া অনধিকার প্রবেশ করে। অপরিসর উঠানের এক পাশে বীণা তাহার নিজের হাতে বেল্ ফুলের যে গাছটি পুঁতিয়াছে, তাহারও শুষ্ক শাখায় শাদা শাদা কয়েকটি কুঁড়ি ধরে।

এম্নি করিয়া বছর কাটিয়া যায়।

জানালার বাহিরে প্রতি দিন সেই একই দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া বীণার জীবন যেন এইবার হাঁপাইয়া উঠিয়াছে।

সকালের ট্রেণটা পার করিয়া দিয়া হরিপদ যখন বাসায় আসে, বীণা তখন রান্না করে। তাও সে রান্না করিতে করিতে উঠিয়া একবার স্বামীর কাছে আসিয়া বসে। হাসিয়া বলে, 'হ্যাঁগা, তুমি বদ্লির দরখাস্ত করেছ না আমায় মিছে কথা বলে' ভুলিয়ে রাখ্ছ?'

হরিপদ তাহার জুতায় কালি ঘষিতে ঘষিতে মুখ তুলিয়া বলে, 'কেন গো, বদ্লি বদ্লি করে' যে আমায় ক্ষেপিয়ে তুললে দেখছি।'

বীণা রাগ করিতে জানে না। মৃদু হাসিয়া আবার তাহার উনানের কাছে গিয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ—আর সে তাহাকে ক্ষেপাইবে না। খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া এটা সেটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে ভাবে, রেল-কোম্পানীর মত নিষ্ঠুর কোম্পানী আর পৃথিবীতে কেহ নাই, স্বামী তাহার খাটিয়া খাটিয়া হায়রাণ হইয়া উঠিতেছে, ছুটি না থাক্, অন্যত্রে বদ্লি না করুক—স্ত্রীর সঙ্গে দু'দণ্ড বসিয়া কথা বলিবার অবসরও ত' দেওয়া উচিত!

উনানে ভাত চড়াইয়া দিয়া হাত ধুইয়া বীণা আবার ঘরে আসিয়া ঢোকে। বলে, 'কেন, আমি কি তোমার জুতো ঘষে দিতে পারি না?'

হরিপদ বলে, 'না, পারবে না কেন? আমিই ঘষ্ছি, তাতে আর হয়েছে কি!'

তাহার পর বেচারা বীণা আর কোনও কথা খুঁজিয়া পায় না, হেঁট্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে স্বামীর জুতা-ঘষা দেখিতে থাকে।

সেইদিনই দুপুরে বীণা হঠাৎ এক-সময় বলিয়া বসে, 'বিকেলের দুটো ট্রেণই নাকি উঠে যাবে শুনছিলাম, কই গেল না ত?'

হরিপদ বলে, 'ট্রেণ উঠে গেলে তোমার ভারি দুঃখু হয়, না?'

বীণা জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'

হরিপদ বলে, 'জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাহ'লে আর লোক দেখা হয় না।'

বীণা হাসিয়া বলে, 'না, পারলে না বলতে। বিকেলের ট্রেণ দুটো উঠে যাওয়াই আমি চাইছি। উঠে গেলে বাঁচি।'

এবার হরিপদ বলে, 'কেন?'

এ 'কেন'র জবাব দিতে গিয়া বীণার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসে। লজ্জায় সে তাহার গালদুটি রাঙা করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'বা-রে! ও-সময় একা থাকতে আমার কষ্ট হয় না বুঝি! তোমার কি! তুমি ত' লোকজনের সঙ্গে……'

বলিয়াই বীণা জানালার কাছে গিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়ায়। বাহিরে চাহিয়া দেখে, ইঁদারাটার কাছে রামধনিয়ার পাঁঠি-ছাগলটাকে একটা খুঁটির সঙ্গে 'দিক্দড়ি' দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাছে লাইনে কাটা যায় বলিয়া লছ্মী তাহাকে এম্নি করিয়াই গলায় তাহার একটা লম্বা দড়ি দিয়া রোজ বাঁধিয়া রাখে।

সুদীর্ঘ আট বৎসর পরে তাহাদের একঘেয়ে জীবনে হঠাৎ একদিন এক বৈচিত্র্য দেখা দিল।

সন্ধ্যার ট্রেণখানা ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, হরিপদ তাহার কালো আল্পাকার কোট ও মাথায় গোল টুপিটি পরিয়া ট্রেণের যাত্রীদের টিকিট লইবার জন্য একটা আলোর

খুঁটির নীচে দাঁড়াইয়া। ট্রেণ হইতে লোক নামিল মাত্র দু'জন, উঠিল একজন। হঠাৎ কে যেন ট্রেণের হাতল্ ধরিয়া ডাকিল, 'হরিপদ দাদা!'

পরিচিত কণ্ঠস্বর!

হরিপদ দেখিল, প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের আলোটা তাহার মুখে গিয়া পড়িয়াছে। চিনিতে দেরি হইল না।—'সুকুমার যে রে? নাম্, নাম্!—নেবে পড়্!'

সুকুমার-ছোক্‌রাটি কি যেন বলিতে যাইতেছিল, হরিপদ ততক্ষণে তাহার কাছে আগাইয়া আসিয়া হাতে ধরিয়া তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইল, সঙ্গে মাত্র একটি সুট্‌কেশ্। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সুকুমার বলিল, 'তুমি যে এ-ষ্টেশনে আছ তা আমি জানতাম না দাদা, তবে এই লাইনে যে আছ তা জানি। সেইজন্যেই ত' প্রত্যেকটি ষ্টেশনে উঁকি মেরে মেরে দেখছিলাম—যদি দেখা হয়ে যায়। ভালই হলো, অনেকদিন পরে দেখা হ'য়ে গেল। তুমি ভাল আছ? বৌদি ভাল আছে?'

ঘাড় নাড়িয়া হরিপদ বলিল, 'হ্যাঁ, ভালই আছে। আচ্ছা, চল্ তোকে বাসাতেই রেখে আসি।'

বলিয়া সেই জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় দু'জনে তাহাদের সেই ছোট্ট বাসার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। হরিপদ ডাকিল, 'ওগো, খোলো, খোলো, ছাখো কে এসেছে ছাখো।'

বীণা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিতে আসিয়া দেখে, স্বামীর সঙ্গে এক অপরিচিত যুবক। তাড়াতাড়ি ঘোম্‌টা টানিয়া সে সরিয়া যাইতেছিল, হরিপদ বলিল, 'বিয়ের সময় মাত্র একবার দেখেছিল, চিনতে পারবে না। আমাদের যোগেশ-মামার ছেলে গো—সুকুমার। এবার চিনলে ত?'

বীণা এইবার তাহার ঘোম্‌টাটি ঈষৎ তুলিয়া দিয়া সুকুমারের মুখের পানে চকিতে একবার তাকাইয়াই চোখ নামাইল।

সুকুমার তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'প্রণাম বৌদি, ও-রকম লজ্জা যদি করেন ত' এই আমি চললাম।'

বীণাকে বাধ্য হইয়া তাহার মুখের পানে আর-একবার তাকাইতে হইল।

সুট্‌কেশ্‌টা ঘরের ভিতর রাখিয়া হরিপদর সঙ্গে সুকুমার কথা কহিতেছিল; বীণা তাহার জন্য চা তৈরি করিতে গেল।

সুকুমার বলিল, 'কয়লার কারবার করছি কিনা, তাই একবার মাণিকগঞ্জে যাচ্ছিলাম। কাল সকালেই কিন্তু আমায় চলে' যেতে হবে হরিপদদাদা!'

'আচ্ছা সে এখন দেখা যাবে। তুই বোস্, তোর বৌদির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্ ততক্ষণ, আমি আমার কাজটা সেরে আসি।' বলিয়া হরিপদ ষ্টেশনে চলিয়া গেল।

বৌদিদির চা তখনও হয় নাই।

একটা ঘরের মধ্যে একাই বা সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে কেমন করিয়া!

উঠানের পাশেই ছোট্ট রান্নাঘর। সুকুমার উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর চাপিয়া বসিল।

'বৌদির ঘরকন্না দেখতে এলাম। বাঃ, এখনও লজ্জা করছেন বৌদি? না বৌদি, তাহ'লে আমি চললাম।'

বীণা এইবার তাহার মাথার ঘোমটা সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া তাহার সেই সুন্দর মুখখানি অনাবৃত করিয়া হাসিয়া বলিল, 'কেন, যাবে কেন ঠাকুরপো, বিয়ে করেছ নাকি?'

সুকুমার হাসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'না বৌদি, বিয়ে আর হলো না। হ'লে আপনাকে নেমন্তন্ন করব। যাবেন ত?'

বীণা বলিল, 'কেন যাব না?'

চা তৈরি করিয়া চায়ের বাটিটি বীণা সুকুমারের হাতের কাছে আগাইয়া দিয়া বলিল, 'ভাল চা হয় ত হলো না ঠাকুরপো, তা কি আর করবে বল, ও-ই খেতে হবে।'

চায়ে চুমুক দিয়া সুকুমার বলিল, 'বৌদিদির হাতের তৈরি চা, এ-ই আমার অমৃত। এর চেয়ে ভাল চা আমার জোটে না বৌদি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

আলাপ জমিয়া উঠিতে দেরি হইল না। বীণা আজ বহুদিন পরে কথা কহিয়া বাঁচিয়াছে। কথা যেন তাহাদের আর ফুরাইতে চায় না।

'রাত্রে তুমি কি খাও ঠাকুরপো? লুচি করে' দিই খানকতক্, কি বল?'

'দোহাই বৌদি, রাত্রে লুচি আমি কোনোদিনই খাই না, আমি ভাত খাব।'

বীণা বলে, 'ভাল তরি-তরকারির ব্যবস্থা কিছু নেই ঠাকুপো, ভাত খেতে তোমার কষ্ট হবে। এমন হতচ্ছাড়া জায়গা,—কিচ্ছু মিলে না।'

সুকুমার বলে, 'এবার আমি রাগ করব বৌদি, এ কী আরম্ভ করলেন আপনি? অত লৌকিকতা আমার ভাল লাগে না।'

বৌদিদি বলে, 'লৌকিকতা নয় ভাই, তুমি কি আর রোজ আসছ? পথ ভুলে হঠাৎ এসে পড়েছ, আর হয় ত' এ বৌদিদিটির কথা তোমার মনেই থাকবে না—'

সুকুমার বলে, 'থাক্। ভুলে যাবার মত বৌদি আপনি ন'ন্। আপনাকে একবার যে দেখে সে বোধ হয় জীবনে আর ভোলে না।'

এ-কথার জবাব সে আর খুঁজিয়া পায় না, চোখ তুলিয়া সুকুমারের মুখের পানে একবার তাকাইয়াই মুখ নামাইয়া সেও ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'থাক্।'

তাহার পর দু'জনেই চুপ!

সুকুমারের চা খাওয়া শেষ হইয়াছিল। বাটিটি হাত হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'আপনি এবার বোধ হয় রান্না করবেন? আমি এইখানে বসে' থাকলে আপনার লজ্জা করবে না ত?'

বীণা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

বলিয়া সে চৌকাঠের কাছেই একটি আসন পাতিয়া দিয়া বলিল, 'ভাল করে' চেপে এইখানে বোসো ঠাকুরপো, তোমার কষ্ট হচ্ছে।'

সুকুমার ভাল করিয়াই চাপিয়া বসিল।

পরদিন সকালেই সুকুমারের চলিয়া যাইবার কথা, বীণা বলিল, 'পাগল হয়েছ ঠাকুরপো, আজ কি তোমায় ভাল করে' না খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারি কখনও? যেতে হয়, কাল যেয়ো।'

এ অনুরোধ এড়ানো শক্ত। বাধ্য হইয়া সেদিন তাহাকে থাকিতে হইল।

বীণা তাহার স্বামীকে রাত্রেই বলিয়া রাখিয়াছিল, সকালে হরিপদ কোথা হইতে একটা মাছ সংগ্রহ করিয়া রামধনিয়াকে দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে।

সুকুমার বলিল, 'দাদাকে দেখছি ষ্টেশনের সব কাজই করতে হয়, বাড়ী এসে' দুদণ্ড যে বিশ্রাম করবে, তারও ফুরসুৎ মিলে না,—না বৌদি? একা-একা দিন আপনার কাটে কেমন করে' বলুন ত?'

বাহিরে মাছটা পড়িয়া আছে, তাড়াতাড়ি সেটাকে কুটিবার ব্যবস্থা না করিলে এখনই হয় ত' কাকে মুখ দিবে, তাই সে সলজ্জ একটুখানি হাসিয়া একরকম ছুটিয়াই বাহিরে চলিয়া গেল। মুখে কিছুই বলিতে পারিল না।

ব্যাপারটা যে সুকুমার বুঝিল না তাহা নয়, কথাটা বলা হয় ত তাহার উচিত হয় নাই, তাই সে কিয়ৎক্ষণ জানালার বাহিরে একদৃষ্টে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিন্তু তাহার এই নীরবতাও বীণার ভাল লাগিল না। মাছ কোটা শেষ করিয়া হঠাৎ একসময় ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'অমন চুপ করে বসে রইলে যে ঠাকুরপো?'

হাসিয়া সুকুমার বলিল, 'ঝগড়া করব আপনার সঙ্গে?'

বীণাও হাসিল। বলিল, 'কর না। পারবে?'

বলিয়াই সে আর জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

আহারাদির পর খানিকটা বিশ্রাম করিয়া সুকুমার বলিল, 'যাই একটু ষ্টেশনে বেড়িয়ে আসি।'

বীণা বলিল, 'এসো। খাঁচার ভেতর কাল থেকে বাস করে' জীবন বোধ হয় তোমার হাঁপিয়ে উঠেছে।'

সুকুমার তাহার বৌদির দিকে তাকাইয়া মৃদু একটুখানি হাসিল মাত্র।

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, 'হাস্‌লে যে?'

সুকুমার বলিল, 'আমার যদি এই একদিনেই হাঁপিয়ে ওঠে, আপনার তাহ'লে আট বছরে কি হওয়া উচিত?'

তাচ্ছিল্য ভরে বীণা বলিল, 'আমার কথা ছেড়ে দাও ভাই, আমি মেয়ে মানুষ, আমাদের উপায় কি!'

বলিয়াই ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'বেশি দেরি কোরো না, আমি চা তৈরি করে' রাখব।'

দেরি অবশ্য বেশি সে করে নাই, ফিরিয়া যখন আসিল

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। দরজার কড়া নাড়িবামাত্র হারিকেন্ লণ্ঠন হাতে লইয়া বীণা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

দেখা গেল, বীণা বেশ করিয়া গা ধুইয়া ভাল করিয়া চুল বাঁধিয়াছে, ভাল একখানি শাড়ি পরিয়াছে, জামা গায়ে দিয়াছে, পায়ে লাল টক্‌টকে আলতা, হাতে কয়েক-গাছা সোনার চুড়ি, জামা কাপড় হইতে তাহার ভুর্ ভুর্ করিয়া সস্তা একটা এসেন্সের উগ্র গন্ধ বাহির হইতেছে।

কিন্তু মানাইয়াছে চমৎকার! হঠাৎ দেখিলে দু'দণ্ড তাকাইয়া থাকিতে হয়।

সুকুমার বলিয়া উঠিল, 'বাঃ! এ যে তোমায় দেখছি আর চিনতে পারা যাচ্ছে না বৌদি!'

সলজ্জ একটু হাসিয়া বীণা বলিল, 'কেন? অপরাধ?'

সুকুমার বলিল, 'অপরাধ নয় বৌদি, ছাই-চাপা আগুনের যেমন ছাই উড়ে গেলে আগুন বেরিয়ে পড়ে, তোমারও দেখছি আজ তাই হয়েছে। কাল থেকে দেখছিলাম, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, ময়লা একখানা কাপড়, পায়ে আলতা ছিল না—সত্যি বৌদি, আজ আপনাকে একেবারে নূতন মানুষ বলে' বোধ হচ্ছে।'

বীণা বলিল, 'তোমারও যে দেখছি মাথা খারাপ হলো ঠাকুরপো, আমার রূপ নিয়ে কবিত্ব করতে গিয়ে 'আপনি' 'তুমি'তে যে গুলিয়ে ফেললে।'

সুকুমার বলিল, 'তা হোক্ বৌদি, আপনাকে 'আপনি' না হয় নাই বললাম, কিন্তু সত্যি বলছি বৌদি, তোমায় আজ ভারি ভালো দেখাচ্ছে। দেখ তো, পায়ে আলতা না পরলে মেয়েদের কখনও মানায়! আজ তোমার ও পায়ের ওপর প্রণাম করতেও সুখ!'

বীণা হঠাৎ হাসিয়া উঠিল।

'বাঃ, হাসছো যে বৌদি? আমি কি মিছে বললাম?'

'না সেজন্যে হাসিনি, তুমি আলতার কথা বললে, তাই হঠাৎ হেসে ফেল্‌লাম। বাক্স খুলে দেখি—আলতা নেই। সে যে আজ ক'বচ্ছর ধরে' নেই কে জানে। তখন কি করলাম জানো?—ওই ছাখো!'

বলিয়া বীণা আঙুল বাড়াইয়া মেঝের উপর যে জিনিস-গুলি দেখাইয়া দিল সুকুমার সেগুলি চিনিতে পারিল না। বলিল, 'কি ওগুলো?'

বীণা বুঝাইয়া বলিল, 'আমাদের ওই ইঁদারার পাশে কতকগুলো ফণী-মনসার গাছ আছে দেখেছ? ওই গাছের ওগুলো ফুল কি ফল জানিনে ভাই, ছোটবেলায় ওই দিয়ে আমরা আলতা পরতাম; আজও হঠাৎ আলতা পরবার সখ হতেই লছমীকে ডেকে ছুরি দিয়ে ওইগুলো কেটে আনালাম। ভারি বিশ্রী কাঁটা, হাতে একবার ফুটলে আর সহজে বেরোতে চায় না, তাই খুব সাবধানে বেছে-বেছে ওইগুলো টিপে-টিপে লাল লাল রস নিঙড়ে আলতা যখন আমি পরছিলাম, তখন তুমি দরজায় কড়া নাড়লে, অতি কষ্টে হাসি চেপে তোমায় আমি দরজা খুলে দিলাম।—দাঁড়াও, ওগুলো ফেলে' দিই।'

বলিয়া সেই ফণী-মনসার ফলগুলা মেঝে হইতে কুড়াইয়া লইয়া বীণা হাসিতে হাসিতে জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে লাগিল।

সুকুমার বলিল, 'এতেই এম্‌নি, তা না জানি সত্যি-কারের আলতা পরলে,...'

হাত নাড়িয়া বীণা বলিল, 'হয়েছে।' বলিয়াই একবার হাসিল।

বলিল, 'নাঃ, এত প্রশংসা যখন করলে, তখন তোমায় এক পেয়ালা চা আমায় দেখছি এনে দিতেই হলো। উনোন আমার ধরে' গেছে, বেশি দেরি হবে না, বোসো।'

বলিয়া বীণা চা তৈরি করিতে গেল।

রান্নাঘর কাছেই, সুকুমার সেইখানে বসিয়া বসিয়াই বলিল, 'প্রশংসা নয় বৌদি, সাজ্‌লে তোমায় সত্যি বড় সুন্দর দেখায়।'

রান্নাঘর হইতে জবাব আসিল, 'কিন্তু তাতে ত' কিছু লাভ হবে না ঠাকুরপো, তুমি এবার খুব সুন্দরী একটি মেয়ে দেখে বিয়ে কর। মেয়ে দেখবার ভারটা না-হয় আমার হাতেই দিও।'

লজ্জায় সুকুমার চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

সেইদিন রাত্রেই সুকুমারকে মাণিকগঞ্জে যাইতে হইবে। না গেলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

সুকুমার বলিল, 'তোমায় ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছে হয় না বৌদি। সেকথা না বললেও বুঝতে নিশ্চয় পেরেছ।

আচ্ছা,—ফেরবার পথে যদি পারি ত' না-হয় আর একবার...'

'এসো' কথাটা বীণার মুখ দিয়া আর বাহির হইল না। সুকুমার যে এত শীঘ্র হঠাৎ আবার চলিয়া যাইবে তাহা সে একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিল।

হরিপদ ইহারই মধ্যে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাঁকিয়া বলিল, 'তুই তবে আয় সুকুমার, আমার আর দাঁড়াবার অবসর নেই।'

'যাই।' বলিয়া সুটকেশ্‌টা তুলিয়া লইয়া হরিপদর পিছু-পিছু সুকুমারও বাহির হইয়া গেল।

বীণার বাড়ীর পাশ দিয়া যে গাড়ী পার হইয়া যায় এ-দু'দিন বীণা সেকথা ভুলিয়াই ছিল, আজ এই অতিথিটি চলিয়া যাইবামাত্র দৃষ্টি তাহার আবার সেইদিকে নিবদ্ধ হইয়াই রহিল।

মাণিকগঞ্জ যাইবার গাড়ী পার হইল প্রায় আধঘণ্টা পরে। গাড়ীর আরোহীদের মধ্যে ছিল সুকুমার জানালার পথে তাকাইয়া, আর সেই ক্ষুদ্র গৃহের বাতায়ন-পার্শ্বে বীণা ছিল তাহার ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, আকাশে ছিল অজস্র জ্যোৎস্না, গাড়ীতে ছিল আলো, অথচ কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না, বীণার অস্থির চঞ্চল দু'টি চক্ষুতারকার সুমুখ দিয়া সশব্দে ট্রেণখানা পার হইয়া গেল।

শূন্য গৃহ আবার তেম্‌নি খাঁ খাঁ করিতে লাগিল।

আবার সেই একঘেয়ে একটানা জীবন!

দু'তিন দিন পরে আবার সুকুমারের ফিরিবার কথা।

বীণা জানালার কাছে বসিয়া বসিয়া ট্রেণ দেখে, আর ভাবে, আর দিন গুণে।

জানালার বাহিরে ধরিত্রীর যে ভগ্নাংশটুকু তাহার চোখের সুমুখে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিভাত হইয়া আছে, চোখ বুজিলেই যে-দৃশ্য তাহার মনশ্চক্ষে হুবহু ছবির মত ভাসিয়া ওঠে, সেটুকু দেখিয়া দেখিয়া এখন তাহার এমন হইয়াছে যে, সে না দেখিয়াও বলিয়া দিতে পারে—লাইনের ধারে একটি হেলানো পলাশগাছের নীচে একটি উইএর ঢিপি, পাশেই ছোট্ট একটি ডোবায় বারোমাস জল জমিয়া থাকে, তাহারই এককোণে একটি রক্ত-সাপ্‌লার ঝাড়, লাল রঙের দুইটি শালুক সে সেখানে রোজই ফুটিয়া থাকিতে দেখে, ঝোঁপের ভিতর একটি ডাহুক্-দম্পতি বোধ করি তাহাদের বাসা বাঁধিয়াছে। দিনের বেলা তাহারা কোথায় থাকে কে জানে, সন্ধ্যা হইলেই ডাহুক্ দুইটি তাহাদের সন্তান-সন্ততি লইয়া ওই সাপ্‌লা-ঝোঁপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বীণা জানে, সুমুখে ধানের মাঠের তিনটা মাঠ বাদ দিয়া চতুর্থ মাঠের আ'ল্‌টা বাঁকা। দূরে একটা পুকুরের পা'ড়ে পঁচিশটি তালের গাছ, দক্ষিণ দিক হইতে পাঁচটা গাছের পর যে ফাঁকটুকু আছে দিনের সূর্য্য সেইখানে গিয়া পৌঁছিলেই তাহার রং হয় লাল,—বীণা তখন বুঝিতে পারে—সূর্য্যাস্ত হইতে আর দেরি নাই।

কিন্তু আজকাল আর ও-সবের দিকে তাহার নজর যেন কম, আজকাল সে দেখে শুধু মাণিকগঞ্জ হইতে আসিবার ট্রেণ। ট্রেণের জানালার পথে আরোহীদের মধ্যে সুকুমারের অনুসন্ধান করে; নিরাশ হইয়া শেষে চুপ করিয়া বসে। বহুদূর হইতে শব্দ শুনিয়া সে ঠিক বলিয়া দিতে পারে—মাল-গাড়ী কি প্যাসেঞ্জার।

দু'দিন যায়, তিন দিন যায়, চার দিনের দিন—তখনও সে আশা ছাড়ে না, মনে হয়, সুকুমার আসিবে।

কিন্তু দিনের পর দিন পার হইয়া শেষে সপ্তাহ পার হইয়া গেল। সুকুমার আসিল না।

বীণা ভাবে, বিবাহ না করুক্, ছেলেটি বেশ ভাল ছেলে, কয়লার কারবার করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করে, যে-মেয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে সে হয় ত তপস্যা করিতেছে। নিজের রোজগার ছাড়িয়া দিয়া এখানে তাহার এমনই বা কি আকর্ষণ যে, বসিয়া বসিয়া দুদিন গল্প করিয়া যাইবে। আসিতে সে পারে না, আর কেনই বা আসিবে, আর সে-ই বা নিতান্ত স্বার্থপরের মত তাহার আসিবার কথাই-বা ভাবে কেন?

হরিপদর জামাটা বড় ময়লা হইয়াছিল, বীণাকে সেদিন সে ডাকিয়া বলিল, 'জামাটায় আজ একটু সাবান দিয়ে দিয়ো ত'।'

সাবান দিবার জন্য জামাটা সে উঠানে লইয়া যাইতেছিল, পকেটে কিছু আছে কি না দেখিবার জন্য একটা পকেটে হাত ঢুকাইতেই ভারি-মত কি একটা বস্তু তাহার হাতে ঠেকিল।—'এটা কি গো?'

জিনিসটা বাহির করিয়া বীণা দেখিল—লাল কাগজের বাক্সোয়-মোড়া তরল আলতার একটি শিশি। জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁগা, এটা তুমি পেলে কোথায়?'

আহারাদির পর হরিপদ একবার গড়াইয়া লইতেছিল, বলিল, 'দেখ্‌লে, কি-রকম মনের ভুল! আজ চার দিন ধরে' তোমায় বলব বলব করেও ভুলে গেছি। সুকুমার সেদিন রাত্রের ট্রেণে মাণিকগঞ্জ থেকে বাড়ী ফিরছিল, গাড়ী থেকে আমায় ডেকে সেদিন তোমার জন্যে ওই আল্‌তার শিশিটে দিয়ে গেছে। এত করে' বললাম তা কিছুতেই নামলো না, বললে, বড় জরুরী কাজ আছে দাদা, আজ আসি।'

অনেকক্ষণ ধরিয়া আলতার শিশিটি বীণা নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে লাগিল। খুলিয়া দেখিল, চমৎকার আলতা! রক্তের মত লাল!

* *
*

তাহার পর দেড় বৎসর পার হইয়াছে। সুকুমার আর আসে নাই। হরিপদর আরও চার টাকা মাহিনা বাড়িয়াছে।

তখন বসন্ত কাল। পলাশের ঝোপে, লাইনের ধারে, যেখানে-সেখানে যখন তখন কোকিল ডাকিতে সুরু করিয়াছে। এম্‌নি দিনে হরিপদর বদলির দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া আসিল।

বদলি হইয়াছে প্রকাণ্ড এক জংসন ষ্টেশনে। সেখান হইতে বেশি দূরে নয়। বীণার মামার বাড়ীর কাছেই।

কিন্তু হইলে কি হয়, বীণার যেন এখন আর সে উৎসাহ নাই। গত তিন চার মাস তাহাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে। অত রূপ তাহার এই অল্প দিনের মধ্যেই কেমন যেন ম্লান হইয়া গেছে।

বাসার জিনিসপত্র রামধনিয়া বাঁধা-ছাঁদা করিয়া দিল। লছমী আসিয়া চোখে কাপড় চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিল। যে-স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য বীণা একদিন পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ এই সুদীর্ঘ নয় বৎসরের পর সে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বীণার চোখেও জল আসিল।

জংসন-ষ্টেশনের চমৎকার কোয়ার্টার। বাড়ীগুলাও বড়, উঠানে জলের কল, স্নান করিবার ঘর, চৌবাচ্চা, ইলেক্‌ট্রিকের আলো। চারিদিকে লোকজন, গাড়ীঘোড়া, সাহেব-মেম,—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট খাটো শহরের মত জায়গা। লাল ফুলে-ভরা প্রকাণ্ড একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ দরজার সুমুখে একেবারে তাহাদের উঠানের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

হরিপদ হাসিয়া বলে, 'কেমন? হয়েছে ত' এবার?'

বীণাও ম্লান একটুখানি হাসে। ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'হ্যাঁ।'

হরিপদ বলে, 'ভালই হলো। এখানে এসে' শরীরটা তোমার সারবে এবার। রেলের একজন খুব বড় ডাক্তার আছে, কালই একবার ডেকে দেখাব ভাবছি।'

বীণা বলে, 'না গো না আর ডাক্তার দেখাতে হবে না। এন্‌নিই সেরে যাবে।'

কিন্তু সারে না। স্নান করিতে গেলেই গায়ে জল ঠেকিবামাত্র শরীরটা তাহার কেমন যেন শির্ শির্ করিয়া ওঠে, স্পষ্ট জ্বরও হয় না, অথচ ভিতরে ভিতরে দিন-দিন বড় দুর্ব্বল হইয়া যায়, তাহাতেই কোনোরকমে নিজের হাতেই সংসারের কাজকর্ম্ম করে, স্নানও করে, ভাতও খায়,—অথচ মুখ ফুটিয়া স্বামীকে কোনোদিন কোনও কথাই বলে না।

বলে না ত' বলে না, হরিপদও নিজের কাজকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকে, ডাক্তার আনিবার কথা সে ভুলিয়া গেছে।

এখানে আসিয়া অবধি হরিপদর প্রায়ই রাত্রে 'ডিউটি' পড়ে, দিনের বেলা পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়।

সেদিন সে অমনি ঘুমাইতেছে, রান্না সারিয়া হরিপদকে স্নান করিবার জন্য উঠাইতে গিয়া বীণা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। বলিল,

'ওগো, আমার জ্বর এলো।'

লেপের পর লেপ চাপা দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াও হরিপদ বীণার কাঁপুনি আর থামাইতে পারে না।

শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে লেপের তলা হইতে বীণা বলিল, 'ওগো তুমি রাত জেগেছ, যাও স্নান করগে, করে' নিজেই চারটি হেঁসেল্ থেকে—কি আর করবে লক্ষ্মীটি…'

বলিয়া লেপের তলায় হাত্‌ড়াইয়া হাত্‌ড়াইয়া হরিপদর হাতখানা বীণা তাহার আগুনের মত গরম হাত দিয়া ধরিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সে কান্না হরিপদ দেখিতে পাইল না।

'দাঁড়াও, আজই ডাক্তার আনছি।' বলিয়া সে স্নান করিবার জন্য উঠিয়া গেল।

নিজেই ভাত বাড়িয়া খাইয়া হরিপদ ফিরিয়া আসিতেই বীণা জিজ্ঞাসা করিল, 'খেলে? ভাল করে' খেয়েছ ত? কাঁসার সেই বড় বাটিতে মাছের ঝোল ছিল, আর কলাই-করা সেই সাদারঙের…'

কথাটা হরিপদ তাহাকে আর শেষ করিতে দিল না, বলিল, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সবই খেয়েছি। তুমি একটুখানি চুপ করে' ঘুমোও দেখি। আমি ডাক্তার ডেকে আনি।'

বীণা তাহার মুখের ঢাকা খুলিয়া বলিল, 'না, তুমি যেয়ো না। ডাক্তার ডাকতে হয়—এর পর ডেকো।'

এই বলিয়া সে একদৃষ্টে তাহার স্বামীর মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'আমায় এক গ্লাস জল দিয়ে তুমি ঘুমোও। তোমায় আবার রাত জাগতে হবে।'

বীণাকে জল খাওয়াইয়া হরিপদ সত্যই ঘুমাইল।

বৈকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখে, বীণা বসিয়া বসিয়া একটা ঝাঁটা লইয়া ঘর ঝাঁট দিতেছে। হরিপদ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'ও কি! ও কি হচ্ছে?'

বীণা হাসিয়া বলিল, 'জ্বর আমার অনেকক্ষণ সেরে' গেছে।'

হরিপদ বিশ্বাস করিল না। বলিল, 'পাগল হ'লে না কি?'

বীণা তাহার কাছে উঠিয়া আসিয়া বলিল,

'বিশ্বাস না হয়, ছাখো গায়ে হাত দিয়ে।'

হরিপদ তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিল, সত্যই তাই। জ্বর তাহার ছাড়িয়া গেছে।

বীণা বলিল, 'বড় ক্ষিদে পেয়েছে। কি খাই বল দেখি?'

হরিপদ উঠিয়া দাঁড়াইল। জামা গায়ে দিয়া বলিল, 'দাঁড়াও, আগে ডাক্তারবাবুকে একবার ডাকি।'

বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তার বলিয়া গেলেন, 'ম্যালেরিয়া, পুরনো জ্বর, ও অমনি আসে আর যায়। খেতে দিন, কিন্তু একবার চেঞ্জে পাঠাতে পারলে ভাল হয়।'

হরিপদ খানিক ভাবিয়া বলিল, 'চেঞ্জে? পাড়াগাঁয়ে পাঠালে চলে?'

ঘাড় নাড়িয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'চলে।'

বলিয়া তিনি ঔষধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান্ লিখিয়া দিলেন।

ঔষধ চলিতে লাগিল।

জ্বর অম্‌নি আসে আর যায়। হরিপদ বুঝাইয়া বলে,

'ছাখো, আমি কিছুদিন না হয় হোটেলেই খাই, আমার কোনও কষ্ট হবে না। তুমি যাও দিনকতক মামীমার কাছেই থেকে এসোগে, কেমন?'

বীণা বলে, 'না গো না, আমার কিচ্ছু হবে না, আমি বেশ আছি।'

হরিপদ রাগ করিয়া বলে, 'তোমার সঙ্গে কে পারবে বল! বেশ থাকো, এমনি করে' জ্বর আসুক্ আর অনাচার অত্যাচার কর, তার পর একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকবে, এখন হোটেলে খেতে দিচ্ছ না, তখন আমায় নিজে রেঁধে খেতে হবে।'

বীণা হাসিয়া বলে, 'মরি মরি, নিজে রেঁধে খাবার লোকটি কেমন! তখন তুমি আর-একটা বিয়ে করবে।'

হরিপদ আর জবাব দেয় না। রাগ করিয়া নীরবে বসিয়া থাকে।

বীণা তাহার রাগ ভাঙ্গাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে। বলে, 'না গো না, রাগ করলে? না না, বিয়ে তুমি করবে না তা আমি জানি। তোমার বিয়ে করবার সময় কোথায়?'

এমনি করিয়া রাগ-অভিমানের পালা চলিতে চলিতে বীণাকে একদিন রাজি হইতে হইল। বলিল, 'আচ্ছা

তবে তাই আমায় দিয়েই এসো বাপু, শরীরটা না-হয় সেরেই আসি। কিন্তু—'

'কিন্তু কি ?'

বীণা বলিল, 'আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করে' বল··· ওগো না না, ছি! হোটেলে আবার মানুষে খায়! তার চেয়ে এক কাজ কর। এখানে একটা রাঁধুনী বামুন পাওয়া যায় না ?'

হরিপদ বলিল, 'আচ্ছা তাই না-হয় একটা বামুন-টামুন দেখে বাড়ীতে রান্না করিয়েই খাব।'

বীণা বলিল, 'খাব নয়। তোমায় আমি খুব ভাল করে' চিনি। পকেটে আলতার শিশি রেখে যে চার দিন ভুলে যায়···বামুন তুমি একটা নিয়ে এসো ডেকে। তাকে আমি দেখিয়ে-শুনিয়ে দিই, দুদিন রান্না করুক, আমি দেখি,—তার পর···'

ব্রাহ্মণ এক ছোকরাকে পাওয়া গেল। নাম যতীন। সেখান হইতে ক্রোশখানেক্ দূরের একটা গ্রামে তাহার বাড়ী। রাঁধে ভাল। কাজকর্ম্মও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

বীণা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিল। তাহার পর স্বামীকে তাহার গায়ে মাথায় হাত দিয়া ঠিক সময়ে স্নানাহার করিবার শপথ করাইয়া জানাইল যে, সে যাইতেছে বটে, কিন্তু মোটেই সে সেখানে বেশি দিন থাকিতে পারিবে না, চিঠি লিখিবামাত্র সে যেন তৎক্ষণাৎ নিজে গিয়া তাহাকে লইয়া আসে।

বলিল, 'বাক্স আমি নিয়ে যাব না। দু'চারখানা কাপড়-জামা তোমার ওই টিনের হাত-বাক্সটাতে যা ধরে তাই নিয়েই আমি চললাম। তার পর দরকার হয়—মামীমা দেবেন, সেজন্যে ভেবো না।'

দিন কয়েক পরে একটি দিনের মাত্র ছুটি লইয়া হরিপদ তাহাকে তাহার মামীমার কাছে রাখিয়া আসিল।

বাপের বাড়ী কাছেই, কিন্তু সেখানে তাহার মাও নাই বাবাও নাই, মামার বাড়ীতেই ছেলেবেলা হইতে মানুষ, তাই তাহাকে তাহার মামীমার কাছে রাখিয়া আসা ছাড়া আর উপায় কি!

বীণার চিঠি আসে—সে বেশ ভালই আছে। জ্বর এক-আধটু মাঝে-মাঝে আসে বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়, আসে আর যায়।

চিঠি পড়িয়া হরিপদ খুসী হয়। আহা, এত দিনের সাধ তাহার—বদলি হইয়া যদিই-বা সে জংসন-ষ্টেশনে আসিল, আসিয়া অবধি একটি দিনের জন্যও সে সুখে বাস করিতে পায় নাই, এইবার সে সারিয়া আসিয়া আবার সেই আগের মতই হাসিয়া খেলিয়া কাজ করিয়া বেড়াইবে।

কিন্তু দুনিয়ার বিধাতা বুঝি হরিপদর চেয়েও নিষ্ঠুর। তাহারই মত অন্ধ!

এক মাস পার হইতে না হইতেই বীণার মামীমার কাছ হইতে এক চিঠি আসিল।—বীণার যেমন জ্বর হয় তেম্‌নি জ্বর আসিতেছিল, দিন চার-পাঁচ আগে জ্বরটা একটু বেশি করিয়াই আসিয়াছে, এখনও মগ্ন হয় নাই, কাল রাত্রে একটু বিকারের মত হইয়াছিল, ভুল বকিতে বকিতে হঠাৎ বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেছে, জ্ঞান রহিয়াছে কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। তুমি বাবা একবার আমার এই চিঠিখানি পাইবামাত্র আসিও।

চিঠিখানি পাইবামাত্র হরিপদর মাথা ঘুরিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে গিয়া, ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া একশিশি ঔষধ লইয়া হরিপদ ট্রেণে চড়িয়া বসিল।

গ্রামে ঢুকিতে বুকখানা তাহার অজানা আতঙ্কে দুর্ দুর্ করিতেছিল, তবু সে গ্রামে ঢুকিল। লোকজনের মুখের পানে তাকাইতে তাহার ভরসা হইল না। কোনো-রকমে মুখ নীচু করিয়া মামীমার ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইতেই দেখা গেল, মামীমা নিজেই দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। হরিপদকে দেখিবামাত্র তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরিপদ তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অতি কষ্টে মামীমা বলিলেন, 'হয়ে গেছে বাবা, বীণি চলে' গেছে।' আর-কিছু তিনি বলিতে পারিলেন না। বলিবার প্রয়োজনও ছিল না। হরিপদ

তখন মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে, চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতেছে, ঠোঁট দুইটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

এমন অকস্মাৎ সে যে চলিয়া যাইবে কে জানে!

মামীমা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন। বীণার ওষুধের শিশিটা সেইখানেই কাৎ হইয়া পড়িয়া রহিল।

দেখা গেল, শবদাহের জন্য গ্রামের লোকজন আসিয়া উঠানে জড়ো হইয়াছে। সুমুখে ঘরের মেঝের উপর বীণার মৃতদেহ আপাদ-মস্তক সাদা চাদর দিয়া ঢাকা।

চাদরখানা সরাইয়া দিয়া উন্মাদের মত হরিপদ তাহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

মামীমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'যাবার সময় কিছু বলে' গেল না বাবা, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' চেয়ে রইলো।'

কথাটা শুনিয়া হরিপদর কান্না যেন আরও বাড়িয়া গেল। বীণার সেই অর্দ্ধ-মুদ্রিত ঘোলাটে দুইটি চক্ষুর পানে তাকাইতে গিয়াও সে আর তাকাইতে পারিল না। বুকের ভিতরটা তাহার মোচড়্ খাইয়া হু হু করিয়া উঠিতেই সে মামীমার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, 'আসতে সে চায়নি মামীমা, আমি ওকে জোর করে' পাঠিয়েছিলাম।'

নদীতীরের শ্মশানে বীণার মৃতদেহ দেখিতে দেখিতে চোখের সুমুখে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

হরিপদকে মামীমা বার-বার করিয়া শ্মশান হইতে বাড়ী ফিরিতে বলিয়াছিলেন, শবযাত্রীরাও বারে-বারে তাহাকে গ্রামে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু হরিপদ কাহারও কথা শুনিল না। অবস্থা তখন তাহার ঠিক পাগলের মত। বীণার হাতের আটগাছি সোনার চুড়ি ও কানের দুলটি লইয়া ভিজা কাপড় পরিয়া ভিজা জামাটা কাঁধে ফেলিয়া নদীতীরের পথের উপর দিয়া হরিপদ চলিয়া গেল। পুরোহিত তাহার পিছনে-পিছনে কিছুদূর ছুটিয়া আসিয়া কাঁচা মাটির একটা ঢেলার মধ্যে খানিকটা চিতাভস্ম ও বীণার অস্থি কয়টি তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'পার ত' এইটি গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ো; বুঝলে? দিতে হয়।'

মাটির ঢেলাটিও হরিপদ হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিল।

ট্রেণে চড়িয়া হরিপদ যখন তাহার নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে নামিয়া বাসার দিকে চলিতে লাগিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রেল লাইনের উপর দিয়া প্রকাণ্ড একটা সেতু পার হইতে হয়। তাহারই উপর দিয়া হরিপদ ধীরে-ধীরে চলিতেছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ষ্টেশনে কয়েকবার মাল-গাড়ী হইতে প্রচুর জিনিসপত্র চুরি যায়, তাই এখন এখানে বহুদূর পর্য্যন্ত ইলেক্‌ট্রিক আলোর ব্যবস্থা। আলোগুলা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে লোহার লাইন, আর তার, আর গাড়ী! অদূরে 'লোকোশেড্।' কালো কালো প্রকাণ্ড দানবের মত ইঞ্জিনগুলা হুম্ হুম্ করিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। ওদিকে ইলেক্‌ট্রিকের ইঞ্জিন-ঘর, ওদিকে কারখানা, এদিকে যন্ত্র, ওদিকে কল। শুধু লোহা আর ইস্পাত্, শুধু ষ্টীম্ আর আগুন্! হরিপদর আপিসটা দেখা যাইতেছিল। কলের মত লোকগুলা সেখানে কাজ করিতেছে। মনে হইল, সে নিজেও ওই কল-কারখানার সামিল। যন্ত্রের মত পরের ইঙ্গিতে সেও তাহার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের যাত্রাপথে অন্ধের মত হাঁটিয়া চলিয়াছে। ছুটি নাই, অবসর নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই—মৃত্যুপথযাত্রী বীণাকে একটুখানি দেখিবার অবসর পর্য্যন্ত নাই! বীণার কথা মনে হইতেই তাহার চোখের সুমুখে যেন হুহু করিয়া চিতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—নদীতীরের সেই শ্মশান আর সেই চিতা; আর সেই ধূম, সেই আগুন, আর সেই নিসাড় নিস্পন্দ বীণার মৃতদেহ!···হাতে তাহারই অস্থি!

ধীরে-ধীরে এক পা এক পা করিয়া হরিপদ সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলা দিয়া তাহার কোয়ার্টারের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। সেই কোয়ার্টার! এইখান হইতেই বীণাকে সে জোর করিয়া মামীমার কাছে রাখিয়া আসিয়াছিল। ঘরের বাহিরে একটা আলো জ্বলিতেছে। দেখিল,—যতীন-ছোক্‌রাটি বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া

গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হরিপদ তাহাকে আর জাগাইল না। ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিল। ভিজা কাপড় প্রায় শুকাইয়া গেছে। জামাটা কাঁধ হইতে নামাইয়া রাখিতে গিয়া ঠক্ করিয়া কিসের যেন শব্দ হইল। হাত দিয়া দেখিল, বীণার চুড়ি! বীণার চুড়ি ও দুল সে বীণার বাক্সেই রাখিয়া দিবে ভাবিয়া খাটের নীচে বালিসের তলা হইতে তাহার চাবির তোড়াটি বাহির করিয়া সে বাক্স খুলিল। বীণার সেই বাক্স। তাহারই নিজের হাতের সাজানো জিনিস! কিন্তু এ কি! থাকে-থাকে সাজানো কাপড় জামা সব যেন লাল! মনে হইল—সব যেন রক্তে-ছোপানো। হরিপদ তাহার চোখ দুইটা ভাল করিয়া রগ্‌ড়াইয়া লইল,—দেখিল, না, চোখের ভুল নয়, সত্যই তাই। কম্পিত হস্তে ধীরে-ধীরে একটি একটি করিয়া কাপড়-জামাগুলি হরিপদ নামাইতে লাগিল। দেখিল, বাক্সের এককোণে সযত্ন-রক্ষিত সুকুমারের দেওয়া সেই আল্‌তার শিশিটি। ভাঙ্গিয়া কোন্ সময় সমস্ত আল্‌তা গড়াইয়া পড়িয়াছে!

কয়েকটি কাপড়ের তলায় দেখিল, তাহারই দেওয়া রেল-কোম্পানীর একটি সাদা খাতা। খাতার কয়েকটি পাতা ছিঁড়িয়া চিঠির মত কি যেন লেখা হইয়াছে। কাগজগুলি হরিপদ তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। বীণার হাতের লেখা কয়েকখানি চিঠি! কিন্তু চিঠির অধিকাংশ অক্ষর লাল আল্‌তার দাগে অস্পষ্ট। এক-খানি চিঠির কিয়দংশ সে পড়িতে পারিল। লেখা আছে—

'ভাই ঠাকুরপো—' তাহার পর অনেকগুলি অক্ষর কাটা। তাহার পর লিখিয়াছে, 'তোমাকে যে চিঠি দিব কিন্তু ঠিকানা জানি না যে!'

সে চিঠিখানির আর-কিছু পড়িবার উপায় নাই।

আর-একখানি চিঠি! আগাগোড়া সবই লাল, মাঝখানে মাত্র কয়েকটি লাইন—

···'সাজিলে আমাকে ভাল দেখায়। তুমি যে আমায় আল্‌তা পরিয়া ভাল করিয়া সাজিতে বলিলে, কিন্তু কাহার জন্য সাজিব ভাই? কে দেখিবে? তোমার দাদা কাজের লোক। চব্বিশ ঘণ্টা সে তাহার কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকে। তাহার কি আর দেখিবার অবসর আছে ছাই!·····'

হরিপদর হাত হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে কাগজগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল। মাথার ভিতরটা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। এবং তাহার দুই মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখে মনে হইল যেন সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড লাল রক্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।···চারিদিকে অজস্র ইঞ্জিন আর ধোঁয়া, কল আর কারখানা, টেলিগ্রাফের তার, আর যন্ত্রের শব্দ!··· ওদিকে হুইস্‌ল্ বাজিল, এদিকে ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, রামধনিয়ার চীৎকার, লছমীর ঝগড়া,···টেলিগ্রাফ আসিয়াছে···বীণার অসুখ, বীণা রাগ করিয়াছে, বীণা চলিয়া যাইবে! সত্যই ত! তাহার অবসর কোথায়! তাহার অবসর কোথায়!···

কোয়ার্টারের মাঠে যাত্রা শুনিয়া যতীন এমন ঘুম ঘুমাইয়াছে যে, উঠিল যখন, তখন প্রভাত হইয়া গেছে। ধড়্‌মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিল, দরজা খোলা, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, বাবু কোন্ সময় আসিয়াছেন তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। ঘরে ঢুকিতেই দেখে, বাবুর খালি গা, খালি পা, বাক্স খোলা, বাক্সর জিনিসপত্র ঘরময় ইতস্ততঃ ছড়ানো, আর তাহারই মাঝখানে বাবু তাহার বাক্সের ডালির উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

আর···পাশের বাড়ীর সাদা রঙের একটা পোষা বিড়াল বীণার সেই অস্থি-পিণ্ডটা লইয়া ঘরের মেঝের উপর পা দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া খেলা করিতেছে!

সোনালি সূতা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বড়লাট ও ছোটলাটের বাসভবন

প্রথম গভর্ণমেণ্ট হাউস্, বর্ত্তমান কাষ্টম্ হাউসের উত্তরে অবস্থিত ছিল। ইহা ইষ্টক-নির্ম্মিত মাটির গাঁথনির একখানি সামান্য বাড়ী ছিল। এই স্থানেই জব্ চার্ণকের জামাই চার্লস্ আয়ারের (Charles Eyre) বাসভবন ছিল। ঝটিকাবর্ত্তে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার পর ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

* * *

দ্বিতীয় গভর্ণমেণ্ট হাউস্ পুরাতন দুর্গের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত ছিল। ইহা একটি মনোরম অট্টালিকা—গঙ্গার দিকে ২৪৫ ফিট লম্বা ছিল এবং প্রধান প্রবেশ-পথ হইতে গঙ্গার ধারের প্রধান ফটক পর্য্যন্ত স্তম্ভশ্রেণী বিরাজিত ছিল। উত্তর-পশ্চিম বুরুজের নিকট একটি ছোট ঘাট ছিল। এই ঘাট দিয়াই সিরাজদ্দৌলা ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদের পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডার বাহিরে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডের উপর অন্ধকূপের নির্য্যাতিত হলওয়েল্ ও তাঁহার অন্যান্য জীবিত সহকর্ম্মীদের সহিত অন্ধকূপ-হত্যার পরদিন প্রাতে নবাবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং ধন-রত্নাদির সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রশ্ন করা হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

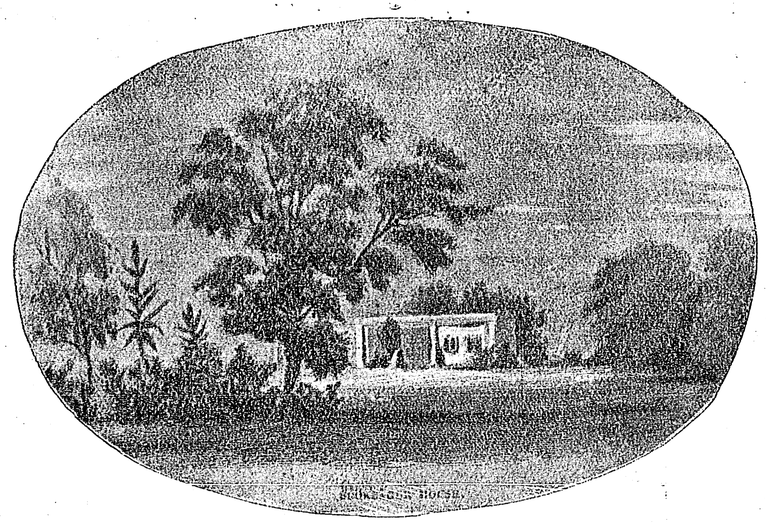

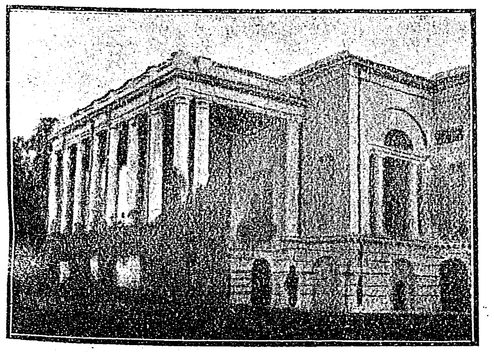

হেষ্টিংসের সুখসাগরের বাটীর ধ্বংসাবশেষ

* * * *

ইহার পরের লাট ভবন দুর্গের বহির্ভাগে দক্ষিণ দিকে ছিল। উহা কোম্পানীর বাড়ী বলিয়া খ্যাত ছিল। উহা একটী ত্রিতল বাটী—১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল; কারণ ঐ বৎসরে কলিকাতার যে নক্সা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে উহা স্পষ্ট চিহ্নিত আছে। কলিকাতা আক্রমণের সময় উহা থানার কাজ করিয়াছিল।

বারাকপুর লাটভবন

জানা যায় ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে এই বাটী ধ্বংসপ্রায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং শীঘ্রই উহাকে ভাঙ্গিয়া উহার জমি বাঁকশাল্ করেন। মিড্‌লটন্ রোডে লোরেটো কন্‌ভেণ্ট যে স্থ আছে উহা তথায় ছিল।

* * * *

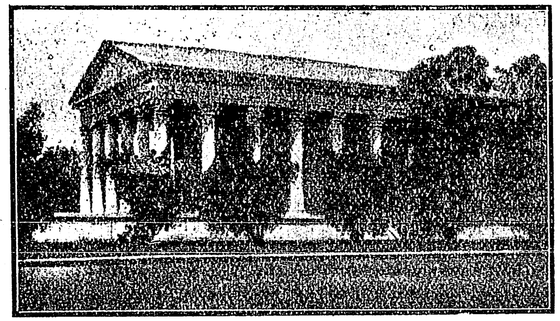

মেমোরিয়াল হল—বারাকপুর

অর্থাৎ জাহাজের মালপত্র রাখিবার স্থানে পরিণত করা হয়। তাহা হইতেই পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তার নাম হয় বাঁকশাল্ ষ্ট্রীট্।

* * * *

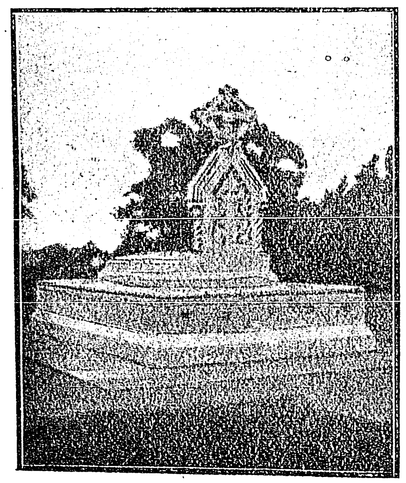

লেডি ক্যানিংয়ের সমাধি

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কারভালহো (Ca valho) নামক এক ব্যক্তির একটি বাটী আয়ার কুটের জন্য ক্রীত হয় এবং ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টের (Henry Vans t art) অধিকারে আইসে। উহা সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ভ্যান্সিটার্ট রোডে অবস্থিত ছিল। ভ্যান্সিটার্ট কাউন্সিলের সদস্য ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড (William Frankland) সাহেবের সম্পত্তি

ক্লাইভ্ দুইবার ফোর্ট উইলিয়মের গভর্ণর হন। প্রথ বার তিনি হুজুরিমলের একটী বাটীতে বাস করি

জন জোফানি

ছিলেন। দ্বিতীয়বার আসিয়া তিনি এস্‌প্লানেডের একটী বা যাহা নূতন কাউন্সিল হাউস্ বলিয়া পরিচিত ছিল, তা থাকিতেন। ক্লাইভষ্ট্রীটে বর্ত্তমান রয়েল্ এক্সচেঞ্জ বা গ্রে

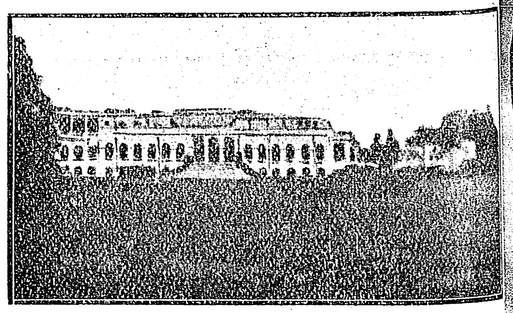

বেলভেডিয়ার—দক্ষিণ দিক হইতে :

কোম্পানীর বাটী যে স্থানে আছে তথায় ক্লাইবের এক বাটী ছিল। উহাতে পরে ফ্রান্সিস্ ফিলিপ্‌ও বাস করি ছিলেন। দমদমাতে ক্লাইবের একটী বাড়ী ছিল, উহা

দম হাউস বলিত। খুব সম্ভব উহা ওলন্দাজ বা পোর্ত্তুগীজ ছিল। দেশীয়রা ইহাকে কেল্লা বলিত। ইহা বাঙ্গালার একটী পুরাতন বাটী।

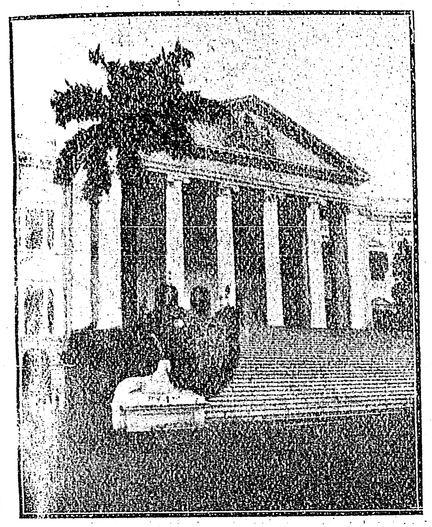

লাটভবনের সোপান-শ্রেণী

* * * *

চতুর্থ লাটভবন—ইহা ১৭৬৪ অথবা ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিল্ হাউস রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান লাট-প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ইহা অবস্থিত ছিল। ইহা হইতে কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট নাম হইয়াছে। ড্যানিয়েল্ এবং বেলির অঙ্কিত চিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চিম দিকের বাড়ীটি সেই বাড়ী। ১৭৮৫ ও ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের প্রস্তুত নক্সাতেও ইহা দেখান আছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৭২ হইতে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বাটীতে বাস করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি পূর্ব্বোক্ত ভবন-সংলগ্ন উত্তর দিকের বৃহৎ

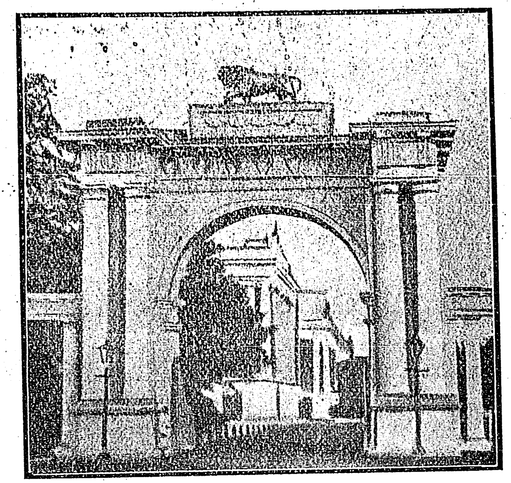

লাট-ভবনের তোরণ

অট্টালিকায় বাস করিয়াছিলেন। উহা মহম্মদ রেজাখাঁর সম্পত্তি—কোম্পানী ভাড়া লইয়াছিলেন। ইহার নিকটে

ডোভড ব্রাউন

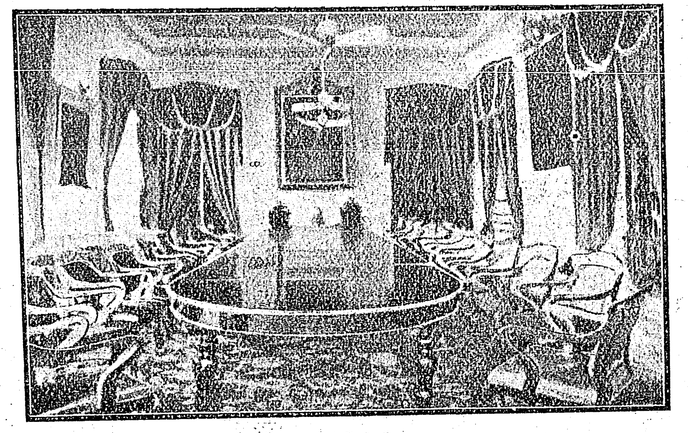

কাউন্সিল চেম্বার—লাটভবন

বাকিংহাম্ হাউস নামে আর একটি বাটীর কথা জানা যায়। হেষ্টিংস এ বাটীতেও বাস করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জনের মতে ইহাই পঞ্চম গভর্ণমেণ্ট ভবন।

TIGHT BINDING.

* * * * *

হেষ্টিংসের বাড়ী—সরকারি বা ব্যক্তিগত যে ভাবেই

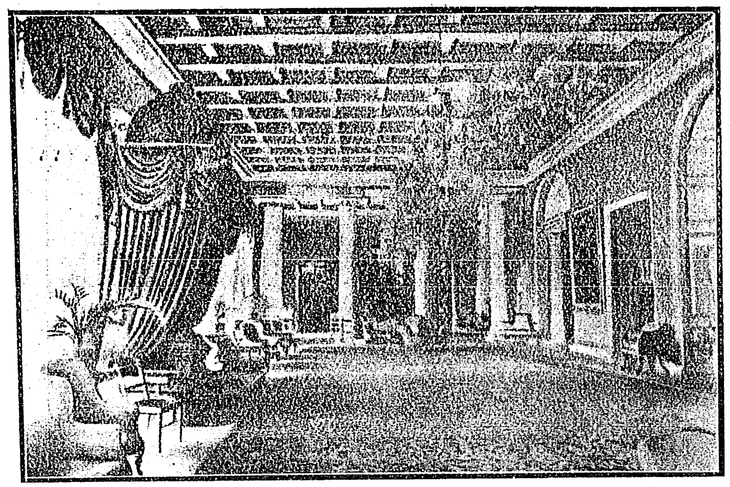

সিংহাসন-কক্ষ—লাট-ভবন

হোক হেষ্টিংস আরও অনেকগুলি বাটীতে বাস করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনেকগুলিই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি ছিল।

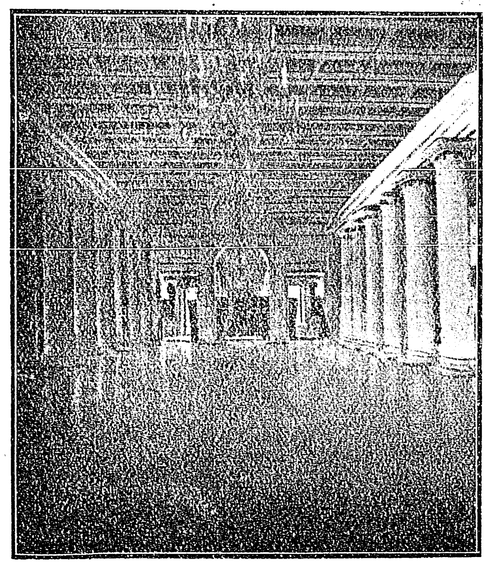

মারবেল দরবার-কক্ষ—লাট ভবন

বেঙ্গল আর্ম্মির সৈনিক

৭নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে যেখানে বার্ণ কোম্পানীর অফিস ছিল, সে বাটী তাঁহার ছিল। তাঁহার পত্নী ব্যারনেস ইন্হফ্ প্রায়ই এই বাটীতে বাস করিতেন। আলিপুর জজ আদালতের নিকট "হেষ্টিংস হাউস" নামক বাড়ীটিও তাঁহার ছিল। ইহা নবাব মিরজাফরের নিকট হইতে উপহার স্বরূপ পাইয়াছিলেন। হেষ্টিংস তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীকে লইয়া এই বাটীতে বাস করিতেন। ১৭৭৫ হইতে ৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটের পশ্চিম দিকের একটি ভাড়াটীয়া বাটীতে তিনি বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানেই ইম্হফের (Baroness Inhoff) সহিত বিবাহের পূর্ব্বে তিনি বাস করিয়াছিলেন। চিৎপুরের নিকট কাশীপুরের বাগান নামে ২১৬ বিঘা জমি সমেৎ তাঁহার একটি বাগানবাড়ী ছিল। এ বাটীতে তিনি কখন বাস করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। কাডবার্ট থর্ণহিল (Cudberat Thornhill) নামক এক ব্যক্তিকে তিনি সম্ভবতঃ বিলাত যাইবার সময় ইহা বিক্রয় করিয়া যান।

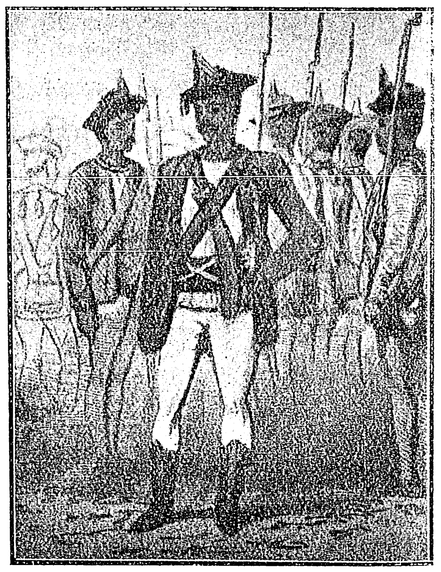

রিষড়ায় বর্ত্তমানে যে স্থানে পাটকল আছে উহা হেষ্টিংসের পল্লীভবন ছিল। উহা ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হেষ্টিংস বিক্রয় করেন। এই বাটীতে তিনি কখনও বাস

ড্রইং রুম—লাট-ভবন

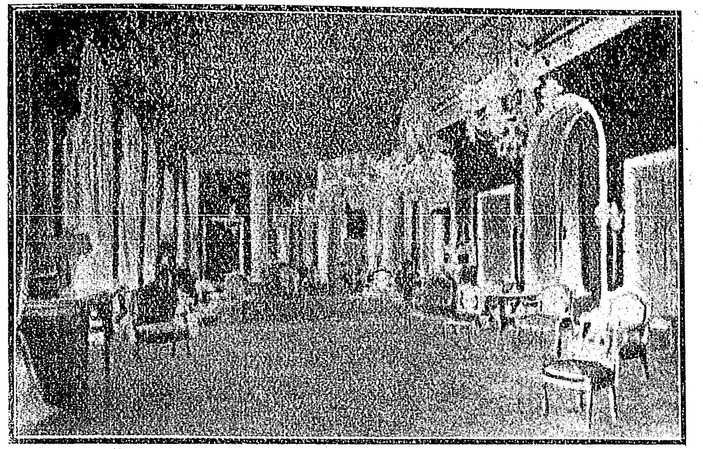

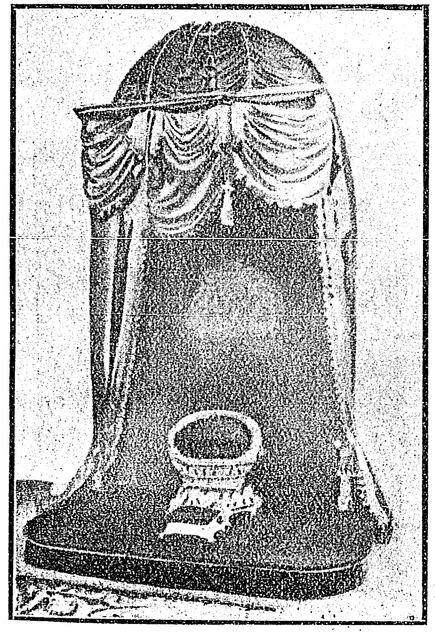

টিপু সুলতানের সিংহাসন—লাটভবন

করিয়াছেন এ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুখসাগরেও হেষ্টিংসের একটী পল্লীবাস ছিল। ফরবেশের লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায়, উহা তৎকালে পাশ্চাত্য স্থাপত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন ছিল। এই বাটী হেষ্টিংস তৈয়ারি করান এবং তথায় একটি ইংরাজি ফার্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরে উহা সুবিখ্যাত ধনী বোরেটো খরিদ করেন এবং তথায় একটি রোম্যান্ ক্যাথলিক্ গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী লওরালেটা (Laur le[illegible]) ব্যবসাদারদের বাসভবন ও মোরগের লড়াইয়ের আড্ডায় পরিণত করেন। উহা বহু দিন হইল গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। লর্ড কার্জ্জনের মতে হেষ্টিংস অন্ততঃ তেরটি বাটীতে বাস করিয়াছিলেন।

* * * *

ষষ্ঠ লাটভবন—ইহা বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের যে অংশ এক্ষণে সৈন্যদের ইন্‌ষ্টিটিউটরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে অবস্থিত ছিল। এই বাটীতেই কর্ণওয়ালিস বাস করিতেন এবং যতদিন না বর্ত্তমান লাট ভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল ততদিন

জয়-স্মৃতি—লাটভবন (১ম চিত্র)

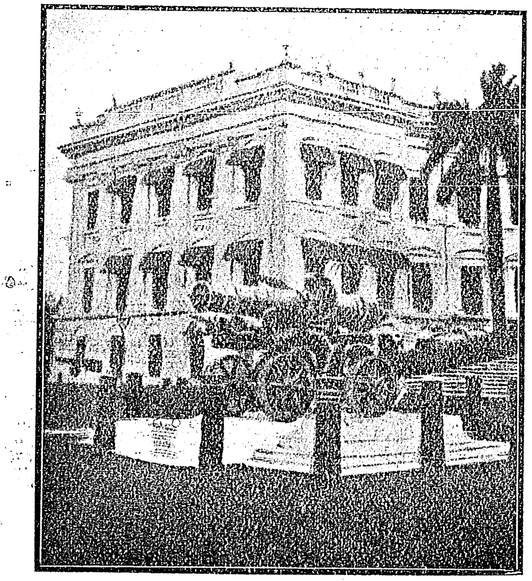

TIGHT BINDING

ওয়েলেস্‌লিও এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। ট্রেজারি বিল্ডিং সংলগ্ন একটী বাটীতেও তিনি বাস করিতেন। ইহা বহু কাল হইতে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহারও বহু পূর্ব্ব

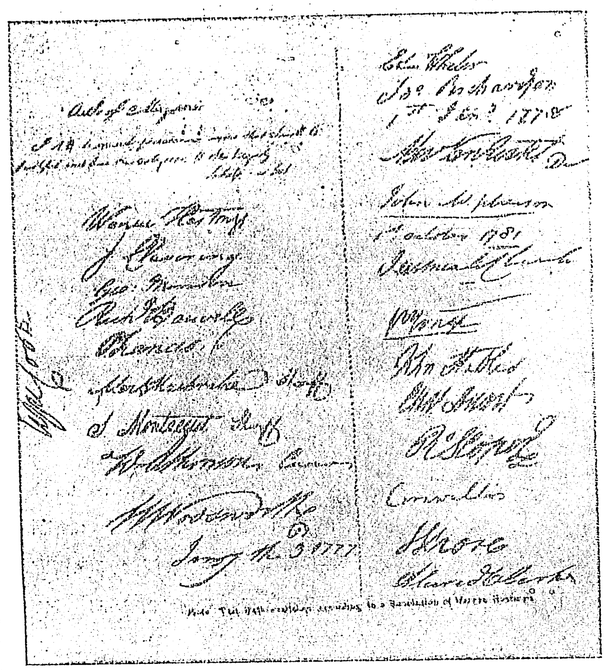

হেষ্টিংস্, ক্লেভারিং, মনসন, বারওয়েল্, কর্ণওয়ালিস্, শোর প্রভৃতির স্বাক্ষরের প্রতিলিপি

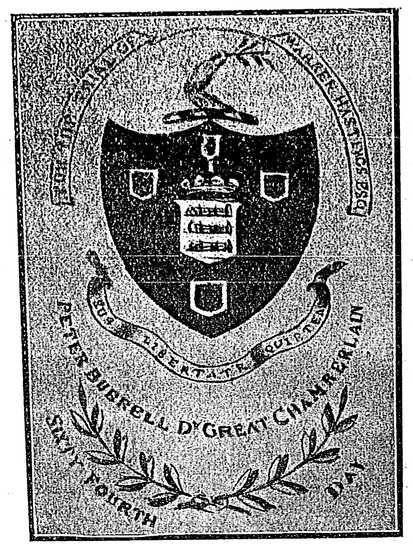

ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিচার দর্শনের জন্য প্রবেশপত্র

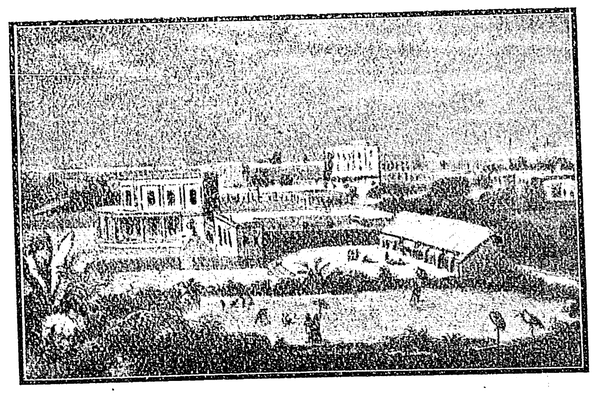

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতার একটি দৃশ্য

কিন্তু বাটী নির্ম্মাণ-কালে ব্যারাকপুরেই তাঁহার ঠিক বাস-স্থান ছিল।

* * * *

হইতে এই ব্যারাকপুরের সহিত ইংরাজদের সম্পর্ক ছিল। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্ণক এই স্থানে একটি

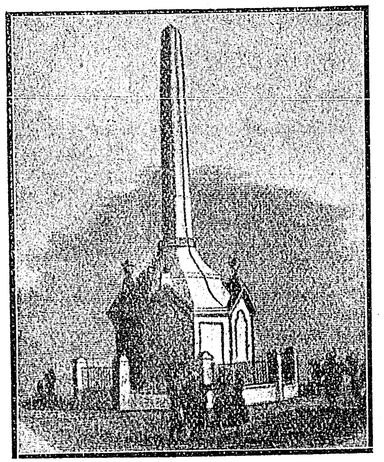

প্রাচীনকালের অন্ধকূপ স্মৃতি-স্তম্ভ

বাংলো নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ও একটী বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তদবধি দেশীয় লোকেরা স্থানটীকে চানক নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানে

প্রথম সৈন্যাবাস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহা হইতে ব্যারাকপুর নাম হয়। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ক্যাপটেন্ ম্যাকিন্‌টায়ার (Captain John Macintyre) ব্যারাকের পরিসর বৃদ্ধি বা সেনাপতির

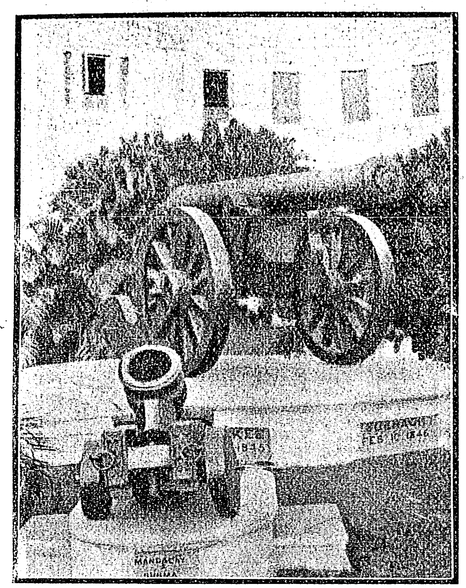

জয়স্মৃতি—লাটভবন। (২য় চিত্র)

সুবিধার জন্য তাঁহার দুইখানি বাংলো ও ২২০ বিঘা জমি গভর্ণমেণ্টকে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন। উহা ২৫০০০৲ টাকায় ক্রীত হইয়া তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল্ ম্যাক্ ফার্শনের সম্মতিক্রমে সেনাপতির হস্তে অর্পিত হয়। কর্ণ-ওয়ালিশ এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে; যদি তাহা সত্য হয় তবে তিনি গভর্ণর জেনারেলের সহিত সেনাপতিও ছিলেন এই জন্যই বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে লর্ড ওয়েলেস্‌লি দ্বারা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেলের সম্পত্তি করিয়া লওয়া হয়। তিনি অবিলম্বে এই স্থানটির উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় পুরাতন বাংলো ভাঙ্গিয়া নূতন বাটী যাহাকে "নূতন বাংলো" বলে তাহা নির্ম্মিত ও সুবিন্যস্ত উদ্যান রচিত হয়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তথায় একটি চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠা

ব্যারাকপুরের সৈন্যাবাস

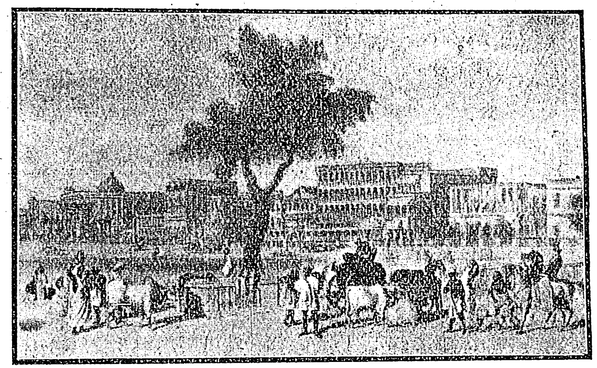

প্রাচীন এস্‌প্ল্যানেডের এক অংশ

আর্ল অব মিণ্টোর দ্বারা আরম্ভ হইয়া তাঁহার পরবর্ত্তী গভর্ণর মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস দ্বারা সমাপ্ত হয়। সাহসী

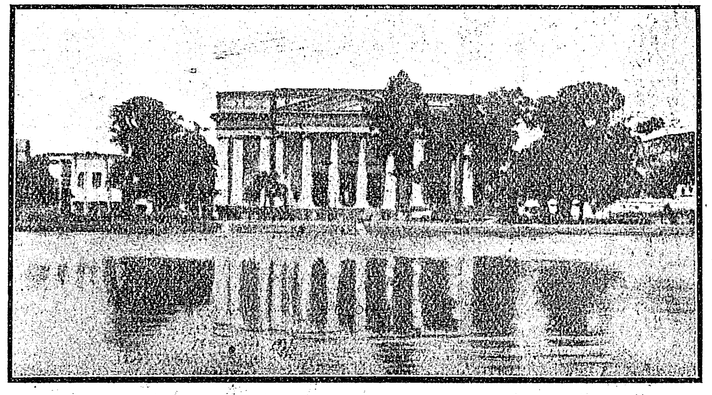

সেনেট হাউস

সৈনিকদিগের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে মিণ্টোর দ্বারা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে "মেমোরিয়েল হল" নামক অট্টালিকাটি নির্ম্মিত হয়। অপরাপর গভর্ণরদিগের মধ্যে প্রথম ভাইসরয় লর্ড

ক্যানিং ও তাঁহার পত্নীর এই স্থানটি বড়ই প্রিয় ছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে লেডি ক্যানিংয়ের কলিকাতায় মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার দেহ এই স্থানে সমাধিস্থ করা হয়।

* * * *

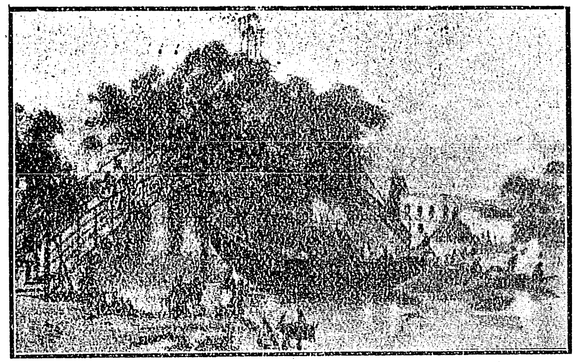

টালির খালের উপর সেতু

বেলভেডিয়ার—ব্যারাকপুরে যেমন গভর্ণরের পল্লীবাস, সহরের উপকণ্ঠে আলিপুরে ছোটলাটের সরকারি বাসভবন বেলভেডিয়ারও তেমনই। ইহার প্রথম উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। জনপ্রবাদ, ইহা ১৭০০

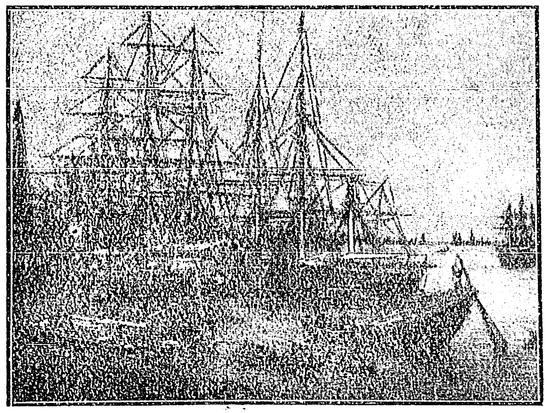

কলিকাতা বন্দরের দৃশ্য—১৮৪৮

খৃষ্টাব্দে প্রিন্স্ আজিম উস্শান্ দ্বারা প্রথম আরম্ভ হয়। উহা মিঃ ফ্র্যাংক্ল্যাণ্ডের (Mr. Frankland) বাগান-বাড়ী ছিল এরূপও জানা যায়। রেভারেণ্ড্ লংয়ের বর্ণনায় ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বাটীর প্রসঙ্গে ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে বেলভেডিয়ার নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। হেষ্টিংসের এই উদ্যানভবনে যাইবার জন্য কালিঘাটের খালের উপর

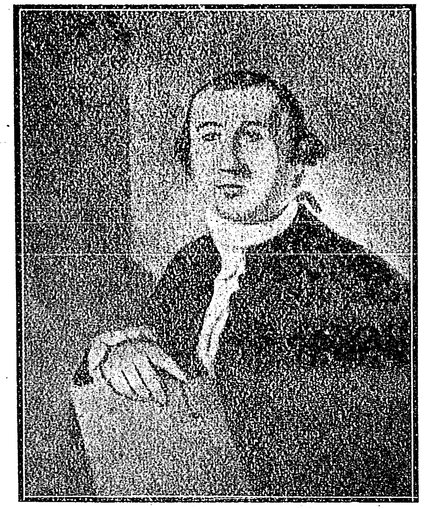

চার্লস সিলি

এলিজা ফে

পুল নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ষ্টাভোরিনাস্ (Stavorinus) এই স্থানের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

হাণ্টার সাহেব (Sir W. W. Hunter) বেলভেডিয়ার হেষ্টিংসের প্রিয় বাসভবন ছিল বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কি সূত্রে ইহা তিনি পাইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। "হেষ্টিংস হাউস্" নামে তাঁহার অপর একটি বাড়ী যাহা আজিও সরকারি অতিথিভবন রূপে আছে তাহা উহার দক্ষিণে। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ মেজর টলিকে (Major Tolly) বেলভেডিয়ার ভবন বিক্রয় করেন। তৎপরে নিকোলাস নিউজেণ্ট (Nicholas Nugent) টমাস্ স্কটের (Thomas Scott) জন্য ইহা নীলামে খরিদ করেন। ইহার পর ব্রেরেটন্ বার্চ (John Brireton Birch) শম্ভুচন্দ্র মুখার্জ্জি ও জেমস্ ম্যাকিলপ্ (James Mackillop)এর হাত ফিরিয়া ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইহা সুপ্রসিদ্ধ প্রিন্সেপ্-বংশের সম্পত্তি হয় এবং অবশেষে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট্ প্রিন্সেপ্ (Charles Robert Princep) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ইহা বিক্রয় করেন। তাহার পর হইতে ইহা ছোটলাটের বাসভবন রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রথম ছোটলাট হ্যালিডে (James Halliday) এখানে বাস করিয়াছিলেন। পর পর ছোটলাট স্যার এ্যাসলে ইডেন, স্যার চার্লস্ ইলিয়ট্ প্রভৃতির দ্বারা এই অট্টালিকার অনেক উন্নতি সাধিত হয়।

এই সুপ্রসিদ্ধ ভবনে ডিউক অব্ এডিনবারা, প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস্ রূপে রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড, ডিউক্ অব্ ক্লারেন্স, প্রভৃতির সময় সময় শুভাগমন হইয়াছে। এখানকার উদ্যান ও অট্টালিকা প্রভৃতি কলিকাতার লাটপ্রাসাদ অপেক্ষা মনোরম।

* * * *

ছোটলাটের গ্রীষ্মাবাস—স্যার এ্যাস্লে ইডেন্ যখন বাঙ্গালার ছোটলাট, সেই সময় দার্জ্জিলিংয়ের গ্রীষ্মাবাসটি খরিদ করা হয়। ইহার নাম "শ্রবারি"। ইহা বার্চহিলের উপর অবস্থিত। পূর্ব্ববর্ত্তী ছোটলাটেরা মধ্যে মধ্যে দার্জ্জিলিং যাইয়া তাঁহাদের ইচ্ছামত বর্ত্তমান "শ্রবারি" যেস্থানে অবস্থিত, তথায় একটি পুরাতন বাটীতে বাস করিতেন। ইহা পূর্ব্বে বার্ণেস্ (Mr. Barnes) নামক এক সাহেবের সম্পত্তি ছিল, তৎপরে কুচবিহারের মহারাজা খরিদ করেন। শেষোক্ত মহারাজার নাবালক অবস্থায় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর গভর্ণমেণ্ট ইহা খরিদ করেন। তৎপরে ইহার বহুল পরিবর্ত্তন করিয়া

সম্পূর্ণ নূতনভাবে গঠিত করা হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এই কার্য্য শেষ হয়। পর বৎসর গ্রীষ্মকালে এখানে প্রথম ছোটলাট আসিয়া বাস করেন। কিং (Sir C. King) দ্বারা এখানকার উদ্যান রচিত হয়।

* * * *

বর্ত্তমান লাটভবন—ইহা নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে গভর্ণরের বাসের জন্য যে সব বাটী ছিল, তাহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আদৌ শোভন ছিল না, ইহা প্রথম লর্ড ওয়েলেস্লির মনে হয়। তিনি বলিয়াছিলেন "ভারতবর্ষ প্রাসাদ হইতে রাজার ভাব লইয়া শাসিত হওয়াই উচিত, ব্যবসা ক্ষেত্রে বসিয়া সামান্য মসলিন্ বা নীলের ব্যবসায়ীর সংস্কার লইয়া নহে।" ইহা তিনি যথার্থ কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহারই ইচ্ছা এবং চেষ্টায় বর্ত্তমান লাট-প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। উক্ত ৫ই ফেব্রুয়ারি হিকি (Mr. Timothy Hickey) সাহেবের দ্বারা ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্যের জন্য স্থপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন ক্যাপ্টেন ওয়াট্ (Captain Wyatt, R. E.) ইংলণ্ডের ডার্বিসায়ার-স্থিত লর্ড স্কার্স্ডেলের (Lord Scarsdale) কেড্লেস্টন্ হল্ নামক পল্লী-ভবনের পরিকল্পনায় নির্ম্মিত হয়। লং সাহেবের লেখা হইতে জানা যায়, ইহার জন্য জমি খরিদে ৮০০০০৲ টাকা, বাটীর জন্য ১৩ লক্ষ টাকা এবং আসবাব-পত্রের জন্য অর্দ্ধলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার জমির পরিমাণ মোট ছয় একার। উপস্থিত এই প্রাসাদ-সংলগ্ন যে সুন্দর উদ্যান পরিদৃষ্ট হয় ইহা লর্ড লিটনের চেষ্টায় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণের পর সর্ব্বপ্রথম এখানে যে উৎসব হয়, তাহা সিরিঙ্গাপাটাম পতনের বাৎসরিক উৎসব, ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে সাধিত হয়। এই উপলক্ষে সাতশ তের অধিক সম্ভ্রান্ত নরনারী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঐ বৎসর ১২ই আগষ্ট গভর্ণর জেনারেল মিশর প্রত্যাগত জেনারেল বেয়ার্ড্ (Major-General Baird) ও সৈনিক কর্ম্মচারীদের বহুসংখ্যক প্রধান নরনারীদের লইয়া ভোজ দ্বারা অভিনন্দিত করেন। তৎপরে এমিন্সএর সন্ধি উপলক্ষ্যে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি লাটভবনে

এক মহাউৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এই উৎসবে প্রায় আট শত লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বিলাতের লর্ড্ ভেলেন্‌শিয়া (Lord Valentia) এই ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে দুর্গ, নদীবক্ষে জাহাজ, লাটভবন প্রভৃতি আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। এরূপ সমারোহের সহিত পূর্ব্বোক্ত উৎসব দুইটি সম্পন্ন হয় নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক এইটিকেই নবনির্ম্মিত লাটভবনের প্রথম উৎসব বলিয়াছেন।

* * * *

লাটভবনে বিবিধ বিজয়-স্মৃতি—এখানকার প্রাসাদ মধ্যে ও সংলগ্ন জমিতে বহুবিধ উল্লেখযোগ্য দ্রব্যাদির মধ্যে নানা যুদ্ধের বিজয়-স্মৃতি সকল সযত্নে রক্ষিত আছে। ব্রহ্ম, সেরিঙ্গাপাটাম, আলিওয়াল প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধজয়ে লব্ধ কতিপয় সুবৃহৎ কামান উদ্যান মধ্যস্থ পথগুলিতে সজ্জিত আছে। সিংহাসন-কক্ষে যে সিংহাসনখানি রক্ষিত আছে এবং যাহা রাজপ্রতিনিধি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা টিপু সুলতানকে পরাস্ত করিয়া আনা হয়। চন্দননগর বিজয়ের পর ফ্রান্সের রাজা-রাণীর যে জীবন-প্রমাণ প্রতিকৃতি তথা হইতে আনা হয় উহাও এই স্থানে ছিল। এই সকল ভিন্ন এখানে বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অঙ্কিত ঐতিহাসিক চিত্র আছে। এই সকল চিত্রের মধ্যে লর্ড ক্লাইব, মারকুইস্ হেষ্টিংস্, মারকুইস্ কর্ণওয়ালিস্, মারকুইস্ ওয়েলেস্‌লি, আর্ল ক্যানিং, লর্ড লরেন্স, আর্ল মেয়ো, লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক, মারকুইস্ ল্যান্সডাউন্, আর্ল অক্‌ল্যাণ্ড, মারকুইস্ রিপণ্, লর্ড এলগিন্, আর্ল মিণ্টো, ভাইকাউণ্ট্ হার্ডিং, আর্ল এলগিন্, স্যার আর্থার ওয়েলেস্‌লি, ডিউক্ অব্ ক্লারেন্স, শের আলি খাঁ, পাতিয়ালার মহারাজা, ফতে আলি, আর্ল বেকন্‌সফিল্ড্ প্রভৃতির প্রতিকৃতি আছে। এতদ্ভিন্ন রাণী ভিক্টোরিয়া যে বৎসর সিংহাসন প্রাপ্ত হন সেই বৎসরের অঙ্কিত তাঁহার একখানি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি আছে। *

* নূতন ও পুরাতন লাট-ভবনের ছবি অনেকগুলি পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধের সহিত বাহির হইয়াছে; সেই জন্য আর সেগুলি এখানে দিলাম না। সময়ে পাওয়া না যাওয়ায় কয়েকখানি ছবি যথাস্থানে পূর্ব্বে দিতে পারি নাই, তাহা এই সঙ্গে দিলাম।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বাংলা ভাষা

শ্রীবীরেশ্বর সেন

শ্রাবণ এবং ভাদ্রের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের লিখিত বাংলা ভাষা বিষয়ক দুইটী অতি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বাংলার উচ্চারণ ও বানান সম্বন্ধে নানা কথা মনে উদিত হইল। তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বাংলা ভাষার বর্ণমালা সংস্কৃত বর্ণমালা হইতে অভিন্ন। এই দুই বর্ণমালায় আকারগত প্রভেদ থাকিলেও বর্ণের নাম উভয়েই এক। কিন্তু কোন কোন বর্ণের ধ্বনি সংস্কৃতে একরূপ, বাংলায় কিছু বিভিন্ন। ভারতবর্ষে প্রচলিত আরও কয়েকটী বর্ণের ধ্বনি সংস্কৃতের মত নহে। তাহা ক্রমে প্রদর্শন করিব। অনুস্বার হইতেই আরম্ভ করা যাউক। বিদ্যানিধি মহাশয়ও ইহার বিচার করিয়াছেন।

আমরা সর্ব্বত্র অনুস্বারকে ঙ রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি। মিথিলাবাসীরাও তাহাই করিয়া থাকেন। কিন্তু পশ্চিমের লোক ন্ রূপে ইহার উচ্চারণ করেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগকে কখন ম্ রূপে কখন ন্ রূপে উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি। মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত ৺হরিভট্ট শাস্ত্রী স্পষ্টভাবে সম্‌স্কার এবং পুম্‌স্কোকিন বলিতেন। কিন্তু তিনি পুঁল্লিঙ্গও বলিতেন। বোম্বাইএর মুদ্রিত দুই একখানা পুস্তকেও রোমান অক্ষরে samskar বা তদনুরূপ অন্য বানান দেখিয়াছি ইহা মনে আছে। এ বিষয়ে প্রায় ১৫ বৎসর হইল বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাড়ীতে আমার মৌখিক আলাপও হইয়াছিল। আমি কিন্তু তাঁহাকে তখন প্রমাণ দেখাইতে পারি নাই।

এক শত বৎসর হইল বাঙ্গালীদের সহিত হিন্দুস্থানীদিগের যে বেশ মেলামেশা ছিল ইহা সুপরিজ্ঞাত। তাহারই ফলে আমরা বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সন্মান, সন্মত ইত্যাদি উচ্চারণ করিতে শুনিতাম। কিন্তু এখন সেইরূপ উচ্চারণ বঙ্গদেশে অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। যেহেতু আমরা কখনই অনুস্বারকে ন্ রূপে উচ্চারণ করি না।

অনুস্বার যে স্বরের পরে থাকে সেই স্বর অভ্যস্ত বা দ্বিরুক্ত হইয়া চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইলেই অনুস্বারের প্রায় ঠিক উচ্চারণ পাই; যথা অংশ—অঁশ, মাংস—মাঁস, হিংসা—হিঁসা।

স্পর্শবর্ণের পূর্ব্বে অনুস্বার থাকিলে সেই বর্ণ যে বর্গের সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণই বিকল্পে অনুস্বারের উচ্চারণ; যথা কিং করোমি—কিঙ্করোমি; কিংচ—কিঞ্চ, কিং তু—কিন্তু। এইরূপ উচ্চারণের রীতি বঙ্গদেশের বাহিরের। আমাদের দেশে কেবল ক বর্গের যে কোন বর্ণের পূর্ব্বে অনুস্বার থাকিলেই তাহার উচ্চারণ ঙ হয়। অন্য বর্ণের হইলে দুই চারিটা শব্দ ভিন্ন অন্য কোন স্থলে অনুস্বারের উচ্চারণ বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয় না। আমরা এবঞ্চ কিন্তু পরন্তু লিখি এবং বলি, কিন্তু কিংতেন, সত্যংব্রূয়াৎকে কিঙতেন, সত্যঙব্রূয়াৎ রূপেই উচ্চারণ করি।

অনুস্বারকে ঙ রূপে উচ্চারণ করা যখন ভুল তখন বাংলা' লেখাও ভুল। কিন্তু লিপি-সৌকর্য্যের জন্য আমরা এরূপ ভুল সহ্য দাই করিয়া থাকি। খাওয়া, যাওয়া, গোয়াল, ওয়াটার (water) কে য়ার্টার, গুয়াপোকা, কুয়া, গেরুয়া প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের য়া টা ভুল—আ হওয়াই উচিত। কিন্তু য়া লেখা অপেক্ষা আ লেখা অধিক অনায়াসসাধ্য বলিয়া আমরা এই সকল শব্দে য়া লিখি, কিন্তু উচ্চারণ কখনই আ ভিন্ন য়া করি না। এই সকল শব্দকে রোমান অক্ষরে রূপান্তরিত করিবার সময়েও ya না লিখিয়া a ই লিখিয়া থাকি। সুতরাং কেবল লিপি-সৌকর্য্যের জন্যই বাংলা, শিলং, দার্জিলিং, ইংরেজ লেখার সমর্থন করা যাইতে পারে। কেন না এই সকল শব্দ ঙ অথবা ঙ্গ দিয়া লেখা সুসাধ্য নহে। বিশেষতঃ এই সকল শব্দে ং ব্যবহার করায় যত দোষ, তাহা অপেক্ষা যাওয়া প্রভৃতি শব্দে য়া লেখার দোষ অধিক, যেহেতু আমরা সর্ব্বদাই অনুস্বারকে ঙ, রূপে উচ্চারণ করি।

লিখিবার সুবিধার জন্য অশুদ্ধ বানানের আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আসামীরা চ অক্ষরটাকে ইংরেজী saw শব্দের মত উচ্চারণ করেন এবং সাহাব লিখিতে হইলে চাহাব লেখেন। ইহার একমাত্র কারণ এই যে স অপেক্ষা চ লেখা সুসাধ্য।

'বাংলা' বানানের প্রবর্ত্তক রবীন্দ্রনাথ। ইহা তিনি আমার লিখিত একটা প্রবন্ধের উত্তরে লিখিয়াছিলেন। এখন দেখিতেছি বঙ্গভাষায় প্রধান authority বিদ্যানিধি মহাশয়ও 'বাঙ্গালা' ছাড়িয়া 'বাংলা' ধরিয়াছেন। সুতরাং এখন হইতে আমিও এ বিষয়ে তাঁহাদের অনুগামী হইব। বাঙালী সাহিত্যিক মাত্রেই এই বানান গ্রহণ করিবেন কি না বলিতে পারি না।

বিদ্যানিধি মহাশয় ঙ এবং ঙ্গ র উচ্চারণের বিষয়েও বিচার করিয়াছেন। ঙ র উচ্চারণটা বোধ হয় কিছু কঠিন বলিয়াই বর্ণ শিক্ষার সময়ে ইহাকে উঁ অ এবং উঁ আ বলে। পূর্ব্বকালে এই অক্ষরটা স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হইত না। কেবল মাহেশ্বর সূত্র ঞ ম ঙ ণ ন ম্ এ এবং তিঙন্ত প্রকরণে ইহা দেখিতে পাই। বাংলায় ইহার উচ্চারণ বহু শব্দে থাকিলেও উহাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাইত না। বর্ত্তমান কালের প্রভাবে ও প্রকাশ্যভাবে নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার বহু উদাহরণ দিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয় যে বলিয়াছেন যে 'ভাঙা' শব্দের ঙ র প্রকৃত উচ্চারণ উঁ আঁ, আমি ভয়ে ভয়ে বলিতেছি যে তাঁহার এই মতের সহিত আমি একমত নহি। "উঁ আ" অক্ষরের নায় মাত্র ধ্বনি নহে; যেমন পারসী আলেফ, জিম্, দান প্রভৃতি; গ্রীক আলফা বিটা, দিগম্ম (আমাদের অন্তঃস্থ ব) প্রভৃতি, বাংলা ইঁয় আন (ণ) আঙ্ক, আম্ব সংস্কৃত অনুস্বার বিসর্গ প্রভৃতি। তবে যে পূর্ব্বকালের বাঙালী লেখকেরা সেই নামকেই ধ্বনি বলিয়া মনে করিতেন, তাহার কারণ ভারতচন্দ্র ভিন্ন তাঁহারা সুশিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহাদের বানান আদর্শ হইতে পারে না। কাশীরাম দাসের মহাভারতে ভূরি ভূরি অশুদ্ধ প্রয়োগ ছিল। ৺গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সে সমস্ত সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করেন। ইহা তাঁহার ভূমিকা হইতেই জানা যায়; যথা—

শ্রীগৌরীশঙ্কর কহে শুন কাশীরাম।
শোধন করিতে বড় কষ্ট পাইলাম॥

'ঙ্গ' র গ অনেক স্থানে অস্পষ্ট; যেমন কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত। অনেক স্থানে ইহা মোটেই উচ্চারিত হয় না; যেমন ভাঙা, আঙুল। অনেক স্থলে ইহার উচ্চারণ ঙ, যেমন পূর্ব্ব বঙ্গে গঙঙা, মঙঙল। গকারের ক্ষীণ ধ্বনি সঙ্গ, সঙ্গী প্রভৃতি শব্দে। রাঢ়ে 'ঙ্গ' র 'গ' উচ্চারণ স্পষ্ট।

বাংলায় কথা কহিবার সময়ে সকলেই বলে 'বাঙালী'। অথচ ইংরেজীতে কথা কহিবার সময়ে উচ্চারণ হয় বেঙ্গলী'। ইহাতে কিছু আশ্চর্য্য বোধ হয়। পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিত যুবকেরা কখন কখন ইংরেজী বলিবার সময়েও বেঙালী বলিয়া থাকেন। তাহা কিন্তু শ্রুতি-মধুর বলিয়া বোধ হয় না।

ঙ্গ এবং ঙ উভয় ধ্বনিই ইংরেজী ng দিয়া প্রকাশিত হয়। কোন্ ধ্বনি কোথায় হইবে তাহা শিখিতে হয়। Sing, singer, long, longer (personal noun), bring, hang, hunger প্রভৃতি শব্দের ng=ঙ। Finger, hunger, longer (adjective), longest প্রভৃতি ng=ঙ্গ।

এ বিষয়ে বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত আমার একদিন আলাপ হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে একটু মতভেদ হইয়াছিল মনে আছে।

গঙ্গাকে অনেক বাঙ্গালী গঙঙা বলেন এই প্রসঙ্গে একটা অবান্তর কথা মনে হইল। তাহাতে অনেক পাঠক কৌতুক অনুভব করিবেন ভাবিয়া লিখিতেছি। গ্রীকে গঙ্গা প্রকাশ করিতে হইলে গগ্‌গা লিখিতে হয়। গঙ্গানদীর গ্রীক নাম গাগ্‌গেস অথবা গাগ্‌গীস্—উচ্চারণ গাঙ্গীস। ইহা ইংরেজীতে Ganges রূপে লিখিত হয়। কিন্তু ইংরেজীতে g র পরে e থাকিলে সাধারণতঃ g র উচ্চারণ গ না হইয়া জ হয়। এই জন্যই গঙ্গাকে ইংরেজীতে গেঞ্জেস বলে।

ঙ অপেক্ষাও কঠিন উচ্চারণ ঞ র। ইহাও স্বতন্ত্রভাবে কেবল মাহেশ্বর

সূত্রে এবং ব্যাকরণের অন্যান্য স্থানে আছে। অন্যত্র বোধ হয় না।৶। যখন ইহার সহিত চ বর্গের কোন বর্ণ যুক্ত হয় তখন ইহার উচ্চারণ কিছু-মাত্র আয়াসসাধ্য নহে, যেমন চঞ্চল, বাঞ্ছা ; কিন্তু যখন চ ও জ র সহিত ঞ যুক্ত হয় তখনই বোধ হয় অনেকেই তাহার উচ্চারণ দুঃসাধ্য মনে করেন। যাচ্ঞা শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ যাচ্চাঁ এবং যজ্ঞ শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ যজ্জঁ। বাঙালীরা এই দুইটী যথাক্রমে যাচ্‌ঙ্গা এবং যগ্‌গঁ এবং মহা-রাষ্ট্রীয়েরা যাচ্‌না এবং যজ্‌ন রূপে উচ্চারণ করেন। প্রাচীন কালে যে এরূপ উচ্চারণ ছিল না তাহা সন্ধির সূত্র দেখিলেই বুঝা যায়। সন্ধির নিয়মানুসরে তৎ+জ্ঞান—তজ্‌জ্ঞান। ইহাতেই বুঝা যায় জ্ঞ অক্ষরের জ উচ্চারিত হইত।

বাংলায় কতকগুলি এমন ধ্বনি আছে যাহা প্রকাশ করিবার অক্ষর নাই। ইহার প্রথম এবং প্রধান সংস্কৃত অ যাহা ইংরেজী but শব্দে আছে। বাঙালী শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই এই বিশ্বাস যে এই ধ্বনির ব্যবহার আমাদের মোটেই নাই। আমার বিবেচনায় ইহা ভুল বিশ্বাস। আমি, আমরা, আমাকে, আমাদিগকে, আমার, আমাদের এবং অন্যান্য বহু শব্দে আমরা এই ধ্বনি পাই। বাস্তবিক বলিতে গেলে আমরা প্রায়ই সংস্কৃত আ উচ্চারণ করি না। ইহার উদাহরণ না দিলে অনেকের বিশ্বাস হইবে না। 'আসানানাং সুরভিত শিলং নাভিগন্ধৈর্মৃগানাং' মেঘদূতের এই পংক্তিতে ছয়টা আ আছে। বাংলায় কয়টা শব্দে এইরূপ দীর্ঘ আ উচ্চারিত হয়? ৺বলদেব পালিত সংস্কৃত ছন্দে বাংলায় কবিতা লিখিতেন। তাঁহার কোন কবিতার এক চরণ পরীক্ষা করিলেই আমার উক্তি আরও স্পষ্ট হইবে। যেমন "মধুর অমৃত মাখা এই সে সৌম্যমূর্ত্তি" মালিনী-চ্ছন্দের এই চরণটার মাখা শব্দটা যেমন টানিয়া উচ্চারণ করিতে হয় আমরা কথা কহিবার সময়ে বা গদ্য পড়িবার সময়ে তেমন কখনই করি না।

বাংলায় যেভাবে আমরা অকারের উচ্চারণ করি তাহা আমাদের এবং আসামীদের বিশেষত্ব। এই অ ইংরেজী call শব্দের a র মত।

আমাদের যে কেবল আকারের উচ্চারণ নাই এমন নহে। আমাদের এ এবং ও প্রায়ই হ্রস্ব অথচ তাহা লিখিবার অক্ষর নাই। সংস্কৃতে হ্রস্ব-এ এবং হ্রস্ব-ও যথাক্রমে ই এবং উ রূপে লিখিত হয় ; কেন না সংস্কৃতে হ্রস্ব-এ এবং হ্রস্ব-ও নাই। তেলেগু ভাষা ভিন্ন বোধ হয় আর কোন ভাষা-তেই হ্রস্ব-এ এবং হ্রস্ব-ও স্বীকৃত হয় নাই। বঙ্গের বাহিরে উত্তর-ভারতের সর্ব্বত্র দেখিয়াছি যে লোকের হ্রস্ব-এ এবং হ্রস্ব-ও উচ্চারণ করিবার ক্ষমতাই নাই। আমাদেরও হয় ত সেইরূপ অক্ষমতা ছিল। আমরা ইংরেজী ticket শব্দে যে হ্রস্ব এ আছে সেস্থানে ই দিয়া টিকিট বলি। এখন কিন্তু আমরা বাংলা পড়িবার সময়ে অথবা বলিবার সময়ে সংস্কৃত এ এবং ও কেও হ্রস্ব রূপে উচ্চারণ করি। প্রত্যেকে নিজেই ইহার পরীক্ষা করিতে পারেন।

স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বিস্মিত বা চমকিত হইলে তাঁহাদের মুখ হইতে যে একটা interjection বাহির হয়, তাহা আমরা ওমা রূপে লিখিয়া থাকি। কিন্তু সংস্কৃতে তাহা উমা রূপে লিখিতে হয় ; কেন না এই শব্দের ওকারটা হ্রস্ব। কালিদাস কুমারসম্ভবে লিখিয়াছেন যে মেনকার কন্যা গিয়া মেনকাকে বলিলেন মা আমি তপস্যা করিব। ইহা শুনিয়া মেনকার মুখ দিয়া উমা এই বিস্ময়সূচক শব্দটা বাহির হইল। সেই জন্যই মেনকার কন্যার নাম হইল উমা।

(এই উমা intergctionটী যদি কেবল বঙ্গদেশেরই শব্দ হয়, তাহা হইলে এই অভিনব ব্যুৎপত্তি করাতে কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিয়াই বোধ হয়। কালিদাসকে বাঙ্গালী ভাবিবার আরও কারণ আছে। কিন্তু সে কথা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত।)

এত দূর যাহা বলিলাম তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, আমাদের ভাষায় যত ধ্বনি আছে, আমাদের বর্ণমালায় তাহা প্রকাশ করিবার মত অক্ষর নাই। সংস্কৃত এবং হিন্দী ভিন্ন বোধ হয় কোন ভাষাতেই ধ্বনির সমসংখ্যক অক্ষর নাই। প্রত্যেক ধ্বনির জন্য এক এক অক্ষর করিতে হইলে আমাদের বর্ণমালা চীনের বর্ণমালার সমান না হউক, উহাতে আরও শতাবধি অক্ষর বাড়াইতে হয়। কিন্তু সেরূপ করা বোধ হয় কাহারই ইচ্ছা নহে। ইংরেজীতে যখন ২৬টা অক্ষর দিয়াই কাজ চলে, তখন তাহার দ্বিগুণ অক্ষর দিয়া আমাদের কাজ চলিবে না কেন? আমাদেরও এক একটা অক্ষর দিয়া একাধিক ধ্বনি প্রকাশ করাইতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের যে সকল অক্ষর আছে তাহা অকারণে বর্জ্জন করা উচিত নহে। ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন "প্রাণ জ্বোল্‌তে হোলেই বোল্‌তে হয় পোড়া দেশের লোকের আচার দেখে চোল্‌তে পথে করি ভয়।" এখনকার লেখকেরা লিখিবেন জ্বল্‌তে, বল্‌তে, হলে, চল্‌তে। "বলে, কয়ে চলে গেল" এই কয়েকটা কথা বিদ্যানিধি মহাশয়ই উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল শব্দে ও-কার দিয়া লেখাই উচিত। কিন্তু নব্য লেখকেরা তাহা করিবেন না ; অথচ তাঁহারা ভালো, ষোলো, বারো, তেরো প্রভৃতিতে ওকার দিবেনই দিবেন ; যদিও ওকার বর্জ্জন করিলে কোনরূপ গোলমাল হইবার সম্ভাবনা নাই।

অকারের পর ই বর্ণ অথবা উ বর্ণ থাকিলে, এমন কি ইহাদের মধ্যে ব্যবধান থাকিলেও, বাংলা ভাষায় প্রকৃতি অনুসারে অ কার ও রূপে উচ্চারিত হয়। হই, হউক, কবি, ছবি, কচু, রঘু প্রভৃতি শব্দের অকার স্থানে ওকার লিখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বলিয়া কহিয়া চলিয়া স্থলে বলে কয়ে চলে লিখিলে যে বোলে, কোয়ে, চোলে উচ্চারণ করিতে হইবে বাংলার প্রকৃতি সেরূপ নহে। পূর্ব্বকালে এইরূপ স্থলে শব্দের শেষে য-ফলা যোগ করা হইত। কিন্তু এরূপ করার প্রধান আপত্তি এই যে তাহা হইলে পূর্ব্ব স্বর গুরু হইয়া যায়। অন্য আপত্তিও হইতে পারে। আমরা য-ফলা ও র-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনকে অভ্যস্তরূপে উচ্চারণ করি যেমন সখ্য, বক্র। হিন্দুস্থানের কোন কোন স্থলে কিন্তু এরূপ উচ্চারণ হয় ; যেমন মহারাজ গাইকোআড়ের এক পুত্রের নাম ধারিয়া সীল অর্থাৎ ধৈর্য্যশীল।

নবীন লেখকদের বানানের আর একটা উদাহরণ দিব। তাঁহারা হইতেছে স্থলে হচ্ছে লেখেন। তাঁহারা হয় ত ভাবেন যে ইহা কলিকাতা অঞ্চলের প্রাদেশিক উচ্চারণ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। হইতেছের

রাঢ়ী উচ্চারণ হোচ্ছে কলিকাতার প্রাচীন এবং পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান উচ্চারণ হোতেছে, নদীয়া জেলার উত্তরভাগের উচ্চারণ হচ্চে (উচ্চারণ haus say)। সুতরাং হচ্ছে কোন স্থলে উচ্চারণই নহে, যদিও নদীয়ার উচ্চারণের কাছাকাছি বটে।

আর একটা অক্ষরের উচ্চারণ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া উচ্চারণ এবং বানানের পালা শেষ করিব। ঋকারে যে রকারের ধ্বনি আছে তাহা অতি ক্ষীণ। তাহার সহিত যে স্বর আছে আমরা তাহা ই রূপে উচ্চারণ করি। কিন্তু উড়িষ্যায় তাহার উচ্চারণ প্রায় উ। উড়িয়ারা কৃষ্ণকে প্রায় ক্রুষ্ণ বলেন। এই উচ্চারণ গ্রীক, জর্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ ভাষায় আছে ; কিন্তু ইংরেজী, সংস্কৃত, বাংলা এবং লাটিনে নাই। ঋষি, পৈতৃক, কৃমি শব্দ যথাক্রমে রিষি, পৈত্রিক, ক্রিমি রূপে লিখিলেও শুদ্ধ হয়। ইহাতে বোধ হয় যে ই যুক্ত রকার যে ঋকারের উচ্চারণ তাহা প্রাচীন কাল হইতেই স্বীকৃত হইয়াছে। সে যাহাই হউক, কি মহারাষ্ট্রে, কি মিথিলায়, কি বঙ্গদেশে ঋকার ব্যঞ্জন বর্ণে যুক্ত হইলে কোন স্থানেই তাহা শুদ্ধরূপে উচ্চারিত হয় না, ইহা দেখিয়াছি। সদৃশ, তাদৃশ, জতুগৃহ, সরীসৃপ, মসৃণ প্রভৃতি শব্দ সদ্রিশ, তাদ্রিশ, জতুগ্রিহ, সরিস্রিপ, মস্রিণরূপে উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছি। এই উচ্চারণ যে অশুদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না ইহাতে পূর্ব্বস্বর গুরু হয়। মসৃণ শব্দের তিনটা স্বরই লঘু ; সুতরাং ইহা মালিনী ছন্দে শ্লোকের প্রথমে বসিতে পারে। কিন্তু ইহা মস্রিণরূপে উচ্চারণ করিলে, ইহার প্রথম স্বর গুরু হইয়া যায়। তাহা হইলে ছন্দঃপতন হইবে।

এখন বিদ্যানিধি মহাশয়ের আরও দুই চারিটা মন্তব্যকে কেন্দ্র করিয়া আমি আরও কয়েকটি কথা বলিব। ঠাকুর্দ্দা বানান সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন দ যখন দ্বিরুক্ত হইয়াছে তখন রেফ হইবে না। এই মন্তব্যের সূত্রটা বুঝিলাম না। ঠাকুদ্দা অথবা ঠাকুর দা লিখিলে যে ভাল হইত সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু দ অভ্যস্ত হইলে উপরে রেফ হইতে পারে না কেন? রেফের নিম্ন বর্ণ বিকল্পে অভ্যস্ত বা দ্বিরুক্ত হয় ইহাই সূত্র। প্রায় সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীই তর্ক মূর্খ গর্গ দুর্ঘট, কর্ত্তা, সমর্থ, দুর্দ্দিন, নির্দ্ধন, অর্পণ, বর্ব্বর শব্দে রেফের নিম্নবর্ণ দ্বিরুক্ত করিয়া উচ্চারণ করেন। কিন্তু কতকগুলিকে অভ্যস্তভাবে লেখেন ; যেহেতু সেগুলি অভ্যস্তভাবে লেখা অনায়াসসাধ্য। ত্ত, দ্দ, স্ব, লিখিতে আয়াস মাত্র নাই। কিন্তু ক্ক, কখ, গগ, ইত্যাদি লেখা মোটেই সুকর নহে।

গ্রাম্ভারী বোধ হয় পৃথক্ করিয়া গ্রাম ভারী লিখিলেই ভাল হইত। গ্রামের মধ্যে ভারী গ্রামবৃদ্ধ। আজে বাজের 'আজে', শব্দের ছায়া মাত্র। এঁজি পেঁজির তুল্য। বিশেষণের ছায়া এবং দ্ব্যক্ষর ও স্বরাদি বলিয়া বোধ হয় ছায়াটা পূর্ব্বগামী হইয়াছে। বিশেষ্যের ছায়া সর্ব্বদাই পশ্চিমগামী। ছায়া দিয়া কথা উত্তর-ভারতের সকল ভাষারই বিশেষত্ব। বাংলা, কাপড় টাপড়, হিন্দী কাপড়া উপড়া।

বিদ্যানিধি মহাশয় নারী ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। এখন নারীরা যখন পুরুষের মত চুল কাটিয়া পুরুষোচিত সমস্ত কার্য্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতেছেন তখন, তাঁহাদের ভাষাটাই বা কেন অন্তঃপুরগত হইয়া থাকিবে? এই জন্যই আমরা নারীভাষায় সাত্তিককের শব্দটাকে ঈষৎ রূপান্তরিত 'সত্যকার' ভাবে সাহিত্য ক্ষেত্রে কুড়ি বৎসর হইতে দেখিতে পাইতেছি। নতুবা 'প্রকৃত' এবং 'বাস্তবিক' এই দুইটা শব্দ থাকিতে কিম্ভুত কিমাকার সত্যকার শব্দের কি প্রয়োজন ছিল? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বহু সাবধান লেখকও এই সত্যকারের হাত হইতে নির্মুক্ত নহেন। কালে হয় ত পুরুষেরা পরস্পরের প্রতি ওলো, হাঁলা প্রভৃতিও প্রয়োগ করিবেন। আবার আজকাল নাট্যশালা যখন আমাদের একটা তীর্থস্থান হইয়া উঠিয়াছে, তখন হয় ত অচিরে আমাদের চলিত ভাষায় নাটকীয় আযুত্ত, মারীষ, ভাব প্রভৃতি শব্দও প্রবেশ করিবে।

বিদ্যানিধি মহাশয় একটী সুন্দর সূত্রের আভাস দিয়াছেন। সূত্রটি এই যে জানা শব্দের উচ্চারণ বশে নূতন শব্দের উচ্চারণ নিয়মিত হয়। এই জন্য যে আমরা হস্পিটালকে হাঁসপাতাল বলি তাহাতে সন্দেহ নাই। হাঁস ও পাতাল উভয়ই আমাদের সুপরিজ্ঞাত। কিন্তু তাহা বলিয়া যে হায় হায় শব্দের উচ্চারণ বশে হায়রান হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। হায় হায় সর্ব্বত্রই আছে কিন্তু অতি অল্প স্থানের লোকেই হায়রান বলে।

ভিতর হিন্দী ভীতর শব্দেরই বাংলা রূপ। ভেতর আবার ভিতরের অপভ্রংশ। ন্যূনাধিক শত বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত পুস্তকে ইহার বানান ভীতর দেখিয়াছি। ইহার রূপ যাহাই হউক না কেন ইহা ব্যবহার না করিয়া মধ্য শব্দ ব্যবহার করাই ভাল নহে কি? কেবল একটী মাত্র প্রয়োগ দেখিয়াছি যেখানে ভিতরের পরিবর্ত্তে মধ্য বসিতে পারেনা। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ভিতরে আসুন।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের আর দুইটা সূত্র এই। (১) ইকারের পর আ থাকিলে মৌখিক ভাষায় আ স্থানে এ হয়। যেমন ফিতা, ফিতে। (২) উকারের পর আ থাকিলে মৌখিক ভাষায় আ স্থানে ও হয়। যেমন খুড়া খুড়ো। প্রথমটী সার্ব্বভৌম কিন্তু দ্বিতীয়টী নহে। সেটী এইরূপ হইবে—উকারের পর আ থাকিলে আ স্থানে পশ্চিম বঙ্গে ও হয় ; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর প্রভৃতি প্রদেশে এ হয়। যেমন বুড়া, বুড়ো, বুড়ে ; জুতা, জুতো, জুতে, খুড়া, খুড়ো, খুড়ে ; গুলা, গুলো, গুলে, খুল্‌না, খুল্‌নো খুলনে।

বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন প্রদীপ দপ করিয়া নিভিয়া যায় বলা ভুল। আমি কিন্তু দপ্‌ করিয়া নিভিয়া যাওয়ার কথা বহু শুনিয়াছি এবং নিজেও বলিয়াছি। বাতাস লাগিলে প্রদীপ দপ্‌ দপ্‌ করে।

এখানে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। নির্ব্বাণ শব্দ হইতেই নিভিয়া হইয়াছে। সকলে ভ দিয়া বানান করেন দেখিতে পাই। আমি কিন্তু স্পষ্ট ভ উচ্চারণ শুনি নাই। অন্যের অভিজ্ঞতা কি তাহা জানি না।

নৌকা, বোঝাই হউক না হউক, বাতাসে টলমল করে ; আর জল খুব স্বচ্ছ হইলেই টল টল করে। ইহাই আমার জানা ছিল। ইহাদের মূল বাহির করিবার চেষ্টা বৃথা বলিয়া বোধ হয়।

চন্দ্রবিন্দু বহুল প্রচার আছে ফ্রান্সে, চীনে, আসামের শিবসাগর জেলায় এবং রাঢ়ে। অন্য পক্ষে ইংরেজদের এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের পক্ষে ইহার

উচ্চারণ আয়ত্ত করা এক প্রকার অসাধ্য বলিলেই হয়। হিন্দুস্থানীদের অক্ষমতা নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহারা পঁচিশকে পচীস বলেন। অথচ পাঁচ পঁয়তীস বলেন। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ঘোঁড়া, শঁশা বলে কিন্তু পাঁচশ বলে না। আমরা শাঁপ কাঁচ বলি কেন? যাঁহারা চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ করিতে পারেন না অথচ উচ্চারণটা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা দুই তিন দিন নিম্নলিখিত exerciseটী অভ্যাস করিলেই সফলকাম হইবেন। চাচা, পঁছা চটা পঁছিস না আঁচাছা চটা পঁছিস।

বিসর্গের উচ্চারণটা কেবল সংস্কৃতের বিশেষত্ব, আর কোন ভাষায় এই দুরুচ্চার্য্য ধ্বনি নাই। ইহা কিছু পরিবর্ত্তিত ভাবে ক খ প ফ শ ষ স এই সাতবর্ণের পূর্ব্বে থাকিলে উচ্চারিত হয়। বাংলায় অন্য কোন স্থলে বিসর্গ লেখার ব্যবহার ভুল। স্রোত মন প্রভৃতি শব্দে এখন আমরা বিসর্গ যোগ করে না। ক্রমশঃ, বস্তুতঃ স্বভাবতঃ প্রভৃতিতে বিসর্গ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু বাঙ্গালীরা যে সংস্কৃত পড়িবার সময়েও বিসর্গের উচ্চারণ করিতে শেখেন না ইহা বড়ই শোচনীয়।

লেখাটা দীর্ঘ হইয়া গেল। আজ এই পর্য্যন্ত।

নক্ষত্রের বর্ণ-বৈচিত্র্য

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এল,

নির্ম্মল অন্ধকার রজনীতে আকাশের দিকে তাকাইলে বহু সংখ্যক নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। নক্ষত্র সকল আকাশের সুনীল চন্দ্রাতপে উজ্জ্বল হীরার ফুলের ন্যায় শোভা পায়। আকাশের কোটি কোটি নক্ষত্র আমাদের সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ এবং সূর্য্যের ন্যায় উহাদের নিজের আলোক আছে। নক্ষত্র সকল দেখিতে সাধারণতঃ উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ। বাস্তবিক আকাশে বহু বর্ণের নক্ষত্র বর্ত্তমান আছে। কিন্তু উহাদের বর্ণ-বৈচিত্র্য খালি চক্ষে দৃষ্টিগোচর হয় না।

কতকগুলি নক্ষত্রের আলোকের রঙ্ আমরা খালি চক্ষেই দেখিতে পাই। কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর আর্দ্রা (Betelgeuse) বৃষ রাশির রোহিণী (Aldeberan), এবং তুলারাশির স্বাতি (Arcturetes) এই কয়টি নক্ষত্র দেখিতে লাল। এণ্টারিস্ (Anteres) নক্ষত্রটিও লাল এবং দেখিতে অতিশয় রমণীয়।

নীল পীত লোহিত হরিৎ প্রভৃতি শতাধিক রঙের নক্ষত্র আকাশে দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার নক্ষত্রের রঙ্ও পরিবর্ত্তনশীল। টলেমী (Ptolemy) তাঁহার নক্ষত্রের তালিকায় অত্যুজ্জ্বল লাল রঙের কয়েকটি নক্ষত্রের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তালিকায় পোলাকস্ (Pollux) এবং লুব্ধক (Sirius) নামক দুইটি নক্ষত্র স্থান পাইয়াছে। বর্ত্তমানে 'পোলাক্স্' নক্ষত্রের রঙ্ হরিদ্রাভ এবং 'সিরিয়াস' নীলের আভাযুক্ত, শুভ্র। টলেমীর ন্যায় আরও কয়েক জন বিখ্যাত প্রাচীন লেখক এই কয়টী নক্ষত্রকে "লাল তারা" বলিয়াছেন। 'হোমার' 'সেনেকা'ও সিসিরো 'সিরিয়াস' নক্ষত্রটীকে লাল বলিয়াছেন। ইহা হইতে ধারণা হয় যে পূর্ব্বে সিরিয়াসের রঙ্ লাল ছিল। আরও কয়েকটী নক্ষত্রেরও এইরূপ বর্ণের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এল্‌গল্ (Algol) নামক একটি নক্ষত্রকে পারস্য দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ আল্‌সুফী (Al Sufi) লাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু উহা দেখিতে এখন শ্বেত বর্ণ।

আকাশে নানা বর্ণের বহু সংখ্যক নক্ষত্র আছে। কিন্তু উহাদের বর্ণ-বৈচিত্র্য দূরবীক্ষণ ব্যতীত প্রত্যক্ষ করা যায় না। বড় নক্ষত্রদিগের মধ্যে অভিজিৎ (Vega) এবং চিত্রা নীলের আভাযুক্ত শুভ্র। ব্রহ্মহৃদয় (Capella), প্রশ্বা (Procyon) ও স্বাতি আমাদের সূর্য্যের ন্যায় একটু পীতবর্ণ। উহাদিগকে খালি চক্ষেই দেখিতে পাওয়া যায়। নীল, পীত, হরিৎ, লাল, বেগুনে প্রভৃতি শতাধিক বর্ণের বহু সহস্র নক্ষত্র আকাশে শোভা পাইতেছে। কিন্তু আমরা সেই সকল নক্ষত্রের নানা বর্ণের আলোক দেখিতে পাই না। প্রতি রাত্রে যদি ঐ সকল নানা বর্ণের নক্ষত্রের রঙ্গীন আলোক আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত, তবে আকাশে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আমরা প্রত্যক্ষ করিতাম।

আকাশে কতকগুলি যুগল (double star) নক্ষত্র আছে। এই সকল যুগল নক্ষত্রের দুইটী তারকা পরস্পর হইতে কোটি কোটি মাইল ব্যবধানে থাকিয়া উভয়ের মধ্যবর্ত্তী একটী নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে। আকাশে এইরূপ প্রায় বার হাজার যুগল নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক একটী নক্ষত্র সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ। কিন্তু নক্ষত্র সকল অচিন্তনীয় দূরে অবস্থিত বলিয়া উহাদিগকে দূরবীক্ষণ ব্যতীত দেখিতে পাওয়া যায় না। যুগল নক্ষত্রের সূর্য্যগুলি মাধ্যাকর্ষণের অধীন হইয়া বৃত্তাভাস-কক্ষে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

যুগল নক্ষত্রের আলোক-বৈচিত্র্য অতিশয় মনোরম। উহাদের বর্ণ-মাধুর্য্য অতীব চিত্তাকর্ষক। কতকগুলি যুগল নক্ষত্রের দুইটী তারকার রঙ্ এক প্রকার। যেমন দুইটীই সাদা, দুইটীই নীল, অথবা দুইটীই সবুজ। কতগুলি যুগল নক্ষত্র আছে, উহাদের দুইটী তারকার আলোক দুই বিভিন্ন রঙের। যেমন একটী সবুজ, অপরটী লাল, একটী নীল, অপরটী হল্‌দে ইত্যাদি। আর কতকগুলি যুগল নক্ষত্রের তারা দুইটীর বর্ণের পার্থক্য তত বেশী নয়, যেমন একটী সোনালী, আর একটী হল্‌দে ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত বর্ণের নক্ষত্র ব্যতীত ধূসর, পাটল, বাদামী প্রভৃতি বহু বর্ণের বহু সংখ্যক নক্ষত্র আকাশে শোভা পাইতেছে। শেষোক্ত নক্ষত্রগুলির আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও উহারা নগণ্য নহে। এই ক্ষুদ্র নক্ষত্রগুলির সমবেত আয়তন সৌরজগতের সকল গ্রহের আয়তনের সমষ্টি অপেক্ষা হাজার গুণ বৃহৎ।

কতকগুলি নক্ষত্র আছে উহাদিগকে ঠিক যুগল নক্ষত্র বলা যায় না। উহাদের তিন, চার অথবা ততোধিক তারকা মাধ্যাকর্ষণে ধৃত হইয়া নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রের চারিদিকে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই শ্রেণীর তারকাগুলির প্রত্যেকের আলোকের রঙ্ বিভিন্ন। 15 Monocerotis নামক একটী নক্ষত্রপুঞ্জের তিনটী তারকার একটীর আলোক সবুজ, একটী বর্ণ নীল এবং একটী আলোক কমলা রঙ এর। 12 Lyncis নামক নক্ষত্রমণ্ডলীর

তিনটী তারকার একটীর সবুজ একটীর সাদা ও তৃতীয়টীর নীল আলোক। এইরূপ অনেক নক্ষত্র আকাশে অবস্থিত। কতকগুলি যুগল নক্ষত্রের দুইটী তারকা আবার যুগল। ইহাদিগকে 'যুগলে-যুগল' (double double star) কহে। এই শ্রেণীর নক্ষত্রের চারিটী তারকারই আলোক বিভিন্ন রকম। এই প্রকার নক্ষত্রের রাজ্য আকাশে কি মনোহর দৃশ্য বিকাশ পায়।

আকাশে বিভিন্ন বর্ণের সহস্র সহস্র নক্ষত্র বিরাজিত থাকিয়া নানা বর্ণের আলোক বিতরণ করিতেছে। দূরবীক্ষণ ব্যতীত আমরা সেই সকল নক্ষত্রের অত্যাশ্চর্য্য বৈচিত্র্যপূর্ণ আলোকমালা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। আমাদের সূর্য্য শুভ্র আলোক প্রদান করে। প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে যখন সূর্য্য লোহিত কিরণমালায় গগনমণ্ডল ও পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে তখন প্রকৃতি অতি রমণীয় মাধুর্য্য ধারণ করে। প্রভাত ও সন্ধ্যাকালীন নৈসর্গিক শোভা বর্ণনা করিয়া কত কবি ধন্য হইয়াছেন; কত চিত্রকর সেই বর্ণ মাধুর্য্য অঙ্কিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু সুদূর নক্ষত্র রাজ্যের বর্ণ-বৈচিত্র্যের তুলনায় পার্থিব শোভা অতি অকিঞ্চিৎকর।

কোন যুগল তারার রাজ্যে একদিন একটী সূর্য্য লাল কিরণ দেয়, পরদিন হয় ত আর একটী সূর্য্য নীল কিরণ দেয়। কোন রাজ্যে একদিন আকাশে সবুজ সূর্য্য দেখা দেয়; তার পর আবার পীত সূর্য্য উদিত হয়। কখনও এক সময়েই আকাশে দুই বা ততোধিক সূর্য্য উদিত হইয়া দুই বা বহু প্রকার বিভিন্ন অথবা অদ্ভুত মিশ্র আলোক প্রদান করে।

যদি এই সকল বিচিত্র বর্ণের সূর্য্যজগতে আমাদের পৃথিবীর ন্যায় জনপ্রাণী-পূর্ণ গ্রহ অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল গ্রহের অধিবাসীরা প্রতি দিন নয়নের তৃপ্তিকর কত, আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করে। ঐ সকল গ্রহের বৃক্ষলতাদি নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। সেই সকল রাজ্যের অত্যাশ্চর্য্য মাধুর্য্য কল্পনা করিতেও আমরা অসমর্থ। সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত সার উইলিয়ম হার্শল নক্ষত্র রাজ্যের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দূরবীক্ষণ সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

Imagination fails to conceive the charming contrast and graceful vicissitudes of red and green day alternating with white light or with darkness in the planatory system belonging to these suns."

প্রাচীন মগধের ভাবসমৃদ্ধি

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন এম-এ, বি-এল

খৃঃপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে বিশেষতঃ মগধরাজ্যে ধর্ম্ম ও দর্শন-জগতে এক অভিনব যুগ উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রে এই যুগের নানা দার্শনিক মতবাদ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আচারাদির বিশদ বিবরণ জানা যায়। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কোন কালের ইতিহাসে ভারতের এই যুগের চিন্তাসমৃদ্ধির অনুরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। মহাবীর ও বুদ্ধ এই যুগের লোক ছিলেন।

বুদ্ধ তাঁহার সমসাময়িক দার্শনিক মতবাদকে বাষট্টি শাখায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। পালি দীঘ নিকায়ের "ব্রহ্মজাল সুত্তে" বুদ্ধের এ বিষয়ে যে বর্ণনা আছে তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

(১) "সস্সতবাদ"—চার প্রকার ভেদে ইঁহাদের মত ছিল যে আত্মা ও জগৎ উভয়ই শাশ্বত;

(২) "একচ্চ—সস্সতিকবাদ"—চার প্রকার ভেদে ইঁহারা বলিতেন যে ব্রহ্মা শাশ্বত কিন্তু আত্মা নহে, বা কোন আত্মা শাশ্বত কোন আত্মা নহে, বা আত্মা শাশ্বত কিন্তু শরীর নহে;

(৩) "অন্তানন্তিকবাদ"—চার প্রকার ভেদে ইঁহারা বলিতেন জগৎ সান্ত কি অনন্ত;

(৪) "অমরাবিক্‌খেপিকবাদ"—চার প্রকার ভেদে ইঁহারা সব প্রশ্নের দ্ব্যর্থবোধক ও বাঁকা উত্তর দিতেন। "অমর" মাগুর মাছের মত এক রকম পিছল মাছের নাম। বুদ্ধঘোষ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন যে ইহাদের কথায় ইহাদের অর্থ বুঝা যাইত না, অর্থাৎ ইহাদের ধরা যাইত না বলিয়া বুদ্ধ ইহাদের এই নাম দিয়াছিলেন।

(৫) "অধিচ্চসমুপ্পন্নিকবাদ"—দুই প্রকারভেদে ইঁহারা বলিতেন আত্মা ও জগৎ অকারণ উদ্ভূত;

(৬) "উদ্ধমাঘাতনিকবাদ"—বত্রিশ প্রকারভেদে ইঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার সচেতন বা অচেতনতা, নশ্বরতা বা অনশ্বরতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতেন;

(৭) "উচ্ছেদবাদ"—সাত প্রকারভেদে ইঁহারা বলিতেন মৃত্যুর পর আত্মারও বিনাশ হয়, এবং আত্মার স্বরূপ দেহ বা মন বা আকাশ ইত্যাদি।

(৮) "দিট্‌ঠধম্মনিব্বানবাদ"—পাঁচ প্রকারভেদে ইঁহারা বলিতেন এই জীবনেই পূর্ণমোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব।

এই আটটি প্রধান শাখার বিভিন্ন প্রকারভেদগুলির মোট সংখ্যা বাষট্টি।

মহাবীর তাঁহার সমসাময়িক মতবাদগুলিকে প্রধানতঃ চারটি শাখায় বিভক্ত করেন ও ইহার উপশাখাগুলির মোট সংখ্যা তিন শত তেষট্টি। জৈনশাস্ত্রের বহু স্থানে এই চারটি প্রধান শাখার উল্লেখ আছে। হরিভদ্র রচিত "ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়" গ্রন্থের গুণরত্নপ্রণীত "তর্করহস্যদীপিকা" নামক টীকায় ইহার যে বিশদ ব্যাখ্যা আছে তাহার সংক্ষিপ্তসার এইরূপ—

(১) "ক্রিয়াবাদ"—একশত আশি উপশাখায় বিভক্ত। ক্রিয়া অর্থ সকল কার্য্যের মূল কারণ; কেহ বলিত এই কারণ ঈশ্বর, কেহ বলিত আত্মা, কেহ কাল, কেহ নিয়তি, কেহ স্বভাব। কালবাদীরা বলিতেন বৃক্ষলতার ফলফুল, ষড়ঋতুর বিবর্ত্তন, মানুষের বাল্য-কৈশোর-যৌবন-বার্দ্ধক্য, সকলই যথাসময় ব্যতীত হয় না। অগ্নির উপর স্থালী বসাইলেই মুদ্গপক্তি হয় না, এই সামান্য ব্যাপারটিও যথাকালসাপেক্ষ। "কালঃ পচতি ভূতানি, কালঃ সংহরতে প্রজাঃ, কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি"; অতএব কালই সকল কার্য্যের কারণ।

নিয়তিবাদীরা বলিতেন যে যে কার্য্যের যাহা কারণ, তাহা সব সময়েই সেই কার্য্যের কারণ ; যে কারণের যাহা কার্য্য তাহা সব সময়েই সেই কারণের কার্য্য ; ইহাই কার্য্যকারণের নিয়তরূপ। অতএব নিয়তিই মূল কারণ "অন্যথা কার্য্যকারণব্যবস্থা (Law of Cause and Effect) চ ন প্রতিনিয়তরূপ ব্যবস্থা (Law of Uniformity of Nature) চ ন ভবেৎ নিয়ামকাভাবাৎ", তাহা না হইলে জগতে কোন নিয়মতন্ত্র থাকিত না।

স্বভাববাদীরা বলিতেন যে সকলই স্বাভাবিকভাবে হয় ; মৃত্তিকা হইতে ঘটই হয়, পট হয় না ; সূত্র হইতে পটই হয়, ঘট হয় না। কণ্টকের তৈক্ষ্ণ্য, মৃগপক্ষীর বিচিত্রভাব কে করে ? বদরীর কণ্টক তীক্ষ্ণ, কোনটি বা ঋজু কোনটি বা কুঞ্চিত, তাহার ফলগুলি বর্ত্তুল, এসব কে করিল ? "স্বভাবতঃ সর্ব্বমিদং প্রবৃত্তং।" "ন কামচারোঽস্তি", যথেচ্ছ খেয়ালমত কিছুই হয় না, সবেরই ধরাবাঁধা স্বাভাবিক নিয়ম আছে। স্থালী, ইন্ধন প্রভৃতির সহযোগে মুদ্গপক্তি হয় বটে, কিন্তু কঙ্কটুক মুদ্গ তো হাজার জ্বাল দিলেও কোনও কালে সিদ্ধ হয় না ; কারণ স্বভাবতঃই ইহা অপচ্য। অতএব স্বভাবই মূল কারণ।

(২) "অক্রিয়াবাদ"—চুরাশি উপশাখায় বিভক্ত। ইঁহারা বলিতেন ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি কিছুই নাই। ফল ও লক্ষণ দেখিয়া কার্য্যের কারণ অনুমান করা যায়। এমন কোনও ফল বা লক্ষণ দেখা যায় না যাহা হইতে ঈশ্বর বা আত্মা প্রভৃতির অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। কার্য্যকারণের প্রতিনিয়তরূপব্যবস্থাও কিছু নাই, কারণ শালুকের (এক প্রকার কুমুদ) জন্ম শালুক হইতেও হয় গোময় হইতেও হয়, অগ্নির জন্ম অগ্নি হইতেও হয় অরণি হইতেও হয়, ধূমের জন্ম ধূম হইতেও হয় অগ্নি-ইন্ধনের সংযোগ হইতেও হয়, কন্দলীর (একপ্রকার বর্ষাকালের সাদা ফুল) জন্ম কন্দ হইতেও হয় বীজ হইতেও হয়, বটবৃক্ষের জন্ম বীজ হইতেও হয় বট-শাখা হইতেও হয়, ইত্যাদি। অতএব কার্য্যকারণের বহু রূপ, "অতর্কোপস্থিতমেব সর্ব্বম্" সকলই পূর্ব্বে স্থিরীকৃত না হইয়া দৈবাৎ (যদৃচ্ছাতঃ) জন্মে, কাকের গায়ে তালের আঘাত লাগার মত সকলই "ন বুদ্ধিপূর্ব্বোঽস্তি" বিনা বিচারে হঠাৎ (accidentally) হয়। অতএব মূল-কারণ কিছুই নাই।

(৩) "অজ্ঞানবাদ"—সাতষট্টি উপশাখায় বিভক্ত। ইঁহারা বলিতেন যে জ্ঞানের কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। যেখানেই জ্ঞান সেখানেই পরস্পর-বিরোধী মতের দ্বন্দ্ব—ইহাতে চিত্তকলুষ ও ভববন্ধন বাড়িয়াই চলে। অ-জ্ঞানে অহঙ্কার বৃদ্ধি হয় না, অন্যের প্রতি ক্রুদ্ধভাব হয় না, অতএব ভববন্ধনের সম্ভাবনা কমে। জ্ঞান হইতে প্রচেষ্টা হয়, প্রচেষ্টা হইতে কর্ম্ম হয়, এবং কর্ম্ম হইতে বন্ধন হয়। কিন্তু প্রচেষ্টাবিহীন যে কেবলমাত্র শারীর কর্ম্ম তাহাতে ঘোরতর ও দুঃখময় ফলোদয় হয় না। অতি শুষ্ক ও ধবল গৃহগাত্র হইতে বায়ুচালিত ধূলির ন্যায় শারীর-কর্ম্ম-ফল সহজেই বিদূরিত হয়। এই প্রচেষ্টাবিহীনতা অজ্ঞান হইতে জন্মে। ধরিয়া লইলাম জ্ঞানের প্রয়োজন আছে ; কিন্তু যথার্থ জ্ঞান কি কেমন করিয়া জানিব ? ইহা জানা অসম্ভব ; কারণ জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে সব পণ্ডিতদের ভিন্ন মত। ইহাদের মধ্যে কে ঠিক বলা যায় না। ঋষি বা জিন-বুদ্ধদের শিষ্যেরা বলিতে পারেন তাঁহাদের গুরু সম্যক্‌জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাই যে করিয়াছিলেন অন্যে করে নাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কি ? ইঁহাদের শাস্ত্র যে ঠিক তাহারই বা প্রমাণ কি ? শাস্ত্রে যে ঋষি-জিন-বুদ্ধের বচন ঠিক ঠিক লেখা হইয়াছে, শঠেরা তাহা প্রচার করে নাই, তাহার প্রমাণ কি ? প্রমাণ ছাড়া কিছুই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। অতএব জ্ঞান কি জানা যায় না, জানিবার প্রয়োজনও নাই ; কারণ জ্ঞানেতে প্রচেষ্টা, প্রচেষ্টায় বন্ধন আসিবে, "জ্ঞাতস্য অভিনিবেশ হেতুতয়া পরলোকপ্রতিপন্থিত্বাৎ"। কাজেই অ-জ্ঞানই মোক্ষের পথ।

(৪) "বিনয়বাদ"—বত্রিশ উপশাখায় বিভক্ত। ইঁহারা বলিতেন যে কায়মনোবাক্যে দেবতা, গুরুজন, মাতাপিতা, সাধুসন্ন্যাসী প্রভৃতির সেবাই মোক্ষলাভের পথ। শাস্ত্র বা আচার ইঁহারা মানিতেন না।

এই শ্রেণীবিভাগের অন্তর্গত কয়েকটি মতবাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিব।

আজীবিকবাদ। আজীবিকরা বলিতেন সুখ, দুঃখ, ভোগ, মুক্তি প্রভৃতি মানুষের নিজের উপর নির্ভর করে না, ভাগ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বল, বীর্য্য, পুরুষকার, কর্ম্ম, পরাক্রম প্রভৃতি কিছুই নাই ; শত-শত জন্মের পর জীব স্ব স্ব ভাগ্যানুযায়ী মুক্তিলাভ করে। জৈনদের "উপাসক-দশা" নামক শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মহাবীর একবার সদ্দালপুত্র নামক আজীবিকবাদী একজন কুম্ভকারের বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন সে তাহার মাটির ঘট প্রভৃতি রৌদ্রে শুকাইতে দিতেছে। মহাবীর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন মাটির ঘট প্রভৃতি কিরূপে তৈয়ারী হয়। সদ্দালপুত্র বলিল প্রথমে মাটি লইতে হয়, পরে জল দিয়া ছানিতে হয়, তার পর তাহাতে গোবর ও ছাই ভালরূপে মিশাইতে হয় ও শেষে চাকার উপর বসাইয়া উহা হইতে অনেক ঘটবাটি বানান হয়। মহাবীর জিজ্ঞাসা করিলেন এইসব কাজ করিতে বল, পরিশ্রম, পরাক্রম প্রভৃতি লাগে কি লাগে না। সদ্দালপুত্র বলিল লাগে না, কারণ সবই ভাগ্যের দ্বারা অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে। মহাবীর জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কোন ভৃত্য যদি ঘটবাটিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলে বা চুরি করে বা ফেলিয়া রাখে বা তোমার স্ত্রী অগ্নিমিত্রার সঙ্গে অবৈধ আচরণ করে তবে তুমি সেই ভৃত্যকে কি শাস্তি দিবে ?" সদ্দালপুত্র বলিল "আমি তাহাকে অভিশাপ দিব, তর্জ্জন করিব, বা প্রহার করিব, বাঁধিয়া রাখিব, বা তাহার প্রাণবধ করিব।" মহাবীর তখন বলিলেন যে সবই যদি ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট থাকে তবে ভৃত্যকে কিছুই বলা বা করা উচিত নয় ; কারণ সে তাহার কাজের জন্য দায়ী নয়। ইহাতে সদ্দালপুত্র বুঝিল যে আজীবিকবাদ ভ্রান্ত। আজীবিকরা নগ্ন হইয়া থাকিত ও কেহ প্রতি গৃহে, কেহ প্রতি দ্বিতীয়, কেহ প্রতি তৃতীয় গৃহে ও এই ক্রমানুসারে কেহ প্রতি চতুর্থ হইতে সপ্তম গৃহমাত্রে ভিক্ষা লইত ; কেহ বা শুধু পদ্মের মৃণাল ভিক্ষা লইত, কেহ বিদ্যুৎ চমকাইলে ভিক্ষা করিত না, কেহ উডুম্বর বট, বদরী প্রভৃতি ফল খাইত না, কেহ বা বৃহৎ মৃৎভাণ্ডে প্রবেশ করিয়া তপস্যা করিত।

আত্মষষ্ঠবাদ। আত্মষষ্ঠবাদীরা বলিতেন পঞ্চ ভূতের ন্যায় আত্মাও একটি ষষ্ঠ ভূত। এই ছয় ভূত অনাদি ও অবিনাশী।

তজ্জীব তচ্ছরীর বাদ। এই মতে যাহাই শরীর তাহাই জীব বা আত্মা। পঞ্চ ভূতই জগতের মূল কারণ ও এই পঞ্চ ভূতের শরীর হইতে আত্মা জাত হয় এবং শরীরের নাশের সঙ্গে আত্মারও নাশ হয়। কাজেই, পাপপুণ্য, জন্মান্তর, কর্ম্মফল প্রভৃতি কিছুই নাই। কেশাগ্র হইতে পদতল ব্যাপিয়া আত্মা থাকে ; যতক্ষণ শরীর ততক্ষণ আত্মা, মৃত্যুর পর কিছুই থাকে না। যদি বল শরীর ছাড়া আত্মা আছে, তবে তাহা হ্রস্ব না দীর্ঘ, ত্রিভুজ না চতুর্ভুজ, কাল না সাদা, নীল না লোহিত, গুরু না লঘু, মিষ্ট না তিক্ত, দ্রব না কঠিন, উষ্ণ না শীতল ? কোষ হইতে তরবারি, মাংস হইতে অস্থি, দুগ্ধ হইতে নবনী, তিল হইতে তৈল, ইক্ষু হইতে রস, ও অরণি হইতে অগ্নি যেমন পৃথক করিয়া দেখান যায়, সেরূপ শরীর হইতে আত্মা পৃথক করিয়া দেখাইতে পার ? পার না, অতএব আত্মা বলিয়া কোনও পৃথক বস্তু নাই।

জৈনদের "রাজপ্রশ্নীয় সূত্র" নামক শাস্ত্রগ্রন্থে প্রদেশী নামক একজন রাজার সঙ্গে কেশী নামক একজন জৈনশ্রমণের আত্মা বিষয়ক তর্ক-বিতর্কের সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে। রাজা প্রদেশী তজ্জীব তচ্ছরীরবাদী ছিলেন। এই বিবরণ হইতে এই মতবাদ ও প্রাচীন কালে সেই মতের খণ্ডন কিরূপে হইত বুঝা যাইবে। বিবরণ সংক্ষেপে এইরূপ—

প্রদেশী বলিলেন "শরীর ছাড়া পৃথক আত্মা যদি থাকে তবে আমার পিতামহ, যিনি অত্যাচারী রাজা ছিলেন ও নিজ পাপের ফলে নিশ্চয় নরকে গিয়াছেন, তিনি কেন আসিয়া তাঁহার প্রিয় পৌত্র আমাকে পাপবিষয়ে সাবধান করিয়া দেন না ? তিনি যদি আসিতেন তবে বুঝিতাম তাঁহার আত্মা এখনও জীবিত আছে এবং শরীর হইতে পৃথক আত্মা আছে।"

কেশী বলিলেন, "আপনার মহিষীর কেহ যদি ধর্ম্মনাশ করে ও উহার শাস্তির জন্য যদি আপনি তাহাকে ধরেন এবং সে যদি বলে 'আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি গিয়া আমার আত্মীয়বর্গকে সাবধান করিয়া দিই যে তাহারা যেন এরূপ পাপ না করে, করিলে আমার মত দণ্ড পাইবে' তবে কি আপনি তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন ? নরকভোগী আত্মার সেই অবস্থা, প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও নরক হইতে আসিতে পারে না।"

প্রদেশী বলিলেন "আমার পিতামহী ধর্ম্মশীলা ছিলেন ; তিনি নিশ্চয় স্বর্গে গিয়াছেন। তিনি আমাকে খুব ভালবাসিতেন। তিনি কেন আসিয়া আমাকে ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহিত করেন না ?"

কেশী বলিলেন "আপনি যখন শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া দেবমন্দিরে যান, তখন কেহ ডাকিলে অপবিত্র হইবার ভয়ে আপনি যেমন তাহার কাছে যান না, সেইরূপ স্বর্গবাসীরাও সংসারে আসেন না।"

প্রদেশী বলিলেন "আমি যখন একদিন সভায় বসিয়া ছিলাম, তখন নগরপাল একজন চোরকে বাঁধিয়া আনিল। আমি চোরকে একটি দৃঢ়বদ্ধ লৌহপাত্রে জীবন্ত বদ্ধ করিয়া সেখানে প্রহরী রাখিয়া দিলাম। কয়েক দিন পরে আমি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পাত্র উদ্ঘাটন করিয়া চোরের আত্মা খুঁজিলাম। পাত্রে কোন ছিদ্র ছিল না, কিন্তু তথাপি আত্মা দেখিতে পাইলাম না।"

কেশী বলিলেন "গৃহের সকল দ্বার, গবাক্ষ বদ্ধ করিয়া ভিতরে ভেরী-নিনাদ করিলে যেমন বাহির হইতে শুনা যায়, সেইরূপ আত্মাও লৌহাদি ভেদ করিতে পারে।"

প্রদেশী বলিলেন, "একবার আমি একটি চোরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া সুদৃঢ় লৌহপাত্রে বদ্ধ করিয়া প্রহরী রাখিয়াছিলাম। কয়েক দিন পরে সেই পাত্র খুলিয়া দেখিলাম অসংখ্য কীট কিলকিল করিতেছে। পাত্রে কোথাও ছিদ্র ছিল না, জীবন্ত কীটগুলি নিশ্চয় চোরের মৃত শরীর হইতে জন্মিয়াছিল, অতএব আত্মা শরীর হইতেই জন্মে।"

কেশী বলিলেন "অগ্নিতে লৌহ উত্তপ্ত করিলে লৌহে ছিদ্র না থাকিলেও অগ্নি তাহাতে প্রবেশ করিয়া লৌহকে অগ্নিময় করে ; সেইরূপ কীটের আত্মাও পাত্রে অদৃশ্যভাবে প্রবেশ করিয়াছিল।"

প্রদেশী বলিলেন "আমি একটি চোরকে কাটিয়া ফেলিয়া তাহার শরীরে তন্ন তন্ন করিয়া আত্মা খুঁজিয়াছিলাম, পাই নাই। কাটিয়া ফেলিবার ঠিক পূর্ব্বে ও পরে চোরকে ওজন করিয়াছিলাম, কোনও পার্থক্য হয় নাই। আত্মা যদি থাকিত তবে বার্দ্ধক্যে শরীরের জীর্ণতাই বা কেন হয় ?"

কেশী বলিলেন "আত্মা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয় ; জরাতে শরীরই জীর্ণ হয়, আত্মা অপরিবর্ত্তিত থাকে।"

সাতবাদ। সাতবাদীরা বলিতেন যে সুখ (সাত) হইতে সুখ হয়, সকল জীবই সুখার্থী, দুঃখে সকলেই কষ্ট পায়, মোক্ষ সুখেরই অবস্থা, অতএব সুখভোগের দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। ইন্দ্রিয়জ সুখভোগে কাহারও অনিষ্ট করা হয় না উপরন্তু ভোক্তার কষ্টদূর ও হর্ষ হয়। "সুভাষিত সংগ্রহে" ও আর্য্যদেব প্রণীত "চিত্তবিশুদ্ধ প্রকরণে" লিখিত আছে যে তান্ত্রিকরাও এই মত পোষণ করিতেন। *

শূন্যবাদ। শূন্যবাদীরা বলিতেন শুধু যে আত্মা নাই তা নয়, কিছুই নাই। সবই মায়া, ভ্রম, মরীচিকা। সূর্য্যের উদয়াস্ত, চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি, নদী ও বায়ুর প্রবাহ, সবই মিথ্যা। বৌদ্ধধর্ম্মের "মাধ্যমিক"-মত ও বেদান্তের মায়াবাদের উৎপত্তির সঙ্গে এই প্রাচীন শূন্যবাদের সম্বন্ধ আছে

দীঘ নিকায়ের "সামঞ্ঞফল সুত্তে" বুদ্ধ তাঁহার সমসাময়িক ধর্ম্ম-শিক্ষকদের মধ্যে মহাবীর ছাড়া আর পাঁচজনের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা গোশাল মঙ্খলিপুত্র, অজিত কেশকম্বল, পূরাণ কাশ্যপ, পকুধ কাত্যায়ন, ও সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্র। গোশাল আজীবিকদের গুরু ছিলেন। ইনিও মহাবীর কিছুদিন একত্র ছিলেন ; পরে মতদ্বৈধ হওয়ায় বিবাদ করিয়া পৃথক হইয়াছিলেন। গোশালের গোশালায় জন্ম হইয়াছিল। শ্রাবস্তিতে হালাহলা নাম্নী কুম্ভকার-পত্নীর বাড়ীতে আজীবিকদের ঘাঁটি ছিল। মৃত্যুর সময় বিকারের ঘোরে গোশাল অনেক রকম পাগলামি করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন উভয় শাস্ত্রেই গোশালের বড় নিন্দা আছে। অজিত নাস্তিকবাদী

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় লেখককে তন্ত্রশাস্ত্রে সাতবাদের এই প্রমাণগুলির কথা জানাইয়াছেন।

ছিলেন। পুরাণের আত্মা সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের পুরুষের মত ছিল। পুরাণ বলিতেন পাপপুণ্য ইত্যাদিতে আত্মার কোন পরিবর্ত্তন হয় না, আত্মা নিষ্ক্রিয়। পকুধের মত অনেকটা আত্মষষ্ঠবাদীদের মত ছিল। ইনি বলিতেন জগৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, সুখ, দুঃখ, ও আত্মা এই সপ্ত ভূতের সমষ্টি। মানুষকে কাটিয়া ফেলিলে পাপ হয় না, সপ্ত ভূতের মধ্য দিয়া তরবারি চলিয়া যায়, এইমাত্র। সঞ্জয় সংশয়বাদী—মহাবীরের মতে "অজ্ঞানবাদী", ও বুদ্ধের মতে "অমরাবিক্‌খেপিকবাদী"—ছিলেন ও বলিতেন যে মাত্র একভাবে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না,—একদিন হইতে যাহা একরূপ অন্যদিক হইতে তাহা ভিন্নরূপ।

উপরে উল্লিখিত দার্শনিক মতবাদগুলি ছাড়া বহু সংখ্যক সম্প্রদায়ের কথাও জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। †

কয়েকটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কথা সংক্ষেপে বলিব।

"হস্তীতাপস"রা বহু প্রাণীহত্যার পাপ হইতে বিরত থাকিবার জন্য বৎসরে একটি হাতী মারিয়া সারা বৎসর তাহার শুষ্ক মাংস খাইয়া থাকিত। "বালতাপস"রা গাছের ঝরাপাতা ছাড়া আর কিছু খাইত না। "গো-ব্রতিক"রা গরুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিত ও গরু যাহা করিত তাহা করিত, গরু ঘাস খাইলে নিজেরা ঘাস খাইত, গরু শুইলে নিজেরা শুইত, ইত্যাদি। কোন সম্প্রদায় আহারের সময় একটি জিনিষ খাইয়া, কেহ দুইটি, কেহ তিনটি, এইরূপে কেহ সাতটি জিনিষ খাইয়া জল খাইত। কেহ শুধু জল, কেহ বায়ু, কেহ শৈবাল, কেহ মূল, কেহ কন্দ, কেহ পাতা, কেহ ফুল, কেহ ফল, কেহ বীজ, কেহ গাছের ছাল খাইয়া থাকিত। কেহ শুধু পচা কন্দ, কেহ পচা মূল, কেহ পচা ফুল, কেহ পচা ফল, কেহ পচা পাতা খাইয়া থাকিত। কেহ শরীর উর্দ্ধাঙ্গ চুল্‌কাইত না, কেহ নিম্নাঙ্গ চুল্‌কাইত না। কেহ গঙ্গার দক্ষিণকূলে যাইত না, কেহ উত্তরকূলে যাইত না। কেহ জলে বাস করিত, কেহ মুক্ত স্থানে, কেহ গুহায়, কেহ সমুদ্র কূলে, কেহ বৃক্ষমূলে বাস করিত, কেহ জলে ডুবিয়া থাকিত। কেহ লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিত ও লোক আসিতে দেখিলে শাঁক বাজাইয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিত, কোন সম্প্রদায়ে থাইবার সময় শাঁখ বাজাইয়া লোক সরাইয়া দিত। কেহ স্নানের সময় একবার মাত্র ডুব দিত, কেহ ডুব না দিয়া স্নান করিত, কেহ অতি অল্পক্ষণ জলে থাকিত। কেহ যেখানে অশ্বগবাদি পশু থাকিত সেখানে যাইত না।

বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষি ছিল। প্রত্যেকেই নিজের দল পুষ্ট করিতে খুব চেষ্টা করিত ও অন্য দলের লোককে নিজদলে আনিতে পারিলে পরম আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। নিজের দল ভারি করিতে বা নিজ দলের লোকের অন্য দলে যোগ দেওয়া নিবারণ করিবার জন্য অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করা হইত, তাহারও অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। জোর জবরদস্তি প্রয়োগ বা অবৈধ উপায় অবলম্বনের দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না।

† লেখক প্রণীত Schools and Sects in Jaina Canonical Literature নামক পুস্তকে ইহাদের বিশদ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

যাত্রা-পথ

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বহুপথ প'ড়ে আছ বসুধার মাঝে
কোন তার সংখ্যা নাই,—নাহিক' নির্দ্দেশ ;

বন্ধুর অজানা পথে অনাগত কাযে
হোক্ মোর যাত্রা সুরু,—জড়তার শেষ !

ঊর্দ্ধমুখী লক্ষ্য মহা আছে দিবাযামী
গিরি পথ লঙ্ঘিবারে প্রশান্ত স্বপন—

মনে হয়, পথাশ্রয়ী বীর্য্য ল'য়ে আমি
সার্থক করিয়া লব' ক্ষণিক স্খলন।

পথিকের সাথী সম বন্ধু অযাচিত
অগণিত বৈরী যদি জোটে মোর পাশে,

আমি মোর লক্ষ্য ল'য়ে,—উচ্চ করি' শির
বিজয়ীর মত কব',—'এস' অজানিত।'

বিশ্ব-পথে বাহিরিনু যেই রত্ন আশে
যাত্রাশেষে আজি তাহা খুঁজে লব' স্থির।

গল্প

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

হুগলীতে, ভাগীরথীর তীরে প্রকাণ্ড এক অট্টালিকার ভিতরে এক সুবিস্তৃত কক্ষে একটি মহতী সভা বসিয়াছে। সভা মহতী বটে, কিন্তু তাহাতে রাজনীতি, অর্থনীতি, এমন কি সমাজনীতি আলোচিত হইতেছে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। রবিবার, আফিস-আদালত স্কুল-কলেজ বন্ধ ; অট্টালিকাস্বামী চা পান করিতেছেন ; স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, কন্যা, দৌহিত্র সকলেই লম্বা টেবিলের দুইটি দিক অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। দুইজন পাচক-ব্রাহ্মণ লুচি কচুরি সিঙ্গাড়া সরবরাহ করিয়া যাইতেছে ; জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ সামনে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া বসিয়া আছেন ; গৃহিণী টেবিল হইতে চেয়ারখানা একটু তফাৎ করিয়া বসিয়া হরিনাম করিতেছেন।

ভাদ্রমাসের শেষ ; গঙ্গা কূলে কূলে পরিপূর্ণা—বারিবক্ষ গৈরিক-রঞ্জিত ; ও-পারে পাটকলগুলির চিমনী হইতে অল্প অল্প ধূম বিনির্গত হইতেছে।

এবার আশ্বিনের প্রারম্ভেই মহাপূজা। আর তিন চারদিন পরেই স্কুল কলেজ বন্ধ হইবে, আদালত বন্ধেরও বিশেষ দেরী নাই। পাঠক বোধ হয় ভাবিতেছেন সভায় দেশভ্রমণের বিষয় আলোচিত হইতেছে ! হওয়াই স্বাভাবিক বটে, এখানে কিন্তু তা' মোটেই নয়।

কর্ত্তা চা পান শেষ করিয়া তোয়ালেতে মুখ মুছিয়া, দ্বার-সন্নিধানে দণ্ডায়মান ভৃত্যকে কহিলেন, "কানাইকে ডাক্ ত রে !" তার পর জ্যেষ্ঠপুত্র রমেশকে বলিলেন—"রমেশ, তুমি এবার পূজোর বাজার করবে। ফর্দ্দ তৈরী ; যবে বেরুতে চাও, ঠিক ক'রে ফেলো বাপু।" মধ্যমপুত্র নরেশকে বলিলেন, "তুমি তোমার বড়দি ও মেজদিকে আন্তে যাবে নরেশ ! পুরুতমশাইকে বলে আজই দিন ঠিক ক'রে তাদের চিঠি লিখে দাও গে।" কনিষ্ঠপুত্র পরেশ ভাবগতিক সুবিধা নয় বুঝিয়া পলায়নোদ্যোগ করিতেছিল, কর্ত্তা তাহা বুঝিয়া, সহাস্যে কহিলেন, "পালালে চল্‌ছে না পরেশ, তোমার ওপরেও কিছু কিছু কাজের ভার আছে। বস, বলছি।"

কানাইলাল সরকার আসিয়া কর্ত্তা গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে, কর্ত্তা বলিলেন—কানাই, ফর্দ্দগুলো এনে বাবুদের যার যা, তা বুঝিয়ে দাও।

পৌত্র সুরেশকে বলিলেন, তুই কি করবি বল্ ত রে শালা ?

সুরেশ দশ বৎসরে পড়িয়াছে, হৃষ্টপুষ্ট গৌরবর্ণ সুন্দর ছেলেটি। তাহার মাতার বামদিকে বসিয়াছিল, মাতার নির্দ্দেশমত কহিল—তুমি যা করতে বলবে দাদু, আমি তাই করবো।

পারবি ত রে ?

পারব দাদু।

বেশ, তুই আমার বডিগার্ড থাকবি। কেমন পারবি ত ?

সুরেশ সোল্লাসে কহিল, খুব পারব, দাদু।—বলিয়াই মা'কে কাণে কাণে বলিল—বডিগার্ড কি মা ?

মা বুঝাইলেন, দাদুর সঙ্গে সঙ্গে থাকবি, আর কিছু না।

ছেলে বলিল—কিছু করতে হ'বে না ? তা'হলে আমি বডিগার্ড হবো না।

মা যখন ছেলের অভিলাষ সভার গোচর করিলেন, তখন সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। শ্রীমান সুরেশ ইহাতে অতিমাত্রায় অপমান বোধ করিয়া মাতার পিঠের কাপড় টানিয়া মুখ ঢাকিয়া রাগতস্বরে সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল—আমি কিচ্ছু করবো না ত !—ঠাকুরও দেখবো না, নেমন্তন্নও খাব না, নতুন কাপড়ও পরবো না, কিচ্ছু না।

পিতামহ উঠিয়া, নাতিকে ধরিয়া আনিয়া কোলের কাছে বসাইয়া বলিলেন—সবচেয়ে বড় কাজ দিলাম শালা, তা তোর মনে ধরলো না। ভাইসরয়ের বডিগার্ড, এ কি কম সম্মান রে দাদা ! যাক্, ও কাজ যখন তোর পছন্দ নয়, অন্য কাজ দিচ্ছি, নে। ভিখিরীদের কাপড় দিতে পারবি ত ?

একগাল হাসিয়া নাতি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বড়কে বড়, পুরুষকে ধুতি, মেয়েলোককে সাড়ী, ছোটদের ছোট কাপড়—পারবি গুছিয়ে দিতে ?

হুঁ। যদি ভুল হয়, তুমি দেখিয়ে দিও দাদু।

ওরে শালা, উল্টে আমাকে তোমার এডিকং করবার মতলবে আছ তুমি! দুষ্টু কোথাকার!

আবার হাসির ধুম পড়িয়া গেল।

সুরেশের মা বলিলেন, কিন্তু কি অন্যায় বলেছে বাবা?

কর্ত্তা বলিলেন, কেমন বেটীর বেটা ও, অন্যায় কেন বল্‌বে?

কানাই আসিয়া রমেশের নাম-লেখা ফর্দ্দ রমেশকে, নরেশ ও পরেশের ফর্দ্দ তাহাদের হাতে দিল। সকলেই ফর্দ্দ খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন।

বাড়ীর যিনি গৃহিণী, এতক্ষণ তিনি হাস্য-পরিহাসে যোগ দিতেছিলেন বটে, কথাবার্ত্তা বড় বলেন নাই; এক্ষণে পুত্রত্রয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—তোরা এক এক করে ফর্দ্দগুলো পড়, শুনি।

রমেশ পড়িল। প্রায় হাজার জোড়া কাপড়, ছোট ছেলেদের জামা পোষাক, বৌমা ও মেয়েদের বারাণসী, জামাইদের ও তিন ভাইয়ের শান্তিপুরী, কর্ত্তার মুর্সিদাবাদী গরদের ধুতি-চাদর, গৃহিণীর লাল কস্তাপাড় ভাগলপুরী, যোগেনের ও তাহার কন্যার জন্য দুইজোড়া করিয়া থান ও সরুপাড় মিল-ধুতি।

নরেশ পড়িল, তাহার ফর্দ্দে লেখা আছে, বড়দি ও মেজদিকে আনিতে যাইবার সময় তাঁহাদের, তাঁহাদের পুত্র-কন্যাগণের ও ভগ্নীপতিদ্বয়ের পূজার কাপড় ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। দুইজন ভৃত্য মিষ্টান্ন প্রভৃতি লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইবে।

পরেশের পড়িবার পালা। পরেশ চক্ষু পাকাইয়া বলিয়া উঠিল, নেমন্তন্নর ফর্দ্দয় গোড়াতেই যোগেন ঘোষ! বর্দ্ধমানের মহারাজকুমার গেল, উত্তরপাড়ার মুখুজ্জেরা গেল, চকদীঘির সিংহীরা গেল, সক্কলের আগে কার নাম, না যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং হুগলী!

ব্যাপারটা প্রায় সকলের কাছেই বিসদৃশ ঠেকিলেও কেহই কিছু কহিলেন না। কর্ত্তা বলিলেন, কানাই, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন বাপু? এক দাগ, দু'দাগ, তিন দাগগুলো বুঝিয়ে দাও না পরেশকে; ও ছেলেমানুষ, কখনও ত করে নি, নইলে জান্‌বে কি ক'রে?

নামের পাশে তিনরকম দাগ আছে। কতকগুলির পার্শ্বে বাঁকা-ভাবে একটি, কতকগুলির পার্শ্বে দুইটি এবং বাকীগুলির পার্শ্বে তিনটি করিয়া দাগ টানা আছে। কানাই বুঝাইয়া দিল যে, এক-দাগযুক্ত নামগুলিতে ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র যাইবে; দুই-দাগসংযুক্ত ব্যক্তিবর্গের কাছে ছোট বাবুকে স্বয়ং যাইতে হইবে; এবং যাঁহাদের নামে তিন-দাগ আছে, তাঁহাদের নিকট তিনি ত যাইবেনই, উপরন্তু পুরোহিত মহাশয় স্বয়ং অথবা তাঁহার পুত্র সঙ্গে থাকিবেন। কারণ শেষোক্ত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ; শূদ্রগৃহে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ দিবার তাহাই প্রাচীন রীতি।

পরেশ, পরেশের দুই দাদা রমেশ ও নরেশ—সকলেই এক সঙ্গে প্রথম নামটার দাগের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—দাগ দুইটি! অর্থাৎ পরেশকে স্বয়ং যাইতে হইবে।

পরেশ জিজ্ঞাসিল, যোগেন ঘোষের বাড়ীতেও আমাকে যেতে হ'বে?—তাহার স্বর অত্যন্ত বিরক্তি ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ।

কর্ত্তা বলিলেন, উনিশ বচ্ছর মা এ বাড়ীতে আস্‌ছেন; এই উনিশ বচ্ছর তোমার বাবা ঐ যোগীনের বাড়ীতে সব প্রথম গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছে।

ইহার পরে আর কথা চলে না।

কর্ত্তা একটু পরে আবার বলিলেন—গিন্নীকে বলেছি, তোমাদের বলা হয় নি, এখন বলি শোন। গবর্ণমেণ্টের চাকরীর আইন আছে, পঞ্চান্ন বচ্ছর বয়সের পর আর চাকরী করতে দেয় না, রিটায়ার করিয়ে দেয়। আইনটা ভাল। যদিও চাকরী করি নি, খেটিছি তার চেয়েও বেশী। পঞ্চান্ন হ'তে একটি বছর দেরী, আসছে বছর রিটায়ার করব—কোর্ট থেকে ত বটেই, সংসার থেকেও কতকটা বটে। তাই এক বছর আগে থাক্‌তে হাতে-কলমে তোমাদের দ্বারা সব কাজ করিয়ে, আসছে বছর থেকে একেবারে বিশ্রাম নোব। রমেশ আদালতের মক্কেল রাখবে; নরেশ বিষয়-আসয়গুলো দেখবে; পরেশকে, ঠিক করেছি, বিলেত পাঠাব, ব্যারিষ্টার করিয়ে আনবো। অবিশ্যি—

বাধা দিয়া নাতি সুরেশ বলিল—দাদু, আমি ব্যারিষ্টার হ'বো।

না দাদা, তুমি ডাক্তার হ'বে।

ব্যারিষ্টার-পিসেমহাশয়ের গাউন চশমা টাইয়ের প্রতি

সুরেশ বাবাজীবনের যতখানি লোভ ছিল, ততখানি অথবা আরও কিছু বেশী লোভ ছিল, ফ্যামিলি ডক্টর যুগেনবাবুর ষ্টেথিস্‌কোপ ও সার্জ্জারি বাক্সের উপর। ভাবী-ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বাবু অতঃপর সন্তুষ্ট হইয়া বসিলেন।

কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন—বিলেত যাওয়ার আগে সুরেশের বিয়ে দেবার ইচ্ছেটাও আছে। বৌমারা কি বল গা?

বড় ও মেজ বৌমা সমস্বরে কহিলেন—নিশ্চয় বাবা! —বলিয়াই তাঁহারা দুইজনে প্রখর দৃষ্টি দ্বারা বেচারা সুরেশকে বিদ্ধ করিলেন। ভাবটা, কেমন, হইল! তাহার কারণ ছিল। পরেশ একটু ইয়ং-বেঙ্গল টাইপ; বলে, বিবাহ করিবে না, কিছুতেই না! এই বিবাহ-দ্রোহী দেবরটিকে শীঘ্রই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিবেন ভাবিয়া বুঠাকুরাণীদের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া, পরেশ যতখানি সম্ভব পিতার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিকে আড়াল করিয়া চক্ষুর ইঙ্গিতে ইঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিল যে, কাঁঠাল এখনও গাছের মগডালে, এখন হইতে সরিষার তেলের মালিস করা সুবুদ্ধির কার্য্য নয়।

কর্ত্তা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, কানাই, সাজকরকে বলে দিয়েছ ত, মা, ভাই, বোনেরা এবার সবাই খদ্দর পরবেন?

কানাই সবিনয় বিজ্ঞাপিত করিল, ব্যবস্থা সেইরূপই হইয়াছে।

মেজ বধূমাতা বলিলেন, বাবা, আমরা সব বেনারসী পরবো, আর মা'র বেলা খদ্দর?

কর্ত্তা বলিলেন, ওরে বেটী বোকা বেয়ানের মেয়ে, খদ্দর যে বেনারসীর চেয়েও পবিত্র। কাগজে পড়ছিস্ নে, খৃষ্টানের দেশ বিলেত, সেখানেও খদ্দরের নেংটী কি পুজো পাচ্ছে!

মেজ বধূমাতা কহিলেন, তা দেখছি ত! তাহ'লে বাবা, আমাদেরও আপনি খদ্দর দিন।

বেশ ত, রমেশ, বৌমাদের ও তোমার বোনেদের সব খদ্দর এনো, ফর্দ্দে কেটে লিখে নাও।

কর্ত্তা বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন, ছেলেরা ও মেয়েরা সকলে 'গুলতুনি' করিতে করিতে অন্দরমহলে প্রস্থান করিলেন।

দুই

কর্ত্তার নাম, রায় বাহাদুর ভবেশচন্দ্র মিত্র, সি-আই-ই। হুগলী জেলায়, তাই বা কেন, সারা বাঙ্গালায় ঐ নামটি জানে না, শুনে নাই, এমন লোক কয়জন আছে? আমার পাঠক-পাঠিকাগণ এতক্ষণে এটুকু নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, রায় বাহাদুরটী একেলে হইলেও সম্পূর্ণ সেকেলে লোক। সত্য সত্যই লোকটি নিতান্ত সেকেলে। এই পূজার সময়ে রাজা মহারাজা হইতে চাকরাণী-গৃহস্থ পর্য্যন্ত নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, কত আনন্দ করে, আর এ লোকটি মৃন্ময়ীমূর্ত্তির কোন্ যায়গাটায় গরজন তেল কম হইল, সিংহের কেশরগুলা আরও স্ফীত দেখান হইল না কেন (যেহেতু পশুরাজ তখন অসুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত), বীণাপাণির বীণার তারগুলিতে কেন রজন দেওয়া হইল না, এই সকল তর্ক আলোচনাতেই দিনাতিবাহিত করিতেছেন! যাক্, সে দুঃখ করিয়া, গল্প-লেখক আমি, আমার লাভ কি! আমার যাহা বলিবার, তাহাই বলিয়া যাই।

চকমিলান বহির্বাটীর বারান্দায় বসিয়া রায় বাহাদুর প্রতিমার সাজ পরান দেখিতেছেন, কানাই আসিয়া খবর দিল, জেলেরা বড় মাছ লইয়া যাইতেছে। হুকুম হইল, ডাক্, ডাক্।

সর্ব্বাপেক্ষা বড়টি ওজন করিয়া দেখা গেল, বাইশ সের। কর্ত্তা মৎসটি ভৃত্যের হস্তে দিয়া, স্বয়ং অন্তঃপুরে আসিয়া গৃহিণীর উদ্দেশে কহিলেন—কোথা গেলে গো? কি এনিছি দেখ সে!

গৃহিণী বাহিরে আসিয়া মাছ দেখিয়া, হাসিমুখে পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, ও মাছটা এখানে আন্ ত রে!

কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসিলেন—তোমার মাছটার ওজন কত?

বাইশ সের।

আমার উনত্রিশ সের। তোমার মৃগেল, আমার রুই। —আমার লিখিতে লজ্জা হইতেছে, গৃহিণীর চক্ষু দু'টি স্পষ্ট ভাষায় কহিয়া দিল, তাহা হইলে আমারই জিত। আরও লজ্জার কথা এই, একবছর পরে রিটায়ার করিবে যে লোক, সে'ও অম্লানমুখে পরাজয় স্বীকার করিয়া লইল।

দুইটা মাছ পাশাপাশি রাখিয়া, দেখিয়া, মিলাইয়া উভয়েই উভয়কে মনে মনে সাধুবাদ করিয়া লইলেন; পরে রায় বাহাদুর কহিলেন, এক কাজ কর, রমেশকে বলো, দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবকে রাত্রে খেতে বলে আসুক; আর যোগীনের বাড়ীতেও—

গৃহিণী বলিলেন, সে আর আমায় বলতে হ'বে না গো, আমি ক্ষেন্তিকে বলেই রেখেছি, চারটি আলু, একটু তেল, আর খানকতক মাছ দিয়ে আসতে।

কর্ত্তা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ধীবরগণ তখনও দাঁড়াইয়া আছে। নিশ্চয় কানাই দাম দেয় নাই, উহাদের কাজের ক্ষতি করাইয়াছে। কানাইকে ডাকিতেই, ধীবর সবিনয়ে কহিল—দাম পেইছি কর্ত্তা। নতুন খয়রা মাছ উঠেছে, নেওয়া হবে কি না জিজ্ঞেস করছি।

নতুন খয়রা মাছের কথা শুনিয়া কর্ত্তা পরম পুলকিত হইয়া উঠিলেন। দশসের মাছ লওয়া হইল; পাঁচ সের বাড়ীর ভিতরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, বাকী পাঁচ সের লইয়া কানাই সরকার তখনই কলিকাতা যাত্রা করিল। কলিকাতায় রমেন্দ্রনাথ নামে রায় বাহাদুরের এক বন্ধুপুত্র অবস্থান করেন, তিনি খয়রা মাছ ভালবাসেন বলিয়া প্রতি বৎসর দু' একবার ঐ মাছ প্রেরিত হইয়া থাকে।

বেলা দশটা বাজিল, ভৃত্য তেল মাখাইতে বসিল, স্নানাহার সারিয়া এখনই আদালতে বাহির হইতে হইবে। একজন গোমস্তা আসিয়া বলিল—ছোট বাবু আজ কলেজ যাবেন না।

কেন? পরেশের কলেজের ছুটি হয়ে গেছে নাকি?

আজ্ঞে না। ঘোড়া-জোড়ার অসুখ করেছে, গাড়ী জোতা হ'বে না, তাই।

একখানা ভাড়া-গাড়ী করে দাও না।

আজ্ঞে, তা আমি দিতে চেয়েছিলুম, তিনি ছ্যাকড়া গাড়ীতে চড়বেন না বল্লেন।

ডাক দেখি পরেশকে।

পরেশ কলেজের বেশে পিতৃ-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে পরেশের দুই দাদা, তাহাদের মা সকলেই এধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। তুচ্ছ কারণে পরেশের কলেজে না যাওয়া লইয়া অন্দর-মহলে আলোচনা সুরু হইয়া গিয়াছিল।

কর্ত্তা আর কাহাকেও দেখিতে পান নাই, সামনে কেবলমাত্র পরেশকে দেখিলেন, বলিলেন—ভাড়া-গাড়ীতে যেতে দোষ কি রে পরেশ?

পরেশ উত্তর দিল না; পিতা পুনশ্চ কহিলেন—তোর সব হলি কি রে পরেশ? বোশেখ মাসের কাঠফাটা রোদে, শ্রাবণ ভাদ্দরের হাঁটুভোর কাদা ঠেলে দু'ক্রোশ দূরে ইস্কুলে রোজ আমরা গেছি, এইছি। এইখেনে থেকে এইখেনে তোদের কলেজ, হেঁটে যাওয়ারই ত কথা, না-হয় গেলি গাড়ীতেই গেলি! কিন্তু একদিন বাড়ীর গাড়ী না হলে যাওয়া যায় না? হ্যাঁ রে পরেশ, আমি যে···

পরেশ হস্তস্থিত বহিগুলিতে মুখের কতকাংশ আচ্ছাদিত করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আপনাতে আমাতে তফাত অনেক। আপনি ছিলেন টেক্স-দারোগা অবিনাশ মিত্রের ছেলে, আমি অনারেবল রায় ভবেশচন্দ্র মিত্র বাহাদুর সি-আই-ইর ছেলে—আপনাতে আমাতে অনেক তফাত।

পরেশের উত্তর শুনিয়া যে যেখানে ছিল, সকলেই হাসিয়া উঠিল; কর্ত্তাও সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। ওদিকে ফিরিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শুনলে তোমরা, ছেলের কথা শুনলে একবার! আমার বাবাকে গালাগাল!—তারপর ভৃত্যকে বলিলেন, ওরে বড় বাবুকে ডাক্।

বড় বাবু নিকটেই ছিলেন, হাসি চাপিতে চাপিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার মুখ দেখিয়াই কর্ত্তা বুঝিলেন, রমেশও সব শুনিয়াছে। বলিলেন, ওহে রমেশ, পরেশ বাবুর ত মোটর নইলে আর চলছে না দেখছি। ঘোড়ার যদি একদিন অসুখ বিসুখ হয়, তাহ'লেই ত কলেজ কামাই করবেন; শেষকালে কি বি-এ ফেল ক'রে বংশের নাম ডোবাবেন! কাজ নেই বাপু, ছোটখাট দেখে একখানা মোটর তুমি ওঁকে কিনে দাও।

পরেশের তথা রমেশের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইল। এই সময়ে রঙ্গক্ষেত্রে গৃহিণীর আবির্ভাব! গৃহিণী লাল কস্তাপাড় শাড়ী পরিতেন, মানুষটি ছোটখাট, অথচ পাড় দুইটি এতই প্রশস্ত যে মনে হইত তিনি বুঝি রক্তবর্ণের বস্ত্রই পরিধান করিয়া আছেন। গৃহিণীকে দেখিয়া কর্ত্তা রসিকতার ছলে কি বলিতে যাইতেছিলেন, তৎপূর্ব্বেই গৃহিণী বলিলেন—বলি, ছেলে ত মোটরে কলেজে যাবে, ছেলের

বাবা কি সেই পক্ষীরাজের জুড়ীই হাঁকাবেন? ছিঃ, লোকে বলবে কি গো?

বৌমাদের প্রবেশ!

—না বাবা, সে কিছুতেই হ'বে না। ছোট ঠাকুরপো বরং হেঁটেই কলেজে যাবে, আপনি মোটরে আদালত করবেন।

রমেশ বলিলেন—সে কথা সত্যি বাবা, সেটা ভাল দেখায় না।

পরেশ দুষ্টামি হাসিতে মুখ ভরাইয়া মিটমিট করিয়া বলিল—বাবার জন্যেই মোটর আসুক, আমি ঐ পক্ষীরাজেই যাব।

কর্ত্তা গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, তোমরা যে কথামালার সেই বুড়ো আর তার ছেলের গল্প ক'রে তুললে দেখছি। ছেলে ঘোড়ায় চড়লে লোকে নিন্দা করে—বুড়ো বাপ হেঁটে যাচ্ছে আর ছেলে আরাম করছে; আবার বুড়ো ঘোড়ায় উঠলে বলে, বুড়োর আক্কেল দেখেছ, কচি ছেলেটাকে হাঁটিয়ে মারছে। নাঃ, কাজ নেই বাপু লোকনিন্দা সহ্য করে! রমেশ, দু'খানা মোটরই কেনবার ব্যবস্থা কর। একখানায় পরেশ চড়বে, আর একখানায় আমরা আদালতে যাব।

নাতি সুরেশ ঝটিতি বলিয়া উঠিল—দাদু, আমি?

কর্ত্তা হাসিয়া সস্নেহে কহিলেন, তাই ত রে শালা, সোনা বাইরে, আঁচলে গেরো! রমেশ, সেই যে বেবী-কার না-কি বলে, তাই একখানা ঐ শালার জন্যেও বলে দিয়ো।

ছোট মেয়ে পঙ্কজিনী হাসিয়া বলিল—একসঙ্গে তিন পুরুষের ব্যবস্থা হয়ে গেল! ভারি খুসী।

পঙ্কজিনীর বছরখানেক হইল বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামী বিলাতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িতে (অবশ্য শ্বশুরের খরচেই) গিয়াছে। কর্ত্তা বলিলেন, রমেশ, বিলাতে টমাস কুকের কেয়ারে একখানা কারের দাম 'কেবল' করে দাও, সজনীকে তারা যেন একখানা গাড়ী কিনে দেয়।—সজনী ছোট জামাতার নাম।

কর্ত্তা স্নানকক্ষে প্রবেশ করিলেন। পরেশ সমস্ত বাহাদুরিটা নিজস্ব করিয়া লইয়া, ভাড়া-গাড়ী আনাইয়া কলেজে চলিয়া গেল।

তিন

গাড়ী আসিতে বিলম্ব হইল না, পরদিন প্রভাতেই তিনখানা গাড়ীই আসিয়া পৌঁছিল।

কর্ত্তা, কানাইকে পাঠাইয়া যোগীন ঘোষকে ডাকাইয়া আনিয়া, বলিলেন, তিনখানা গাড়ী কিনে ফেললুম যোগেন, ছেলে-বাবুরা সব বাবু হ'য়ে পড়েছেন, মোটর ছাড়া ওঁদের আর চলে না। চল একটু বেড়িয়ে আসি।

মেয়েরা পরেশের গাড়ীতে উঠিয়াছেন, সুরেশের গাড়ীতেও কেহ কেহ উঠিয়াছেন, বড় গাড়ীখানা খালিই ছিল— কর্ত্তা যোগীনকে উঠাইয়া, নিজে সেই গাড়ীতে উঠিলেন। তিনখানা গাড়ী এক-সঙ্গে ষ্টার্ট করিল—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া গাড়ীগুলি ছুটিল। কিয়দ্দূর গিয়াই অন্য দুইখানা গাড়ী কর্ত্তার গাড়ীকে পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল—কারণ সেই গাড়ীখানিই সর্ব্বাপেক্ষা বড ও অধিক শক্তিসম্পন্ন। কর্ত্তা পাশ কাটাইবার সময় ইহাদিগকে ছুয়ো দিয়া গেলেন এবং সত্য কথা বলিতে কি, বাড়ীসুদ্ধ লোকের রাগটা গিয়া পড়িল, সেই যোগীন ঘোষের উপর।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত গিয়া আবার ফেরা হইল। এবার কর্ত্তা স্বয়ং যোগেনের বাড়ীর দ্বারে গাড়ী থামাইয়া, নিজে নামিয়া, তাহাকে নামাইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

অপরাহ্নে পিতাপুত্র আদালত হইতে ফিরিতেছেন, বাড় হইতে একটু দূরে যোগেন ঘোষের সঙ্গে দেখা; সে তাঁহার গৃহপানেই আসিতেছিল;—কর্ত্তা মোটর থামাইতে বলিলেন এবং নিজে নামিয়া পড়িলেন। যোগেন রাস্তার একেবারে শেষে, অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া ছিল; কর্ত্তাকে নামিতে দেখিয়া সে আরও হতভম্ব হইয়া পড়িল। অপরাধীর মত কাঁচুমাচুমুখে, জোড় হস্তে বলিল, আমি ভেবেছিলুম, আদালত বন্ধ হয়ে গেছে, আপনি বাড়ীতেই আছেন, তাই একটু কাজের জন্যে আস্‌ছিলুম—তা থাক্, আমি সন্ধ্যের পর আবার আস্‌বো।

সে কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া, কর্ত্তা রমেশকে বলিলেন, তুমি বাড়ী যাও রমেশ, আমি কথা কইতে কইতে আসছি।

যোগেন বলিল, না, না, আপনি গাড়ীতে উঠুন, আমি পরে আসবো অখন।

তুমি যাও রমেশ, আমি আসছি।

রমেশের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এত বাড়াবাড়ি কাহার বা সহ্য হয়। বাড়ী ফিরিয়া, তিন ভ্রাতা, এক ভগ্নী, দুই বধূ একটা মস্ত সভা জমাইয়া ফেলিল; এবং আজ প্রকাশ্যে ও কঠোরভাবে প্রতিবাদ করিবে সভায় এই প্রস্তাব ভোটের জোরে পাস করাইয়া লইল। গৃহিণী হাঁ না কিছুই বলিলেন না। উপযুক্ত পুত্রগণের মত-বিরুদ্ধতা করাও যেমন অনভিপ্রেত, স্বামীর বাড়াবাড়িটাও তেমনই অশোভনীয় যে না ঠেকিত, তাহা নহে।

সন্ধ্যার পর কর্ত্তা বাড়ী ফিরিলেন, সঙ্গে যোগেন। বৈঠকখানায় বসিয়া কানাইকে পাঁচশ' টাকা আনিতে বলিলেন। টাকা তহবিলে নাই, কানাই সে কথা জানাইতে, কর্ত্তা হুকুম দিলেন, বাড়ীর ভেতর থেকে আনো।

টাকা আসিলে, যোগেনের হাতে তাহা দেওয়া হইল। কানাই আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসিল, কাগজ কলম আনতে হ'বে কি?

কর্ত্তা গম্ভীরভাবে কহিলেন, না। তুমি যাও।

যোগেন চাদরের খুঁটে টাকা বাঁধিতে বাঁধিতে মুখ খুলিতে সুরু করিবামাত্র, "আমি কাপড়-চোপড় ছাড়ি গে যোগেন, সেই সকাল থেকে সঙ সেজে আছি" বলিয়া ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়াই অন্তঃপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বিদ্রোহী-দল স্থির করিয়াছিল, রাত্রে খাইতে বসিয়া কথাটা তোলা যাইবে এবং পরেশচন্দ্রই সভার মুখপাত্রের কার্য্য করিবেন, ইহাও নির্দ্ধারিত ছিল। ভোজন-টেবিলে সকলেই উপস্থিত, কর্ত্তা তখনও আসেন নাই। তিনি তখনও স্নান-কামরায়, রোজই এইরূপ হয়। কর্ত্তা স্নানকক্ষ হইতে বাহির হইয়াই খাইতে বসেন। রাত্রের ভোজন-আসর, এক উৎসব বিশেষ। নাতি নাতনীদেরও হাজির থাকিতে হয়; ঘরের সকলগুলি আলো জ্বলিয়া উঠে, দুইখানা বড় বড় টানা পাখা দুলিতে থাকে; বৌমারা ছুটাছুটি করিয়া তদারক করিতে থাকেন, মাঝে মাঝে পরিবেশন করিতেও হয়—কারণ বৌমারা দুই চারিটি ব্যঞ্জন প্রস্তুত না করিলে কর্ত্তার মনে ধরে না; গৃহিণী নাতি নাতনীদের পার্শ্বে চেয়ার লইয়া বসেন, তিনি কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে তাঁহার বিশ্বাস, তাহাদের কণ্ঠা বাহির হইয়া পড়ে।

স্নান-কামরার ছিটকিনি খোলার শব্দ হইতেই, বড় বৌমা ছুটিয়া নীচে চলিয়া গেলেন, রমেশ ও নরেশ চক্ষুর ইঙ্গিতে পরেশকে উৎসাহিত করিয়া রাখিলেন; নাতি নাতনী যাহাদের মাথার সঙ্গে টেবিলের ঘন ঘন সঙ্ঘর্ষ ঘটিতেছিল, তাহারা অকস্মাৎ মাথাগুলিকে বাধ্য করিয়া ফেলিল। কর্ত্তা আসিলেন। আসিয়া চেয়ারে বসিলেন; মধ্যম বধূমাতা মাটীতে বসিয়া শ্বশুরমহাশয়ের পা দু'খানি ভাল করিয়া মুছাইয়া, দু'পাটী সিল্কের পাতলা মোজা পরাইয়া, চেয়ারের হাতায় রক্ষিত সিল্কের পাতলা শালখানি গায়ে দিয়া দিলেন। আহার্য্য আসিল, এবং সকলে আহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভবেশবাবুর মত আধুনিকতাবর্জ্জিত লোক কেন টেবিলে বসিয়া আহারাদি করেন, লেখকের মনে হইতেছে পাঠক পাঠিকারা লেখকের নিকট এ সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ দাবী করিতেছেন। কৈফিয়ৎ এই: তিনি মনে করেন, টেবিলের মাথায় বসিলে নিজের খাওয়ার সঙ্গে সকলের খাওয়া তদারক করা যায়, কেহ ফাঁকী দিতে পারে না; আসনে পা মুড়িয়া বসিতে, তাঁহার মত স্থূলাঙ্গ ব্যক্তির আড়ষ্টতা জনিত কষ্ট অনুভূত হয়, ইহাতে তাহার সম্ভাবনা নাই; আর মাথা মুখ না ফিরাইয়া বেশ সহজভাবে গল্প করা চলে। টেবিল-চেয়ারে বসিয়া খান্ সত্য, কিন্তু ছুরী-কাঁটা-চাম্চ দরকার হয় না এবং আহার-শেষে ফিঙ্গার-বৌলে হস্তমুখ প্রক্ষালনের সমর্থন তিনি আদৌ করেন না।

কর্ত্তা বলিলেন, রমেশ বোধ হয় তখন খুব বিরক্ত হয়েছিল—রাস্তায় নেমে পড়ার জন্যে!

রমেশ কথা বলিবার পূর্ব্বে তিনি আবার বলিলেন, লোকটা বড়ই বিপন্ন হে!

লোকটা যে কে, তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন; কেহই কোন কথা বলিলেন না।

কর্ত্তা কহিলেন, আমার বরাবর সন্দেহ ছিল, যোগীন ত একেবারে অশক্ত, অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে। বিধবা মেয়ে আর তার অতগুলি কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে সংসার চালায় কি করে! মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেসও যে না

করিছি তা নয়; পষ্ট জবাব কোনদিনই দিত না; বল্‌ত, 'ভগবান চালিয়ে দেন,' 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেন তিনি,' এই সবই ছিল তার জবাব। অথচ আমি বরাবর বলিছি, যোগীন, দরকার হ'লে কোন কথাই আমার কাছে লুকিয়ো না। কিন্তু এমনই বুদ্ধিহীন লোকটা যে, আমার কাছে কোন কথা না বলে এক সাইলক-বেনের কাছে শ' দেড়েক টাক' ধার ক'রে আজ ভিটে মাটী সব হারাতে বসেছিল। দেড়শ' টাকা নাকি সুদে আসলে পাঁচ বছরে পাঁচশ' টাকা হয়েছে; চুপি চুপি নালিশ ক'রে,ডিক্রী ক'রে একেবারে বাড়ী বাঁশগাড়ী করতে এসেছিল; অনেক কষ্টে হাতে পায়ে ধ'রে একটি দিনের সময় পেয়েছে; কাল সকালেই টাকা দিতে হ'বে। না পারলে গাছতলায় ঘর বাড়ী! তা'ও হতভাগা আমার কাছে আসতো না, ওর মেয়েটাই ধরে-বেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছে, তাই এসেছিল। ওর বিশ্বাস, আমি যে ওকে একটু আধটু 'দয়া' করি, টাকার কথা তুললেই নাকি advantage নেওয়া হ'তো।—advantage এর বাঙ্গালাটা বেশ বলেছিল হে!—অত্যাচার না অসম্মান, ঠিক মনে পড়ছে না। হাজার হোক্, গয়লা ত জাতে! কথাতেই বলে, আশী বছর না হ'লে ওরা সাবালক হয় না।—বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

পরেশ অবসর খুঁজিতেছিল; হাসি থামিলে, বলিল—তাই বুঝি পাঁচশ' টাকা দিলেন তা'কে?

হুঁ; কানাইটে আবার এমনই বুদ্ধিমান, কাগজ, কালী-কলম, ইষ্ট্যাম্প নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, খত লিখিয়ে নেবে। বুদ্ধিমান রামধন আর কি! আরে ও-বেচারা গরীব, বিপন্ন, দেবে কোথা থেকে যে খত লিখিয়ে নোব!

তা'হলে টাকাটা জলে গেল, বলুন?

হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করিয়া গম্ভীর হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন, তার মানে কি পরেশ?

পরেশ সাত হাত মাটীর নীচে বসিয়া গেল; পিতার সে মূর্ত্তি কেহ কখনও দেখে নাই! কিন্তু তখন পিছু হঠাও চলে না, দাদারা বৌদিরা সকলে তাহার পানে চাহিয়া আছেন। পরেশ শুষ্কস্বরে ভয়ে ভয়ে কহিল, টাকাটা আর পাওয়া যাবে না, তাই বলছি।

কর্ত্তা অন্য দুই পুত্রের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমরাও কি তাই বল না কি হে?

তাঁহারা নীরব। এই নীরবতার স্পষ্ট অর্থ বুঝিয়া কর্ত্তা একবার গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার মনোভাব জানিবার চেষ্টা করিলেন। সুখের বিষয় সে মুখে চিরদিন যে নির্লিপ্ত ভাব বিরাজ করিতে দেখা গিয়াছে, আজও তাহাই সুস্পষ্ট। কর্ত্তা প্রসন্ন হইলেন, বলিলেন—এই কটা টাকা গেছে এই হয়েছে তোমাদের ভাবনা, না? গরীবের ছেলে, বই কিনতে যা'র পয়সা জুটতো না, পরের বাড়ীর দেউড়ীর আলোয় বসে যা'কে স্কুলের কলেজের পড়া তৈরী ক'রে আসতে হোত, অসুখে-বিসুখে মিশনরীদের হাসপাতালের জানালায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্ণা দিয়ে যা'কে ওষুধ এনে খেয়ে অসুখ সারাতে হো'ত, তার পাওয়ার পরিমাণটা তোমাদের চোখে পড়ল না; আর একটি গরীব, বিপন্ন প্রতিবাসীর কাজে ঐ ক'টা টাকা গেছে ভেবে একেবারে মর্ম্মাহত হোয়ে পড়েছ দেখছি। যে লোক দশ হাতে রোজগার করেছে, অতি দীন অবস্থা থেকে মানুষ যে অবস্থা সাগ্রহে কামনা করে সেই অবস্থায় উন্নীত হয়েছে, সে যদি দু'হাতে কিছু খরচ ক'রে, তা'তে দুঃখিত হওয়া কি কারো উচিত?

এক মিনিট থামিয়া কর্ত্তা পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, আগেও তোমাদের বলিছি, এখনও বলছি, নিজের ভোগ, ইচ্ছা, বাঞ্ছা, বাসনা, কোনটা অপূর্ণ রেখে অর্থ সঞ্চয় করে যাবার সদিচ্ছা আমার কোনদিনই নেই।

কথাগুলি বলিয়া, যেন কিছুই হয় নাই, এই ভাবে তিনি পুনরায় খাইতে আরম্ভ করিলেন। পাতের খাবার সবই প্রায় ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, বধূমাতারা ছুটাছুটি করিয়া আবার সব গরম আহার্য্য আনিয়া দিলেন।

পরেশ ভাল করিয়া খাইতেছে না দেখিয়া, হাসিয়া কহিলেন, ভাবতে হবে না রে পরেশ, তোদের তিন ভাইয়ের ভাগ থেকে একটি কপর্দ্দকও কমবে না, এই বুড়োবুড়ীর একটা দু'টো ভাগ আছে ত, ও-টাকাটা তারই থেকেই যাবে। হ্যাঁ হে রমেশ, আজকের কনসাল্‌টেসান্‌টায় কত পাওয়া গেল হে?

রমেশ বলিল—হাজার এক টাকার চেক্ দিয়ে গেছে।

যাক্, বাঁচা গেল! পাঁচ-শ টাকা বাজে খরচ হয়ে গেছে, বাকী পাঁচ-শ' পরেশ বাবুকে কাল দিও দিত হে! বুঝলে!

রমেশ কহিল—যে আজ্ঞে।

নাতি সুরেশ একখানা শক্ত মোগলাই পরোটা লইয়া ধস্তাধস্তি করিতেছিল, ছোট্-কা হঠাৎ অনেকগুলি টাকা পাইয়া গিয়াছেন শুনিয়া বলিয়া উঠিল, দাদু, আমায় টাকা দেবে না?

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, যা শালা, ব্যালেন্স এক টাকা তোর!

নাতি বলিলেন—ছোট্-কার বেলা অ—তো টাকা, আর আমার বেলা এক টাকা!

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন—ওরে শালা, তুই বড় হ, তোর ছোট্-কার মত দুষ্টু হ, তখন তোর বাবাও তোকে অমনি গাদা গাদা টাকা দেবে। শুধু কি হাত পাতলেই হয় রে ভাই? প্যাঁচ দিতে জানা চাই। বুঝলি?

নাতি কি বুঝিল, কে জানে; কিন্তু সকলেই হাসিয়া উঠিল এবং সত্য কথা বলিতে কি, এতক্ষণ ধরিয়া যে ঘরের বাতাস অত্যন্ত ভারী বোধ হইতেছিল, তাহা আবার হাল্কা হইয়া সহন ভাব ধারণ করিল।

চার

মহাষষ্ঠী! আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে। অপরাহ্নে অনাথ আতুরদিগকে অর্থ বস্ত্র দেওয়া হইয়াছে; নাতি সুরেশ স্বহস্তে দান করিয়াছে; কর্ত্তা তাঁহার বাল্যবন্ধুর পুত্র রমেন্দ্রকে লইয়া পার্শ্বে বসিয়া দেখাশুনা করিয়াছেন। সুরেশ পিতামহকে বিশেষভাবে আনন্দ দিয়াছে। অর্থ ও বস্ত্র বিতরণ সম্পর্কে একবারের বেশী তাহাকে নির্দ্দেশ দিতে হয় নাই। পিতামহ বলিয়াছেন, সুরেশ আমার মুখ রাখবে।

রাত্রি তখন আট-টা। সদর-বাড়ীর উঠানে পাল টাঙ্গাইয়া, সাঁওতালী নাচ দেওয়া হইয়াছে। কাতারে কাতারে নরনারী আসিয়া জমিয়াছে; বাড়ীর মেয়েরা উপরের বারান্দার চিকান্তরালে বসিয়া; কর্ত্তা বৈঠকখানার রোয়াকে ফরাসের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছেন, পার্শ্বে রমেন্দ্র। এক সময়ে, ফরাসের কাছে একটি মলিন-বসনা নারীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া রমেন্দ্র সেইদিকে কর্ত্তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। কর্ত্তা সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—কে মা গৌরী? কি খবর?

গৌরী বলিল—কাল থেকে বাবার খুব জ্বর হয়েছিল, এখন ছাড়ছে বোধ হয়, কিন্তু বড্ড ঘামছেন, মাদুর বালিশ সব ভেসে যাচ্ছে। আর জ্ঞানগম্যি কিচ্ছু নেই, কাউকে চিন্তেও পাচ্ছেন না।

তাই না কি! তুমি চল মা, আমি আসছি এখনি। ওরে ভুতো, একটা আলো নে। কানাই কোথা গেলে হে, মৃগেন ডাক্তারকে একবার চট্ ক'রে খবর দাও।—বলিয়া তিনি গৌরীর সঙ্গে সঙ্গেই সিংহদ্বার পার হইলেন। যাহারা নাচিতেছিল, তাহারা জানিল না, যাহারা দেখিতেছিল, তাহারাও জানিল না; কিন্তু যাহারা জানিবার মত, বুঝিবার মত, দূরে থাকিয়াও তাহারা সবই দেখিল; কি বুঝিল, জানি না, কিন্তু তাহাদের মুখে যে চিহ্নগুলি ফুটিল, তাহাতে প্রীতি অথবা সন্তোষ যে বিকশিত হইল না, তাহা জানি। এই মেয়েটিকে তাহারা কোন দিন দেখে নাই; তথাপি সে যে যোগেন ঘোষের বিধবা কন্যা তাহা বুঝিতেও তাহাদের যেমন বিলম্ব হইল না, মলিন বসনাভ্যন্তর হইতে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত নারীদেহের অপরূপ রূপ-লাবণ্যের পূর্ণ বিকাশ দেখিয়া দারুণ দুশ্চিন্তার বৃশ্চিক-দংশনজ্বালা হইতেও তাহারা অব্যাহতি পাইল না।

ম্যালেরিয়া জ্বর ছাড়িবার কালে, অনেক সময় ঐ রূপ হয়, বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নাই, তবুও আমি ঘণ্টা খানেক পরে আবার আসিয়া দেখিয়া যাইব—ডাক্তারের মুখে এই অভয়বাণী শুনিয়া কর্ত্তা যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন নাচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আসর প্রায় খালি; কেবল প্রতিমার রূপমুগ্ধ পাড়ার বালক বালিকারা আসরের মাঝখানে বসিয়া শুইয়া সিংহীমামার কেশর, অসুর ভায়ার রক্তচক্ষু ও কার্ত্তিকঠাকুরের ময়ূরের রূপগুণ আলোচনায় নিমগ্ন রহিয়াছে।

আহারের সময় উপস্থিত। পূর্ব্ব-পরিচিত সকলেই ত আছেনই, উপরন্তু দুই জামাতা, কন্যা, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি, বন্ধুপুত্র রমেন্দ্র আছেন।

ষষ্ঠীর রাত্রের আয়োজন যেমন বিচিত্র, তেমনই বিরাট। আজ আর পাচক ব্রাহ্মণ নহে, আজ বাড়ীর মেয়ে-বৌয়েরা সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। আজ নিরামিষের ব্যাপার, কাজেই বহুবিধ ও সকলগুলিতেই বিচক্ষণতা অত্যাবশ্যক। রমেন্দ্রকে কর্ত্তা বাম পার্শ্বে লইয়া বসিয়াছেন, রমেন্দ্র খাইতে পারে বলিয়া তিনি তাহাকে বড় ভালবাসেন।

নানা কথা হাসিগল্পের মধ্যে ভোজন-আসর খুবই জমিয়া উঠিয়াছে; কানাই আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল।

কর্ত্তা মুখ তুলিয়া চাহিতেই, কানাই বলিল, ডাক্তার বাবু এসেছেন।

কর্ত্তা বলিলেন—যোগীনের বাড়ীতে নিয়ে যাও-না! বলে দিও, ফেরবার সময় যেন দেখা ক'রে খবর দিয়ে যান।

কানাই বলিল, তিনি সেখান থেকেই আসছেন।

ডাক, এইখানেই ডাক।

মৃগেনডাক্তার নিঃশব্দে এবং খুব সহজভাবেই ঘাড়টা নাড়িয়া দিলেন। কর্ত্তা আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—কতক্ষণ?

ডাক্তার বলিলেন, এই মাত্র!

বড়-বৌমা, আঁচাবার জল দাও মা!

সকলেই হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন; কিছুই খাওয়া হয় নাই, মাত্র দুই গ্রাস পলান্ন মুখে দিয়াছেন!

আর হয় না মা! জল দাও।

পরেশ বলিয়া উঠিল—এটা কিন্তু আপনার বড্ড বাড়াবাড়ি বাবা! কে সে যোগীন ঘোষ, আমাদের না-জ্ঞাত, না-জ্ঞাত, না-কুটুম্ব, না-বন্ধু যে, খাওয়া ছেড়ে উঠ্‌তে হ'বে! কে-সে যে—

কর্ত্তা বসিয়া পড়িলেন; বলিলেন, সে কে, তা এই রমেন্দ্র জানে! তোমাদের জানাবো না ভেবেছিলুম, বড় লোক হ'লে গরীবের উপকারটুকু কেউ মনে রাখতে ইচ্ছা করে না; মনে করলেও নাকি তাদের কষ্ট হয়। তাই ভেবেছিলুম, আমার সঙ্গেই যার শেষ, তা আর কাউকে জানিয়ে যাবার দরকার হ'বে না। কিন্তু আজ যখন যোগীন পৃথিবীর ক্রোধ বিরক্তির অতীত হয়ে গেছে, তখন কথাটা জানালেও ক্ষতি নেই।—যে ঘরে আজ তোমরা রূপোর থালায়, সোনার বাটীতে, রূপোর গেলাসে টেবিল সাজিয়ে বসে আছ, ঠিক এই জায়গায় গোলপাতার ঘরে এক দুঃখিনী বিধবা তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বাস করতো। ভিক্ষে সিক্ষে-ক'রে নানাভাবে গতর খাটিয়ে মা যা রোজগার করতো, তাতে মা ছেলের পেটের ভাত, কায়ক্লেশে কোনদিন হোত, কোনদিন হোত না। যেদিন একেবারে হোত না, সেদিন ঐ ও-পাশের গলির আর এক গরীব আর তার মা চাটি ক'রে চাল দিয়ে যেতো। এমন একদিন নয়, এক সপ্তাহ নয়, এক মাস নয়, এক বছর নয়, এই জায়গার কুঁড়ে ঘরের ছেলেটি যতদিন এণ্ট্রেন্স পাস্ ক'রে বৃত্তি না পেয়েছিল, ততদিন ও-পাশের গলির গরীব গোয়ালার ছেলে আর তা'র মা এদের অন্ন জুটিয়েছিল। আজ এই ঘর, এই ঐশ্বর্য্য, এই সোণারূপা যে করেছে, সে একদিন প্রাণধারণ করেছিল যার অন্নে, তার প্রাণ-বিয়োগে অন্ন যদি তার মুখে একদিন না-ই রোচে পরেশ, তাকে কি তুমি বাড়াবাড়ি বলতে পারো?

সমস্ত ঘরখানা যেন ভূমিকম্পে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। টানাপাখা যেন থামিয়া গিয়াছে, ঘরে অসহ্য গুমোট্, আলোগুলি যেন সহসা নিবিয়া গিয়াছে, ঘর অন্ধকার!

কর্ত্তা আবার দাঁড়াইয়া উঠিলেন, গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওঁরা বড়-লোকের রায় বাহাদুরের ছেলে-বৌ, ওঁদের কথা স্বতন্ত্র, তুমি কি আমার সঙ্গে যোগীনের বাড়ী যাবে?

গৃহিণী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন—যাব বৈ কি! চল।

বৌ-মারা শ্বশুরের পায়ের উপর বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলেন, বাবা, আমাদের আপনি পর ভাবছেন কেন? আমরাও যাব আপনার সঙ্গে।

নাতি সুরেশ বলিল—দাদু, আমিও যাব।

"আয় ভাই" বলিয়া কর্ত্তা সুরেশের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন; বলা বাহুল্য, পাঁচমিনিটের মধ্যে ও-পাশের গলির সেই বাড়ীখানি, এ-পাশের অট্টালিকার জনগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গৌরী মৃত পিতার শব জড়াইয়া ধরিয়া আছাড়-বিছাড় করিয়া কাঁদিতেছিল—অত্যধিক বিস্ময় তাহার পিতৃ-শোকেরও গলা টিপিয়া স্তব্ধ করিয়া দিল।

অনামি ও গোধূলি-লগ্ন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীঅরুণরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

[বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দেবীর দৌহিত্র শ্রীমান অরুণরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁহার "অনামি" শীর্ষক সনেটটী তাঁর দাদামশাই রবীন্দ্রনাথকে সংশোধনের জন্য দেখান। সংশোধন-ফলে ভাবটী যদিও এক রহিল— ভাষার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটীর একটী নূতন নাম দিয়া দেন। মূল কবিতাসহ তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। আলোকচিত্র দুইখানি শ্রীমান অরুণরঞ্জন দিয়াছেন।—সম্পাদক]

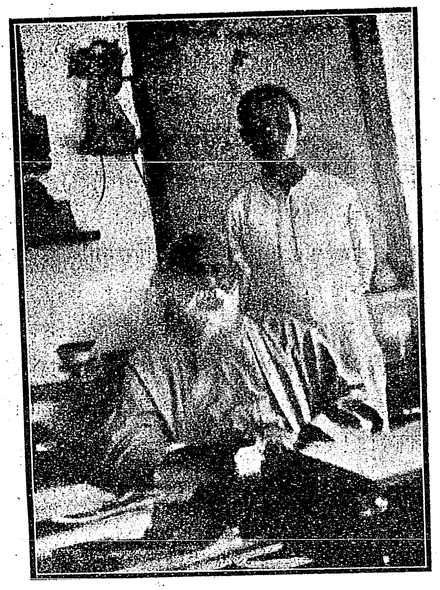

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীমান্ অরুণরঞ্জন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

অনামি

ওই দেখ সন্ধ্যা আসে গগনের কোনে,
ধূসর তিমির-ছায়া মিলাইয়া দেহে।
প্রভাতের দীপ্ত রবি গেছে অবসান,
কী পুলকে কেঁপে উঠে বল্লরী-বিতান।
এইরূপ একদিন জেগেছিলে তুমি
আমার মানস-পটে, হাতে লয়ে তুলি।
তোমার অজানা ছিল হৃদয় আমার,
তবু কিন্তু লয়েছিলে আরতি পূজার।
তারপর একদিন সাথে তব দেখা,
দেখাইলে সেই দিন অসীমের সীমা।
দিলে মোরে সেই দিন তোমার বারতা,
গহন কানন-পথে জ্বালি দীপ-শিখা।
তোমারে বরিব কোথা ভাবিয়া আকুল
হৃদেতে মানসে—কিবা পরাণ ব্যাকুল।

শ্রীঅরুণরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গোধূলি-লগ্ন

ওই সন্ধ্যা আসে, যেন কি শঙ্কা সন্দেহে,
ধূসর উত্তরীখানি আবরিয়া দেহে।

*   *   *   *

এই মত একদিন আলোয় আঁধারে,
এসেছিলে তুমি মোর স্বপনের পারে।
তার আগে মোরে তুমি চিনিতে না কভু,
আমার পূজার মালা নিয়েছিলে তবু।
তারপরে—আজ পথে চলেছিনু একা,
গোধূলিতে তোমা সাথে পুন হ'ল দেখা।
তোমার দখিন হাতে ওই দীপখানি,
নীরবে আমার প্রাণে কি কহিল বাণী।
তারপর হ'তে খুঁজি বন-বীথিকায়,
তোমার আসনখানি পাতিব কোথায়।

২০ মার্চ্চ, ১৯৩১ } জোড়াসাঁকো

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সারনাথ—মূলগন্ধকুঠী-বিহার

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

হিন্দু-ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কাশীধামের অদূরবর্ত্তী সারনাথে সে দিন নব-নির্ম্মিত বিহারের স্থাপনার মহোৎসব। সেই উৎসবের প্রতি ক্ষুদ্র অঙ্গটি পর্য্যন্ত যেন এক অপূর্ব্ব আশা ও আনন্দের প্লাবনে পরিপ্লুত। উৎসবের বহিরঙ্গ যে সুন্দর ছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না; কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত ভাবটি ছিল আরও সুন্দর, আরও উদার, আরও মহান্।

সকলেই সমবেত—ভারতবর্ষ, সিংহল, শ্যাম, বর্ম্মা, চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি বহু দেশের বহু প্রতিনিধি সেই পবিত্র ক্ষেত্রে পবিত্র হৃদয়ের মঙ্গলেচ্ছা লইয়া সম্মিলিত। ভারত-শাসক-সম্প্রদায়ের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের প্রধান পরিচালক রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহনী মহোদয় তক্ষশীলা হইতে আনীত ভূগর্ভে প্রাপ্ত রৌপ্যাধার-নিহিত ভগবান-বুদ্ধের পবিত্র দেহাস্থি যখন মহাবোধি সঙ্ঘের (Mahabodhi Society) সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে উক্ত পবিত্র স্থানে স্থাপনের নিমিত্ত সমর্পণ করিলেন, তখন ভারতের অতীত নাট্যের এক গৌরবময় পুরাতন দৃশ্য যেন সহসা মানস-নেত্রের সম্মুখে উদ্ঘাটিত ও পুনরভিনীত হইল; মনে হইল সেই কথা, যখন সম্রাট্ অশোক মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রকে ভগবান্ বুদ্ধের দেহাস্থি এবং যে পবিত্র মহাবোধিতলে তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের একটি শাখা প্রদান করিয়া শাক্যসিংহের শান্তি ও মৈত্রীর বাণী দেশ-দেশান্তরে প্রচার করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

*   *   *   *   *   *

সারনাথ মিউজিয়মের শস্য-শ্যামল সুন্দর প্রান্তরে সমবেত নরনারীর সম্মুখে, রায় বাহাদুর মহাশয় কিরূপে বুদ্ধের পবিত্র

মূলগন্ধকুটী-বিহার—সারনাথ

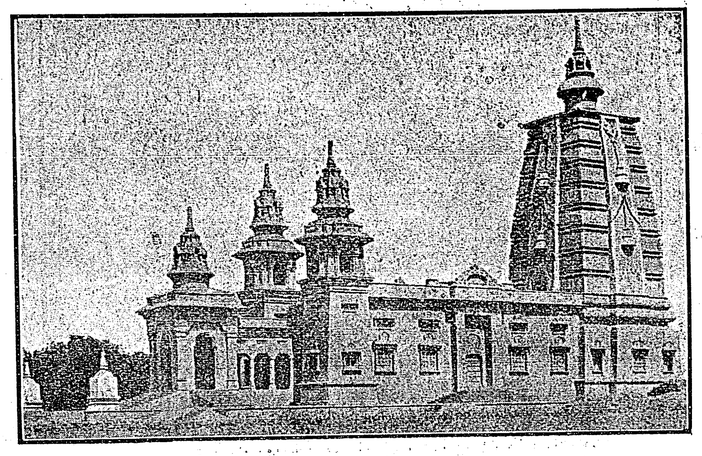

মূলগন্ধকুঠী বিহারের সম্মুখে হস্তীপৃষ্ঠে পবিত্র অস্থি (একটী দৃশ্য)

অস্থি তক্ষশীলায় ভূগর্ভ খননকালে Sir John Marshall পাইয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিলেন ও ভাইস্রয়ের শুভেচ্ছাও সেই সঙ্গে জ্ঞাপন করিলেন। তিনি আরও

বলিলেন যে মহাবোধি সঙ্ঘ (Mahâdodhi Society) যদি তক্ষশীলায় আর একটি বিহার নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে শাসক-সম্প্রদায়ের (Government) সমাহিত করিবার জন্য উক্ত সঙ্ঘের হস্তে সমর্পণ করা হইবে।

মূলগন্ধকুঠী বিহারের সম্মুখে হস্তীপৃষ্ঠে পবিত্র অস্থি (দ্বিতীয় দৃশ্য)

অতঃপর মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় তার পর এক অপূর্ব্ব শোভাযাত্রা বাহির হইল। মিউজিয়ম হইতে বিহারে লইয়া যাইবার জন্য উক্ত নিহিত অস্থি সংরক্ষিত হইল। সেই শোভাযাত্রার সর্ব্বপুরোভাগে তিব্বতীয় বাদ্যকরগণ অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র সহকারে অপূর্ব্ব বাদ্যোদ্যম করিয়া চলিল। তার পর সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম, চীন, জাপান ও নেপাল হইতে আগত বৌদ্ধাচার্য্যগণ, আর ঐ সব দেশের বৌদ্ধ নরনারী তিনবার মন্দির পরিক্রমণ করিবার পর শোভাযাত্রা দণ্ডায়মান হইল ও সেই পবিত্র বুদ্ধাস্থি হস্তীপৃষ্ঠ হইতে নীত ও রৌপ্যাধারসহ বিহার মধ্যস্থ বুদ্ধ-মূর্ত্তির সম্মুখে রক্ষিত হইল। তখন সেই সম্মিলিত ভারতীয় ও অভারতীয় নরনারীর ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠে ও ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রে একতানে একই আত্ম-নিবেদনের পাবন-মন্ত্র ধ্বনিত হইল—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"

অস্থি সংরক্ষণের পর বিহার-প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপ-তলে সিংহলের প্রধান বৌদ্ধাচার্য্যের নেতৃত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হইল। মন্ত্র উচ্চারণের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়,—প্রথমেই ৺অনাগরিক ধর্ম্মপালের অভিভাষণ পঠিত হয়; তৎপরেই রাজা স্যার মতিচাঁদ উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে সম্বর্দ্ধনা জানান। সিংহল হইতে আগত বৌদ্ধগণ পবিত্র ভারতবর্ষের উদ্দেশে তাঁহাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন ও সারনাথে যাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হয়, তন্নিমিত্ত তাঁহাদের সহযোগ দানের আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই সময় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বাণী ও অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রেরিত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ বার্ত্তা সভায় পঠিত হয়।

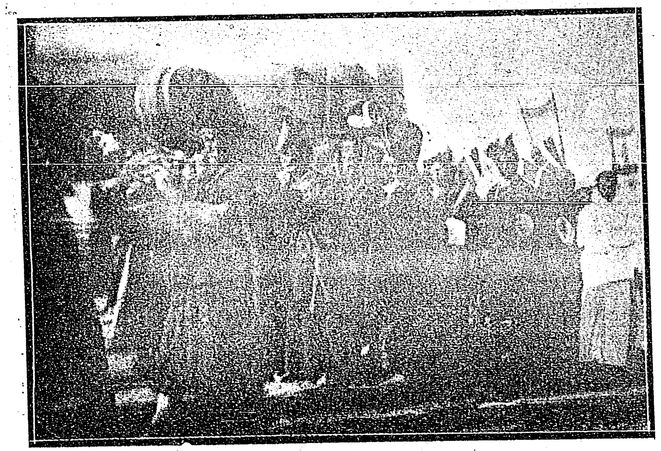

হিমালয়ের বৌদ্ধ বাদকদল

মহাবোধি সঙ্ঘের তরফ হইতে রায় বাহাদুর, ভাইস্‌রয় ও প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগকে ধন্যবাদ দিয়া রৌপ্যাধারনিহিত অস্থি শ্রীযুত অনাগরিক ধর্ম্মপালের ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তে প্রদান করিলেন।

ভারতের সমগ্র হিন্দু-সমাজের মুখপাত্র-স্বরূপ নিখিল হিন্দুমহাসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রতিনিধিগণ এই উৎসবে প্রীতি ও আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। অতীত

ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধাচার্য্যগণ বিশ্বমানবের কল্যাণার্থে আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী ও শান্তির নিমিত্ত যে দুষ্কর সাধনা করিয়াছিলেন তাহা যে ফলপ্রসূ হইয়া রহিয়াছে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল উক্ত উৎসব-সভায় আপামর-হিন্দু-জন-সাধারণের উপস্থিতিতে।

জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পণ্ডিত জহরলাল বলিলেন যে উক্ত কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি বিহারের নিমিত্ত একটি শিল্পকার্য্যখচিত জাতীয় পতাকা প্রদান করিবেন।

সন্ধ্যায় মন্দিরে ত্রিপিঠক পাঠ হইল ও বাজী পোড়ান হইল।

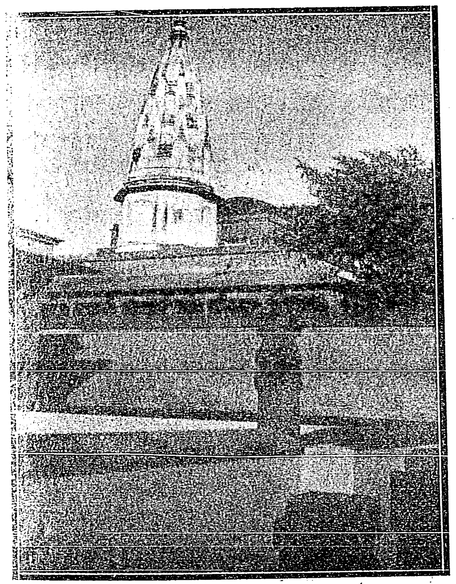

জৈন মন্দির—সারনাথ

পরদিন প্রভাতে শ্রীযুত ধর্ম্মপাল ও রায়বাহাদুর সাহনী সিংহল অনুরাধাপুর হইতে আনীত মহাবোধিবৃক্ষের ২টী ছোট গাছ বিহারে রোপণ করিলেন। এই দিবস অপরাহ্নে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের সভানায়কত্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এক সভা আহূত হয় ও বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে অনেকে অনেক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শেষের দিন বৌদ্ধ শিল্প ও চিত্রকলার একটী প্রদর্শনী খোলা হয় ও দেশবিদেশ হইতে আনীত বৌদ্ধকলার নিদর্শন সমূহ তথায় উপস্থিত করা হয়। জগতে অতুলনীয়, মানবের মনোরাজ্যের চরমোৎকর্ষের পরম-প্রকাশ-স্বরূপ এই বৌদ্ধ-কলার প্রতীকগুলিকে যেন চোখে দেখিয়া ঠিক ধারণা করা যায় না—এগুলি যেন অতিমানুষের সৃষ্টি। এগুলি ধ্যানের বস্তু; স্থূল বুদ্ধির আবেষ্টনীর মধ্যে ইহাদের বাঁধিতে গেলে যেন ইহাদের সৌন্দর্য্য ও রস-প্রকাশের মহিমা একেবারেই খর্ব্ব হইয়া পড়ে।

বাঙালী সেই অতীত-গৌরবময় ভারতবর্ষের প্রতি যে কত শ্রদ্ধাবান্, সারনাথের অতীত কীর্ত্তিমালা জানিবার জন্য কত আগ্রহ তাহাদের, তাহা সেদিন কাশীস্থিত আপামর

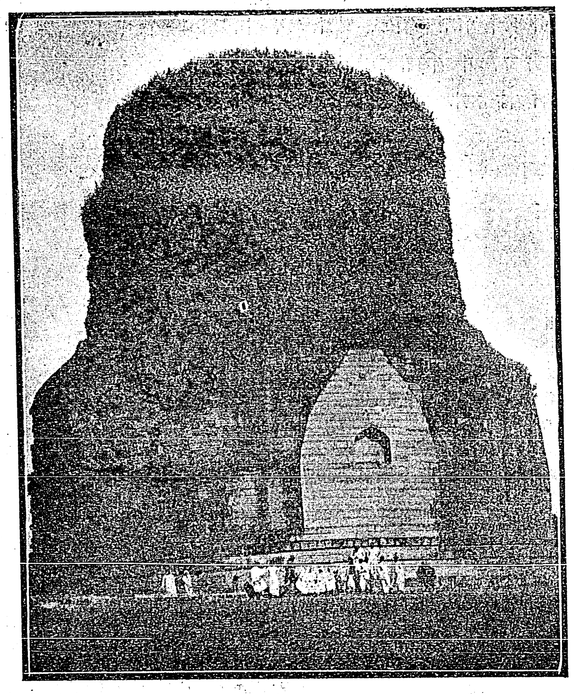

ধামেক স্তূপ—সারনাথ

বাঙালী নরনারীর সারনাথে উপস্থিতিতে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইল। উৎসবের বাহ্য অনুষ্ঠান, মেলা প্রভৃতি বাঙালীকে ততদূর আগ্রহান্বিত করিতে পারে নাই, সারনাথের ঐ ভগ্ন স্তূপ যতদূর করিয়াছে। ভবিষ্যতে কাশীর ন্যায় সারনাথও বাঙালীর নিকট পবিত্র তীর্থস্থান হইবে এরূপ আশা করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অশোভনীয় হইবে না ইহা একপ্রকার নিশ্চয়তার সহিতই বলা যাইতে পারে। এই ঐতিহাসিক ও আন্তর্জ্জাতিক বুদ্ধ-উৎসবকে যে বাঙালী কোন প্রকারেই অবজ্ঞা করে নাই, ইহা তাহার পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই।

ভাস্কর

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

বৈদিক ঋষি পূজিল তোমারে তোমার নয়নে নয়ন রাখি
অর্য্যমা, পূষা, ঊষাপতি ভাস্কর,
তব তেজোমাঝে ভর্গেরে বুঝি হেরিল তাদের মনের আঁখি,
শ্রুতির সূক্তে সেই ধ্যান ভাস্বর।
ত্রেতা যুগে এলো নৃপতির ধারা, তব নাম তারা করিল পুঁজি,
শরীরী করিয়া গড়িয়া তোমায় ভাবিল পিতৃপুরুষ বুঝি,
রথধ্বজায় তোমার প্রতীক বর্ণছটায় আঁকিল তারা ;
জয় হুঙ্কারে কম্পিল অম্বর,
যত তারকার বংশ্যগণেরে শাসিল গর্ব্বে আত্মহারা।
তুমি শুধু তায় হেসেছিলে দিবাকর।

তার পর এলো সৌরপন্থী তোমারে ভাবিল ব্রহ্মময়,
তোমার পূজাই সকল পূজার সার,
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সাথে যুঝিয়া তাহারা লভিল জয়,
কভু পরাজয়ে বহিল লজ্জা-ভার।
বিজয়-মত্ত সৌর ভূপতি রাজকোষ তার শূন্য করি'
সিন্ধুর তীরে তব মন্দির গড়িল দ্বাদশ বর্ষ ধরি'
শত ভাস্কর দুষ্কর ব্রতে কলা-চাতুর্য্যে বিমণ্ডিত
করিল যতনে শোভামণ্ডল তার,
কোটি ভক্তের জয়ধ্বনিতে হ'লো ব্যোমলোক আন্দোলিত।
ভাস্কর তুমি হেসেছিলে একবার।

জ্যোতির্ব্বিদেরা, জ্যোতির্ব্রহ্ম আরাধিল তোমা আরেক রূপে
বহাইল দেশে নবতন্ত্রের ধারা,
নবগ্রহের তুমি নিয়ন্তা, ভয়ে সম্ভ্রমে গ্রহের ভূপে
স্বস্তি বচনে কত না পূজিল তারা।

সব শেষে এলো জড়বিজ্ঞান ধ্রুবস্বরূপ জেনেছে বলে,
একচোখে চায় তোমা পানে রবি, তুমি হাস তায় কৌতূহলে।
কেহ আর তব দেউল গড়ে না, সৌরতন্ত্র লুপ্ত ক্রমে,
পূজার ঘটার পর্ব্ব হয়েছে সারা।
স্নানশেষে শুধু পল্লীবাসীরা একবার শুধু তোমারে নমে,
পাঁজির পাতায় হইয়াছ তুমি হারা।

আজি নাই সেই বেদের ঋষিরা, নাই কোণার্ক সৌররাজ ;
কোথা শিল্পীরা—তাঁহার আজ্ঞাবহ ?
রণপতাকায় চিত্রিল তোমা যারা, তারা হায় কোথায় আজ ?
আজি তুমি নও কারো দূর পিতামহ।
মানুষের এই পূজা-পূজা খেলা হেরি বিচিত্র, প্রদোষে প্রাতে
যুগ যুগ হ'তে সমান হাসিই হাসিয়া চলেছ উপেক্ষাতে।
মধ্যদিনের ভ্রূকুটি তোমার কেন তাহা হায় কেই বা বোঝে !
কৃপায় কৃপণ তুমি যে কখন নহ,
রবির রবিরে যাহারা নিত্য বিম্বের প্রতিবিম্বে খোঁজে,
তাদের মূঢ়তা তাও তুমি রবি সহ।

মানবোদয়ের আগে হ'তে তব নিত্য সেবার যে আয়োজন
হয়নি বিতথ তার তিল-পরিমাণ,
গিরিচূড়া তোমা বরিছে নিত্য, তোমার আপন চারণগণ
সাঁজে ভোরে গায় নীড়ে-নীড়ে জয়গান।
যুগ যুগ হ'তে মেঘেরা অরুণ কেতন ওড়ায় তোমার রথে,
সমানই নিত্য ঊষসী সন্ধ্যা সিঁদূর ছড়ায় তোমার পথে,
চিরদিনই সেই সূর্য্যমুখীরা তোমা পানে চেয়ে ব্রতটি পালে
কাল-পারাবার করায় তোমায় স্নান,
বসুধার শিরে হৈম আশিস্ পাণি সহস্র সমানই ঢালে
যুগ যুগ হ'তে হে রবি, বিবস্বান্।

বন্ধুর পথে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION

আগন্তুক

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

ড্রেসিং-আয়নার সাম্‌নে বসে' প্রসিদ্ধ নাট্যকার সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী চুল আঁচ্‌ড়াতে আঁচ্‌ড়াতে গুন্‌গুন্ করে' গান কর্‌ছিলো। এমন নয় যে সে গান কর্‌তে পারে; তবে মনটা অতিরিক্ত রকম প্রফুল্ল থাক্‌লে কে-ই বা গুন্‌গুন্ না করে? সূর্য্যকুমারো কর্‌ছিলো।

কারণ, আজ্‌কে তা'র চতুর্থ নাটকের প্রথম অভিনয়-রাত্রি। রিহার্সেল থেকে বিচার কর্‌তে গেলে, এ নাটকটি দর্শকদের খুব শক্ত ক'রেই ধর্‌বে। আর এম্‌নিও—বিজ্ঞাপনের জোরে কাল্‌কের মধ্যেই বেশির ভাগ টিকিট বিক্রি হ'য়ে গেছে। তা'র নামের জোরেও যে খানিকটা না হয়েছে, তা নয়। তা'র বয়েস এখনো তিরিশ হয় নি, কিন্তু ইতিমধ্যে সে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও সম্মান অর্জ্জন করেছে। অলক্ষিত রাস্তায় বেরুনো তা'র পক্ষে মুস্কিল। শেষ যবনিকা-পাতের পর প্রথম রাত্রির দর্শকরা তা'কে দেখ্‌বার জন্য চঞ্চল হ'য়ে ওঠে—রঙ্গমঞ্চে তা'কে এসে দাঁড়াতে হয়, কিছু বল্‌তেও হয়। আজ্‌কেও হ'বে। আর এক ঘণ্টার মধ্যে অভিনয়ের সুরু—তায় তা'র আবার একটু আগেই পৌঁছতে হ'বে; কতগুলো জিনিষ বহুবার রিহার্সেল-দে'য়া-থাকা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্ত্তে একবার বলে' দে'য়া দরকার। তাই, হাতে একটু সময় রেখেই বেরুবার জন্য সে তৈরি হচ্ছে; সজ্জা সমাপন করে' চুল আঁচ্‌ড়াতে আঁচ্‌ড়াতে গুন্‌গুন্ কর্‌ছে। যেমন, মন অতিরিক্ত রকম প্রফুল্ল থাক্‌লে, সবাই করে।

চুলের ব্রাশটা আবার গেলো কোথায়? টেবিলটা একবার হাৎড়ে সে ড্রয়ার টান্‌লে -কে যে কোথায় সব জিনিষ ফেলে রাখে! কে আবার রাখ্‌বে?—যাক্—পাওয়া গেছে ব্রাশ। এক ধাক্কায় ড্রয়ারটা ঠেলে দিয়ে সে মুখ তুলে' আয়নায় তাকালো; কিন্তু ব্রাশ-সুদ্ধ তা'র হাত ঠিক মাথার কাছে এসে আট্‌কে রইলো—চুলের ওপর আর নাব্‌তে পার্‌লো না।

আয়নার মধ্যে এক নারী-মূর্ত্তির ছায়া। ঠিক তা'র পেছনে।

পরে সে মনে ক'রে দেখেছিলো, চুলের ব্রাশটাকে হাত থেকে টেবিলের ওপর নাবিয়ে রাখ্‌তে তা'র রীতিমত সচেতন চেষ্টা কর্‌তে হয়েছিলো। যেমন, জ্বরের ঘোরে বিকার যখন আস্‌তে থাকে, সবল মন তা'কে প্রাণপণ চেষ্টায় ঠেকিয়ে রাখে। শুধু তা-ই নয়, চেয়ার ছেড়ে সে উঠ্‌লো, এবং ফিরে' আগন্তুকের মুখোমুখি দাঁড়ালো। প্রত্যেকটি কাজ কর্‌তে যেন তা'র এক-এক বছর আয়ুক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে।

শেষটায় সে কথাও বল্‌লে। মনে হ'ল, মাঝখানে যেন অনেকখানি সময় কেটে গেছে।

বল্‌লে, 'তুমি?'

নিজের কণ্ঠস্বর শোন্‌বার সঙ্গে-সঙ্গে সে যেন তা'র নিজত্বে ফিরে' এলো। বিস্ময়ের স্তব্ধ নিস্তরঙ্গতার বুকে লাগ্‌লো শব্দের ঢিল; মূঢ়তা গেলো কেটে।

অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিকভাবে সে আবার বল্‌লে, 'তুমি? হঠাৎ?'

'এলাম।' শুধু এ-ই হ'ল উত্তর। অত্যন্ত চাপা গলা—যেন কথা বল্‌তে কষ্ট হচ্ছে, যেন মেয়েটি ভালো করে' নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পার্‌ছে না।

সূর্য্যকুমারো তা লক্ষ্য কর্‌লে। ভালো করে' তা'র অতিথির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে—অত্যন্ত ম্লান মুখ। যেন দীর্ঘ অসুখ থেকে উঠেছে।

শোবার ঘরে আর কোনো আস্‌বাব ছিলো না; সূর্য্যকুমার তা'র বিছানার দিকে হাত বাড়িয়ে বল্‌লে, 'বোসো।'

'না, বস্‌বো না; এবার আমি যাই।'

'এসেই চলে' যাবে? এতদিন পর কি এরি জন্যে এসেছিলে?"

'তোমাকে একবার দেখ্‌তে এসেছিলাম।'

'দেখ্‌তে এসেছিলে? তা হ'লে একটু বোসো—আরো-একটু ভ্যাখো। একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই কি দেখা শেষ হ'য়ে যায়?'

'তুমি হয়-তো কোনো কাজে বেরুচ্ছিলে—আমি থাক্‌লে তা'র ব্যাঘাত হ'বে না তো?'

'হ'লই বা। এ-পর্য্যন্ত অনেক কাজ করেছি; কাজের কখনো ব্যাঘাত ঘট্‌তে দিই নি। আজ্‌কে—এতদিন পর—তুমি এসে না হয় একটু ব্যাঘাতই কর্‌লে।'

'তোমার কোনো ক্ষতি হ'বে না তো?'

'কেন ও-সব কথা বল্‌ছো, কঙ্কা?'

'আবার।'

'কী আবার?'

'আবার ডাকো—আমার নাম নিয়ে।'

'কী যে পাগ্‌লামি করো।—বোসো।'

'না—ডাকো না তুমি। তার পর বস্‌ছি।'

'কঙ্কা, তোমার নাম নিয়ে আমি কবিতা তৈরি কর্‌বো।'

'না—না; কবিতা নয়, কবিতা নয়; তুমি বলো—মুখে বলো।'

'কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কা।'

গভীর তৃপ্তি মেয়েটির ম্লান মুখে পলকের জন্য একটু আলো ছিটিয়ে দিয়ে গেলো। ধীরে-ধীরে সে বিছানার একপ্রান্তে আল্‌গোছে বস্‌লো। সূর্য্যকুমারও তা'র চেয়ারটি একটু এগিয়ে এনে বস্‌লো। খানিকক্ষণ কাট্‌লো চুপচাপ।

এবার কঙ্কাই আগে কথা বল্‌লে, 'অমন করে' আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকো না তুমি।'

সূর্য্যকুমার চোখ সরিয়ে নিলে। একটু পরে আলাপ আরম্ভ কর্‌লে, 'কোথায় উঠেছো তুমি?'

কঙ্কা যেন কিছু বুঝ্‌তে না পেরে বল্‌লে, 'উঠেছি? কোথায় আবার উঠ্‌বো?'

সূর্য্যকুমার একটু অপ্রস্তুতই হ'য়ে গেলো। জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'তুমি—তুমি কি এই আসছো?'

'কোথায়?'

'এখানে—কল্‌কাতায়।'

'তা নয় তো কী? এইমাত্র এলাম।'

'তোমার জিনিষপত্তর কোথায়?'

'জিনিষপত্তর কিছু আনি নি।'

'আনো নি? কিচ্ছু নয়?'

'না, কিছুই নয়।'

মনে-মনে সূর্য্যকুমার একটু চিন্তিতই হ'য়ে পড়্‌লো। বলা নেই, কওয়া নেই, দীর্ঘ চার বছর—না, পাঁচ বছর?—পাঁচ বছর পর—এই মেয়ে, যা'র জন্য কোনো-এক সময়ে রাতের পর রাত সে ঘুমোতে পারে নি—এই মেয়ে হঠাৎ আজ সন্ধ্যেবেলায় তা'র কাছে এসে উপস্থিত—সঙ্গে ওর দ্বিতীয় বস্ত্র নেই। এর মানে কী? কী? কী? সূর্য্যকুমার যতই ভাব্‌তে লাগ্‌লো, ততই তা'র মন শুধু একটা জিনিষের প্রতিই ইঙ্গিত কর্‌তে লাগ্‌লো। এ ছাড়া এর অন্য মানে হ'তে পারে না।

সে জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'সঙ্গে কে এসেছে?'

'কেউ নয়।'

'এত দূরের পথ একা এসেছো?'

'হ্যাঁ, একাই এসেছি।'

একটু চুপচাপ।

'তুমি—তুমি যে চলে' এসেছো, তা—তা ওখানে সবাই জানে?'

'হ্যাঁ, সবাই জানে।'

'জানে?'

'জানে।'

'তোমার ছেলে—আর তোমার মেয়ে—ওরা?'

'তা'দেরও রেখে এসেছি।'

একটু সময় সূর্য্যকুমার বল্‌বার মত কোনো কথা খুঁজে পেলো না। তার পর: 'ওরা তো বেশ বড় হয়েছে এতদিনে?'

'তবু—আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে প্রথমটায় ওদের একটু কষ্ট হ'বে বই কি। অবিশ্যি দু'দিনেই স'য়ে যাবে।'

এ-কথা শুনে' মাথা নীচু করে' দু' হাতে মুখ ঢেকে সূর্য্যকুমার ভাব্‌তে লাগ্‌লো। প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌লো, খুব দ্রুতবেগে, খুব পরিষ্কার করে' চিন্তা কর্‌তে। তার পর মুখ তুলে' কঙ্কার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌লে, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে পারি?'

'বলো।'

'তুমি কি এখানে থাক্‌তে এসেছো?'

প্রশ্ন শুনে' কঙ্কা একটু হাস্‌লো। ঘরে ঢুকে' অবধি এই তা'র প্রথম হাসি। বল্‌লে, 'আমি শুধু তোমাকে একবার দেখ্‌তে এসেছিলাম, এখনি চলে' যাবো মনে করে'। তবে, থেকেও অবিশ্যি যেতে পারি—যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে।'

সূর্য্যকুমার কোনো কথা বল্‌লে না; বল্‌তে পার্‌লে না। তা'র বুকের ভেতর তুমুল তোলপাড় চল্‌ছিলো।

কঙ্কাই আবার কথা বল্‌লে: 'একদিন—মানে, এক রাত্রে—মনে আছে তোমার?—তুমি আমাকে ধরে' রাখ্‌তে চেয়েছিলে—আমি নিজকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে' গেলাম—'

সূর্য্যকুমার রুদ্ধস্বরে বলে' উঠ্‌লো: 'থাক্—বোলো না, ও-সব কথা বোলো না।'

—'শোনোই না। যাবার সময় আমি বলে' গিয়েছিলাম, "আবার আস্‌বো।" তুমি হয় তো সারা রাত জেগে আমার অপেক্ষা করেছিলে।—'

কঙ্কার কথা সূর্য্যকুমার স্পষ্ট করে' শুন্‌তে পাচ্ছিলো না। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তা'র বুকের ওপর হাতুড়ির বাড়ি পড়্‌ছে।

'—তখন আমি আমার কথা রাখ্‌তে পারি নি। আজ—এতদিন পর পার্‌লাম, আমার সেই কথা রাখ্‌তে পার্‌লাম। আজ আমি আবার এলাম, সূর্য্য।'

সূর্য্যকুমার টের পেলো, তা'র চোখ জলে ভরে' উঠেছে। সে তা লুকোবার চেষ্টা না করে' দু' হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে খানিকটা কেঁদে নিলে। তা'র মন একটু যেন হাল্‌কা বোধ হ'ল।

আলাপটাকে একটু সাংসারিক স্তরে নাবিয়ে আন্‌বার আশায় সে বল্‌লে, 'এত লম্বা জার্নির পর তুমি খুব ক্লান্ত নিশ্চয়ই?'

'না, ক্লান্ত নই, মোটেও ক্লান্ত নই।'

'পথে তোমার কোনোরকম কষ্ট হয় নি তো?'

'তা কষ্ট একটু হয়েছিলো বই কি।'

'তা হ'লে তুমি এখন কিছু খেয়ে নিয়ে বরং একটু বিশ্রাম করো—ঘুমিয়ে নাও। স্নানের জন্য গরম জল দরকার? তুমি পর্‌বেই বা কী? আমার বাড়িতে তো শাড়ি টাড়ি—'

'ব্যস্ত হোয়ো না তুমি;—স্নান কি খাওয়া কি ঘুম কিছুরি আমার দরকার নেই।'

'না—না, সে কী হয়? কিছু না খেলে অন্তত চল্‌বে কেন? চা? বরং এক পেয়ালা গরম দুধ খাও—ঘরে ফল-টল বোধ হয় কিছু আছে।'

'আমি তোমাকে বল্‌ছি, এখন আমার কিছুরি দরকার নেই—সত্যি নেই। তুমি শান্ত হ'য়ে বোসো—গল্প করো।'

'গল্প তুমি যত চাও কর্‌বো—কিন্তু একটু দুধ অন্তত তুমি খেয়ে নাও। তোমাকে ভারি শুক্‌নো দেখাচ্ছে।'

সূর্য্যকুমার উঠ্‌তে যাচ্ছিলো; কঙ্কা অল্প একটু হাত তুলে' তা'কে বাধা দিলে।—'আচ্ছা, সে পরে হ'বে'খন—এখন তুমি বোসো। এই তো সবে এলাম—এত তাড়া কিসের?'

ঘর অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ছিলো। 'আলোটা জ্বালিয়ে দেবো?' সূর্য্যকুমার জিজ্ঞেস কর্‌লে।

'না-ই বা দিলে। বেশ আছে।'

'তোমাকে অত্যন্ত ম্লান দেখ্‌ছি, কঙ্কা। তোমার কি শীগ্‌গির কোনো অসুখ করেছিলো?'

'হ্যাঁ, অসুখ করেছিলো।'

'খুব কঠিন অসুখ?'

'লোকে তা'কে কঠিনই বলে।'

'এখন ভালো আছ তো?'

হ্যাঁ, ভালো আছি, খুবই ভালো আছি। এখন আর কোনো অসুখ নেই।'

'তুমি অমন চুপচাপ ঘরে এসে ঢুকেছিলে—'

'খুব চম্‌কে উঠেছিলে—না? নীচে কাউকে দেখলাম না, তাই সোজা ওপরে উঠে' এলাম।'

'কা'কেই বা আর দেখ্‌বে।'

'একেবারে একা আছো। কখনো-কখনো খারাপ লাগে না?'

'অভ্যেস হ'য়ে গেছে।'—হঠাৎ সূর্য্যকুমারের একটা কথা মনে পড়্‌লো: 'তুমি আমার ঠিকানা পেলে কোথায়?'

'তোমার মত একজন প্রসিদ্ধ লোকের ঠিকানা জোগাড় করা আর মুস্কিল কী।'

'তোমার মুখে ও-কথা ঠাট্টার মত শোনালো, কঙ্কা।'

'না-হয় কর্‌লামই একটু ঠাট্টা।'

'কর্‌তেই পারো।'

'তোমাকে এ-ক' বছরে আমি একখানাও চিঠি লিখ্‌তে পারি নি।. এত কম সময়—'

'বুঝি, আমি সবি বুঝি। তোমাকে বল্‌তে হ'বে না।'

'তোমার সেই শেষ চিঠি আমি পেয়েছিলাম। যা'তে তুমি লিখেছিলে—'তোমার হাতের লেখা দেখ্‌তেও আমার ভালো লাগে।' সত্যি কথা ?'

'কোন্‌টা ?'

'আমার হাতের লেখা দেখ্‌তেও তোমার ভালো লাগে ? সত্যি ?—বলো না !'

'হ্যাঁ, লাগে।'

'তুমি কি সত্যি আমার চিঠি পেতে আশা কর্‌তে ?'

'সত্যি বল্‌তে, আমি কখনো আশা করি নি যে তুমি আমাকে চিঠি লিখ্‌বে।'

'তোমাকে একখানা চিঠি কিন্তু লিখেছিলাম।'

'কবে ?'

'এই তো—চলে' আস্‌বার ঠিক আগে। পাও নি ?'

'না তো।'

'বোধ হয় কোনো কারণে ডাকে দেরি হচ্ছে।'

'চিঠি দিয়ে আর কী হ'বে ? তুমিই তো এলে।'

''হ্যাঁ, আমি এলাম। আমার কথা আমি রাখ্‌লাম, সূর্য্য।'

'কিন্তু বলো—বলো এবার আর তুমি চলে' যাবে না ?

'চলে' কখনোই যাবো না—এ-কথা কি জোর করে' বলা যায় ?'

'না—না, এবার আর তোমাকে চলে' যেতে দেবো না—কিছুতেই নয়। কতবার যে তুমি কাছে এসেই চলে' গিয়েছো—ফিরে' এসেছো শুধু আবার চলে' যাবার জন্য ; সে-কষ্ট—সে-কষ্ট মৃত্যু-যন্ত্রণার মত।'

'না—না ; তাকে মৃত্যু-যন্ত্রণা বলে না। মৃত্যু-যন্ত্রণা কাকে বলে, শুন্‌বে ?'

'আমি জানি ; তা ভালো করে'ই জানি।'

'তা নয়, তা নয়। শোনো—আবার যে খুব কঠিন অসুখ করে না ?—'

'হ্যাঁ, বলো।'

'ভয়ানক অসুখ। একটানা চার মাস বিছানায় শুয়ে' ছিলাম। পেটের নাড়ি-ভূড়িতে কী-সব গোলমাল—ডাক্তাররা কেটে-কুটে আর কিছু রাখে নি।'

'যাক্‌—ভালো যে হ'য়ে উঠেছো—'

'শোনোই। একদিন হ'ল কী—এই তো সেদিন—চারজন ডাক্তার মিলে' কী যেন একটা অপারেশন কর্‌লে—সে নাকি ভয়ানক একটা শক্ত ব্যাপার। কী কর্‌লে ওরা ছুরি-কাঁচি নিয়ে ওরাই জানে—ক্লোরোফর্ম থেকে জেগে উঠে' মনে হ'ল, এইবার ভালো হ'য়ে উঠ্‌বো। ভেতর থেকে কেউ যেন বল্‌তে লাগ্‌লো, "তুমি ভালো হ'য়ে উঠ্‌বে, ভালো হ'য়ে উঠ্‌বে।" কাকে যেন বল্‌লামও সে-কথা।

'একটু পরে এক মজার ব্যাপার আরম্ভ হ'ল। আমার পা দুটোয় কী-রকম যেন শীত কর্‌তে লাগ্‌লো। একটু জড়োসড়ো হ'তে গিয়ে দেখি, পা আর নড়ে না। এ আবার কী ? শীত এদিকে বেড়েই চলেছে—আস্তে আস্তে হাঁটু অবধি, তার পর কোমর। আমার শরীরের আদ্ধেক যেন পাথর হ'য়ে গেছে। সে-কথা কতবার চীৎকার করে' বল্‌লাম—ঘর-ভরা লোক—কেউ শুন্‌লে না, কেউ শুন্‌লে না। ইসারা কর্‌তে গেলাম—হাত আর তুল্‌তে পারি নে। তার পর সেই শীত যখন গলার কাছে এলো—কী রকম লাগ্‌লো, জানো ? জানো ? মৃত্যু-যন্ত্রণা কাকে বলে তা আমি জানি, সূর্য্য, তুমি জানো না।'

সূর্য্যকুমার নিঃশব্দে আগাগোড়া শুন্‌লে। তার পর অত্যন্ত শান্তভাবে স্থিরদৃষ্টিতে কঙ্কার দিকে তাকিয়ে রইলো। ঘরের আলো আরো কমে' এসেছিলো ; তবু একটা জিনিষ—এতক্ষণ সে যা লক্ষ্য করে নি—তার নজরে পড়্‌লো। তার স্প্রিঙ্‌এর খাটে স্প্রিঙ্‌-এর ম্যাট্রেস্‌ পাতা—তার ওপর কঙ্কা বসেছে ; কিন্তু সে যেখানটায় বসেছে, তা একটুও নীচু হ'য়ে যায় নি, চাদরটার ভাঁজ একটুও নষ্ট হয় নি—বিছানাটা আগাগোড়া সমান, নিভাঁজ। কঙ্কার শরীরের একেবারেই কোনো ওজন নেই।

কঙ্কার কথা শোনা গেলো : 'আজ্‌কে আর তোমার সময় নষ্ট কর্‌বো না। আর-একদিন না-হয় আস্‌বো।' বলে' কঙ্কা উঠে' দাঁড়ালো।

দৃঢ়পদে সূর্য্যকুমারো উঠে' দাঁড়ালো। কঙ্কার মুখ থেকে পলকের জন্যও সে চোখ সরাবে না—দেখি, সে কেমন করে' মিলিয়ে যায়।

আবার কঙ্কার স্বর শোনা গেলো : 'আমাকে যেতে দাও, সূর্য্য, যেতে দাও। আমাকে নিয়ে তুমি কী কর্‌বে ? কী কর্‌বে ?'

পেছন দিকে হেঁটে কঙ্কা দরজার দিকে যেতে লাগ্‌লো। সঙ্গে-সঙ্গে সূর্য্যকুমারও এগোচ্ছে।

কঙ্কা আবার কথা বল্‌লে : 'কেন তুমি আমাকে ধরে' রাখ্‌তে চাও ? তোমাকে শুধু একবার দেখে গেলাম।'

সূর্য্যকুমার ঝাঁ করে' হাত বাড়িয়ে কঙ্কাকে ধর্‌তে গেলো। তার গলা দিয়ে চীৎকার বেরিয়ে এলো : 'কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কা—।'…

'কী হয়েছে, দাদাবাবু ?'

সূর্য্যকুমার ভালো করে' একবার চারদিকে তাকালো। ঘরে আলো জ্বলেছে। দরজার সাম্‌নে সে দাঁড়িয়ে, আর তার সাম্‌নে ভোলা—তার চাকর।

'কী হয়েছে, দাদাবাবু ?'

'কিছু হয় নি—তুই যা।' ইস্‌—সে ঘামে ভিজে' গেছে একেবারে। 'পাখাটা খুলে' দে তো, ভোলা।'

পাখা খুলে' দিয়ে ভোলা বল্‌লে, 'এইমাত্র একখানা চিঠি এসেছে।'

'রাখ্‌ ওখানে।'

ড্রেসিং-টেবিলের ওপর চিঠিখানা রেখে ভোলা চলে' গেলো। সূর্য্যকুমার আবার সেই চেয়ারটিতেই এসে বস্‌লো।

কী-চিঠি, তা সে জানে। যার হাতের লেখা দেখ্‌তেও তার ভালো লাগে, তারি হাতের লেখা। ও-চিঠি এখন আর না খুল্‌লেও চলে।

তবু সে টেবিল থেকে চিঠিখানা তুলে' নিলে। পেন্সিল দিয়ে অত্যন্ত হিজিবিজি করে' ঠিকানা লেখা ; না জানা থাক্‌লে চট্‌ করে' সে হয়-তো হাতের লেখা চিন্‌তেই পার্‌তো না। টিকিটের ওপর ডাকঘরের ছাপে কাল্‌কের তারিখ।

খাম খুলে' সে চিঠিখানা বা'র কর্‌লে। ওপরে জায়গার নাম বা তারিখ কিছু নেই। মাঝখানে পেন্সিলে দু'লাইন হিজিবিজি লেখা :

'আমার খুব অসুখ। তোমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। একবার আসা কি সম্ভব ?

কঙ্কা।'

আমি আর যেতে পার্‌লাম কই, কঙ্কা—তা'র আগে তুমিই এলে, তুমিই তো এলে।…

ভোলা এসে বল্‌লে, 'থিয়েটার থেকে টেলিফোনে ডাক্‌ছে।'

বাঃ, থিয়েটারের কথা সে একেবারে ভুলে'ই গিয়েছিলো। পাশের ঘরে গিয়ে সূর্য্যকুমার টেলিফোন তুলে' নিলে।

'কে ? ললিতবাবু নাকি ?'

'হ্যাঁ। আপনার এত দেরি যে ?'

'এই—দেরি একটু হ'য়ে গেলো। আরম্ভ হ'য়ে গেছে নাকি ?'

'হ'ল বলে'। আপনার জন্যে অপেক্ষা কর্‌বো ?'

'যদি দয়া করে' করেন—দশ মিনিট। গোড়ার দিকটা আমার দেখা খুব দরকার।'

'আচ্ছা—পনেরো মিনিটই অপেক্ষা কর্‌ছি।'

'অনেক ধন্যবাদ। তা'র আগেই আমি পৌঁছে যাবো।—ও-ঘর থেকে আমার চাদর আর মনিব্যাগ নিয়ে আয় তো, ভোলা। আর শোন্‌—আজকে রাত্তিরে আমি আর বাড়ি ফির্‌বো না।'

লিথুয়েনিয়া

শ্রীভারতকুমার বসু

লিথুয়েনিয়ান্‌দের ইতিহাসখানি ল্যাট্‌ভিয়াবাসীদের ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। উভয়েরই দেশীয় ভাষার মিল আছে অসাধারণ। এমন কি, তাদের বাক্যের মূল এবং ব্যাকরণ-গত শব্দও অভিন্ন। লেটো-লিথুয়েনিয়ান্ ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার অনেকটা ঐক্য আছে। মিস্ ফ্লোরেন্স্ ফার্‌ন্‌বারো বলেন, "The Letto-Lithuanion languages are more closely allied to the Sanskrit of ancient India than any living tongue."—অর্থাৎ, "লেটো-লিথুয়োনিয়ান্ ভাষাগুলি যে-কোনো ভাষার চেয়ে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত ভাষার সঙ্গেই বেশী সম্বন্ধযুক্ত।"

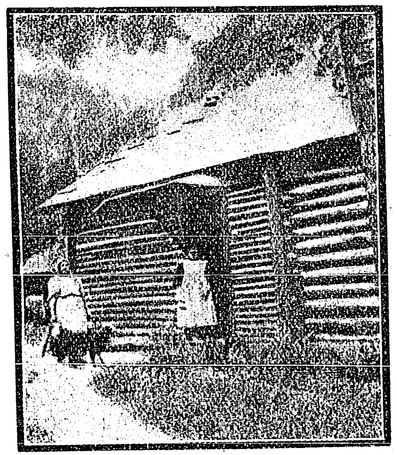

কৃষকের গৃহ

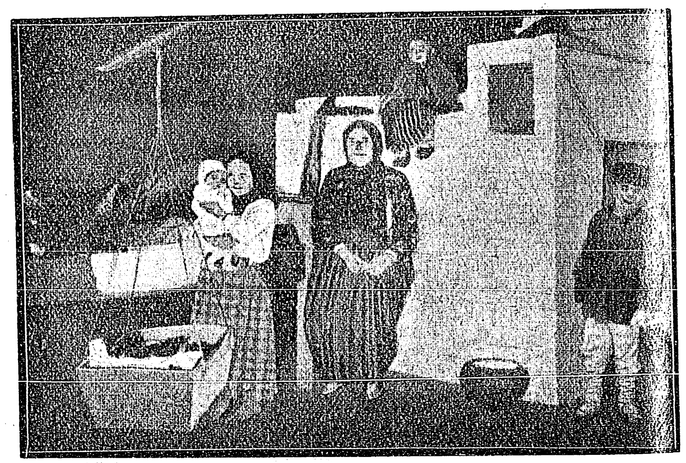

ঘরের ভিতরে আগুনের ঘর। আগুনের ঘরের উপরে ব'সে একটা ছেলে শীত দূর করছে

ফরাসী কলেজের অধ্যাপক মিলেট্ বলেন, "কোনো লোকের মুখ থেকে যদি ইণ্ডো-ইয়োরোপীয় ভাষার প্রতিধ্বনি শুনতে চান, তা হ'লে লিথুয়েনিয়ান্ চাষারা যেখানে গল্প ক'রছে, সেখানে যান।" অনেকে বলেন, ল্যাটিন এবং প্রাচীন গ্রীক ভাষার চেয়েও লেটো-লিথুয়েনিয়ান্ ভাষা হচ্ছে ইয়োরোপের প্রাচীনতর ভাষা।

বিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক ক্যাণ্ট্ ১৮শ শতাব্দীতে প্রুশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দেহে লিথুয়েনিয়ান্ পিতৃপুরুষের রক্ত ছিল। রুহিগ্ সাহেবের "লিথুয়েনিয়ান্ অভিধানের" পরিচয়-পত্রে ক্যাণ্ট লিখেছেন যে, ঐ অভিধানখানিকে যত্নের সঙ্গে রাখা উচিত; কারণ তার দ্বারা লিথুয়েনিয়ানরা শিক্ষায় ও জ্ঞানে উন্নতি লাভ ক'রতে পারবে এবং ভাষা শিক্ষার দ্বারা পৃথিবীর প্রাচীন জাতিগুলির সঙ্গে পত্র ব্যবহারের সুবিধা পাবে।

আগে লিথুয়েনিয়ানরা খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল না। কিন্তু এই ধর্ম্মের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একটা ভীষণ ওলট-পালট হ'য়ে গেল। দ্বাদশ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ড ও রাশিয়া তরবারীর মুখে তাদের খৃষ্টান্ করবার জন্য প্রস্তুত হ'লো। ধর্ম্মের নামে এ-রকম হিংস্র জুলুম লিথুয়েনিয়ান্‌রা সহ্য ক'রতে পারলে না—বিরুদ্ধ-শক্তিকে প্রাণপণে প্রতিরোধ ক'রতে লাগলো।

১২৫২ খৃষ্টাব্দে লিথুয়েনিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউক মিন্‌ডাইগাস্ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ক'রতে রাজী হ'লেন। কিন্তু তার পরই তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাতে দেশে অশান্তি হবে, দাঙ্গা-

হাঙ্গামা হবে এবং লোক ক্ষেপে যাবে। তখন তিনি দেশকে রক্ষা করবার জন্য খৃষ্টান্ শক্তিগুলোকে বাধা দিতে যুদ্ধের আয়োজন ক'রলেন। সে যুদ্ধে তাঁর জয় হ'লো। কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে লিথুয়েনিয়া আশ্চর্য্য ভাবে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি ঝোঁক দিলে, এবং অনেকেই রোম্যান্ ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রলে।

১৩৮৬ সালে লিথুয়েনিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউক জোগেলার সঙ্গে পোল্যাণ্ডের রাণী হেডভিগের বিবাহ হয়। এই বিবাহই উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রীর সম্বন্ধ এনে দিলে। উক্ত বিবাহের পর জোগেলা পোল্যাণ্ডের রাজা হ'লেন। এ-ভাবে লিথুয়েনিয়া কার্য্যতঃ পোল্যাণ্ডেরই শাসনাধীন হ'য়ে গেল। তার ফলে, ১৫৬৯ সালের পরই পোল্যাণ্ড

কুমড়োর ক্ষেত। কুমড়োগুলো এত বড় হয় যে, কোনো কোনোটার ওজন ৪০ থেকে ৮০ পাউণ্ড পর্য্যন্তও হয়।

লিথুয়েনিয়ার প্রতি আর মৈত্রী-ভাব দেখাবার প্রয়োজন বোধ ক'রলে না। পোল্যাণ্ড নিজের প্রভাব জাহির ক'রতে লাগলো। প্রথমেই লিথুয়েনিয়ান্ ভাষার প্রচলন বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লো। দেশে অপ্রীতির একটা ঘোর আন্দোলন উঠলো। বিখ্যাত লিথুয়েনিয়ান্ পণ্ডিত নিকোলাস্ ডাইজা ব'ললেন, "To take away from a nation its own language is equivalent to taking away the sun out of the heavens, to destroying the world-order, to imprisoning the very life and soul of the people."—অর্থাৎ, "জাতির কাছ থেকে জাতির ভাষা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে—আকাশ থেকে সূর্য্যকে তুলে নেওয়া, পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ট

"ইষ্টার"—শোভাযাত্রার আগে আগে পুরোহিত যাচ্ছেন

করা, এবং লোকের জীবন ও আত্মাকে বন্দী করার সমান।"

আপত্তিমূলক আন্দোলন হ'য়ে উঠলো। সকলের চেয়ে ক্ষেপে উঠলো চাষারা। তারা ত বিদ্রোহই সুরু ক'রে দিলে! কিন্তু চাষাদের অবস্থা তখন ক্রীত-

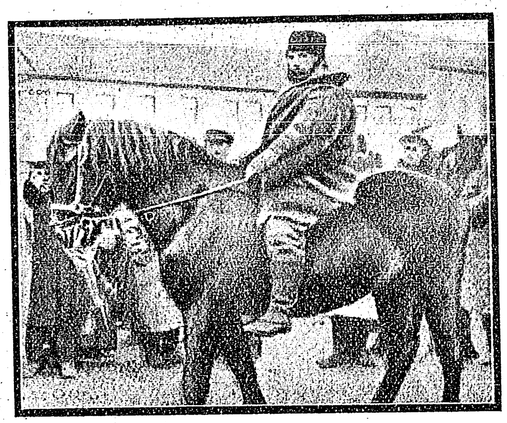

ঘোড়া বিক্রীর জায়গায় ঘোড়ার পরীক্ষা হচ্ছে

দাসের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে ব'ললেই হয়। তাদের সে বিদ্রোহ বেশী দিন টিক্‌লো না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে

এই যে, দেশের অভিজাত-সম্প্রদায় তখন রীতিমত পোল্যাণ্ড-ঘেঁষা হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁর উপর ঘুষ, পক্ষপাতিত্ব-দোষ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি ত ছিলই। কিন্তু পোল্যাণ্ড-পন্থী অভিজাতদের 'স্বজাতিদ্রোহ' মাঠে মারা গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে অন্ত-র্বিপ্লবের দ্বারা পোল্যাণ্ড ধ্বংস হ'য়ে গেল। কাজেই, পোল্যাণ্ড-সংশ্লিষ্ট লিথুয়েনিয়াও পতনোন্মুখ হ'লো। এর সুযোগে প্রায় অধিকাংশ লিথুয়েনিয়াকেই রাশিয়ান্‌রা হস্তগত ক'রলে।

লিথুয়েনিয়ান্ তরুণী

লিথুয়েনিয়ার বাঁকী অল্পাংশ অনেক দিন আগে থেকেই অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই জার্ম্মাণী অধিকার ক'রে-ছিল। যাই হোক, রাশিয়ার শাসনাধীনে এসেই সেখানকার লোকদের দুর্দ্দশা বাড়লো চরম ভাবে। দেশে রুষ নীতির প্রচলন হ'লো এবং উঁচু-নীচু সমস্ত রাজকর্ম্মচারীর পদ-ই রাশিয়ানদের দ্বারা অধিকৃত হ'লো। জমি বাজেয়াপ্ত করা হ'লো, এবং কৃষি-সঙ্ঘগুলিকেও আর মাথা তুলতে দেওয়া হ'লো না। লিথুয়েনিয়ান্ ভাষার প্রচলন ত আগে থাকতেই বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল, এখন দেশীয় ভাষায় গোপনে শিক্ষা দেওয়াও দণ্ডনীয় হ'য়ে গেল। লোকদের দেব-ভক্তি ছাড়াবার জন্য ধর্ম্ম-সংক্রান্ত স্কুল ও সমিতিগুলির দুয়ার বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লো। কিন্তু লিথুয়েনিয়ান্‌দের বুকে সকলের চেয়ে বেশী আঘাত বাজ্‌লো—মুদ্রাযন্ত্র বন্ধ ক'রে দেওয়ায় এবং মুদ্রণ-ব্যাপারে ল্যাটিন অক্ষর ব্যবহার ক'রতে না দেওয়ায়। এই রকম দমন-নীতি চ'লেছিল—পূরো চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত। কিন্তু লিথুয়েনিয়ান্‌রা নিজেদের ভাষায় নিজেদের দেশে বই ছাপাতে না পারলেও, দ'লো না। তারা জার্ম্মাণী ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তাদের বই

ইহুদীর ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ। লিথুয়েনিয়ার ইহুদীরা মুশার (Moses এর) নীতির পক্ষপাতী

ছাপাতে আরম্ভ ক'রলে। ওই সব বই সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে আনা হ'তো। কিন্তু যথেষ্ট সাবধানে আনা হ'লেও, হাজার-হাজার লোক ধরা প'ড়তে লাগলো। সামান্য উপাসনার বই ছাপানোর অপরাধেও তাদের নির্ব্বাসিত করা হ'তে লাগলো সাইবিরিয়ায়।

এক শতাব্দীরও বেশী দিন পর্য্যন্ত লিথুয়েনিয়ান্‌রা রাশিয়ান্‌দের নির্দ্দয় শাসনে নিস্তেজ হ'য়ে ছিল। কিন্তু হাজার নিস্তেজ হ'লেও, পরাধীন জাতি মনে-মনে স্বাধীনতার তেজ-সূর্য্যের বন্দনা ক'রতে ভোলে নি। তাদের শুভ দিন ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল।

রুষো-জাপানের যুদ্ধ সুরু হ'তেই ১৯০৫ সালে লিথুয়েনিয়ান্‌র নব তেজে স্বদেশ-মন্ত্র উচ্চারণ ক'রলে,—"জাগৃহি!" এই সময় থেকেই প্রকৃত পক্ষে তাদের কর্ম্মারম্ভ হয়। তার পর জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয়, এবং বল্‌শেভিক্ বিদ্রোহে "জারে"র বিপদ! লিথুয়েনিয়ান্‌রা এই সব সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দিলে না। তাদের প্রচেষ্টা, অর্থাৎ গঠনমূলক কার্য্য শতগুণ উৎসাহে আত্মপ্রকাশ ক'রলে। শেষে, ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লিথুয়েনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষিত হ'লো।

সেখানকার লোকেরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। কৃষকদের ছোট ছোট বাড়ীগুলি বাগান ও ফুলগাছের বেড়ায় ঘেরা। দেখলেই মনে হবে, বহু শতাব্দীর পর পাওয়া স্বাধীনতার নবীন আনন্দে সেগুলোতে ঝল্‌মল্ ক'রছে। কৃষকের বাড়ীর সম্পত্তির মধ্যে গাভী, মেষ ও শূকর প্রধান। পশু-পালন তাদের অন্যতম ব্যবসা। ক্ষেতের শস্যের মধ্যে বার্লি, যই, গম, শাক-সব্জী ও সরিষার নাম করা যেতে পারে। সেখানকার সরিষাই হচ্ছে প্রধান

কৃষক রমণী

বাড়ীতে বুনে তৈরী করা হয়। অধিকাংশ কৃষকের-ই বাড়ীতে শোবার ঘর থাকে মাত্র একটী। ঐ ঘরখানিকে গরম ক'রে রাখবার জন্য মাঝখানে একটা বড় অগ্নিকুণ্ডলীর

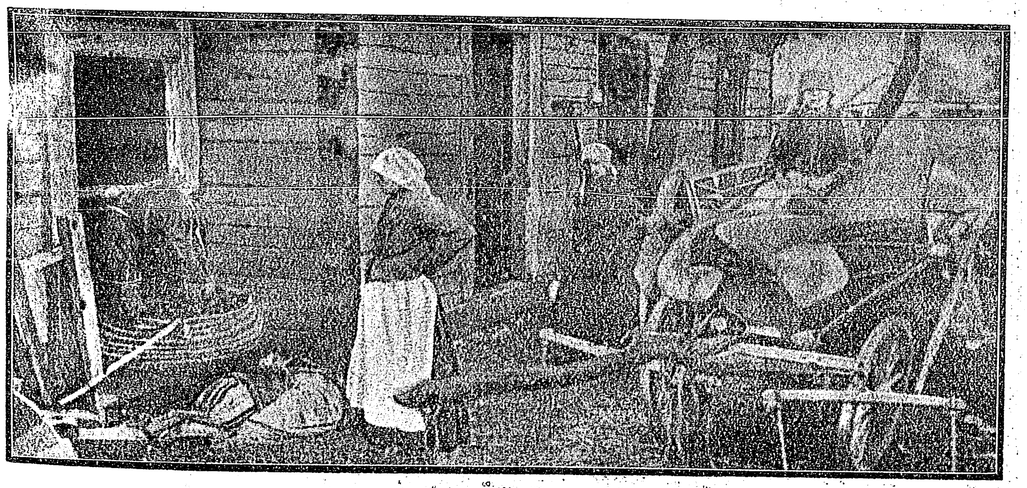

অশ্বের বিশ্রাম

ঘর থাকে। সাধারণতঃ ঐ ঘরের এক কোণে থাকে একটা কাঠের খাটিয়া। শীতের দিনে ঐ খাটিয়ায় শুতে যাবার সময় চাষারা তাদের ভেড়ার চামড়ার জামাকে

চাদরের মতো গায়ে ঢাকা দিয়ে শীত দূর করে। ঘরের মধ্যে থাকে একটা টেবিল, একটা কি দুটো চেয়ার ও

ইহুদীর দোকানে

বেঞ্চি। কড়িকাঠ থেকে একটা দোল্না ঝোলানো থাকে। প্রত্যেক পনেরো মিনিট অন্তর এই দোল্নাটীকে

সৈন্যদের 'ড্রিল্'

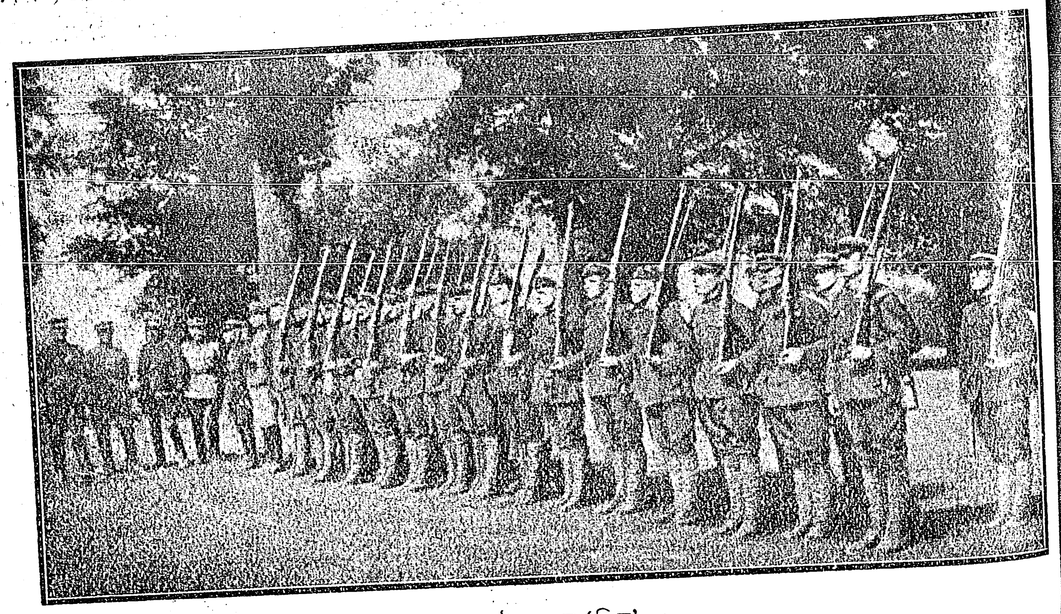

দুলিয়ে দেওয়া হয়। এর কচ্‌কচ্‌ শব্দের দ্বারা প্রকারান্তরে ঘরের মেয়েদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তারা যেন না কাজের সময়ে কুঁড়ে কিম্বা অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে। সামান্য একটা মাটীর পাত্র এবং কতকগুলো কাঁসি সেখানকার ব্যবহার্য্য বাসন।

সেখানকার অতি-দরিদ্রের ঘর থেকেও অতিথি কখনো ফিরে যায় না। বাড়ীর চৌকাঠে পা দিলেই অতিথিকে আদর-অভ্যর্থনা করা হয়। অতিথির ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আনা হয় 'রাই' মাখানো রুটি এবং ট'কে যাওয়া দুধ। দুধকে ইচ্ছে ক'রেই টকিয়ে ফেলা হয়। সেই টক দুধ না কি খেতে খুব সুস্বাদু এবং উপকারকও বটে! গ্রীষ্মের সময়ে অতিথিকে দেওয়া হয়—সুগন্ধী সরস ফল, কিম্বা, রান্না-করা উৎকৃষ্ট 'ব্যাঙের ছাতা' (mushrooms)। 'ব্যাঙের ছাতা'র সেখানে আদর খুব!

লিথুয়েনিয়ার প্রায় এক-চতুর্থাংশ স্থান দখল ক'রে আছে—বহু শতাব্দীর পুরোনো জঙ্গল। আজ সেখানকার এক এক স্থানে জঙ্গল এত নিবিড় যে, ঠিক অষ্টা... শতাব্দীর মতো এখনো তা দুর্ভেদ্য ও দুর্গম হ'য়ে আছে।

এর একমাত্র কারণ, স্বাধীনতা পাবার পর লিথুয়েনিয়া খুব অল্প সময়ই পেয়েছে, যে সময়ের মধ্যে ওই সব জঙ্গল

লিথুয়েনিয়ান্ সৈন্যদের অভ্যর্থনার জন্য মিলিত জনতা

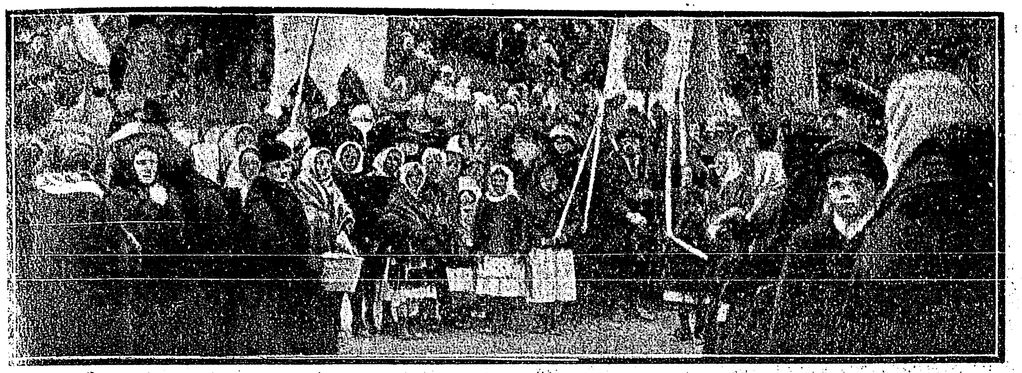

পরিষ্কার হ'তে পারে। লিথুয়েনিয়াকে সারা জীবনটাই ত কেবল দুঃখ কষ্ট, ঝড় ঝাপটা স'য়েই কাটাতে হ'লো!··· বেশী দিন আগেকার কথা নয়, বিগত মহাসমরের সময়ে উৎপীড়িত হতভাগ্য লিথুয়েনিয়ান্‌রা দুর্দ্দশার চরমে পৌঁছেছিল। সে কথা শুনলে বাস্তবিকই বুক ফেটে যায়। মহাসমরের সময়ে লিথুয়েনিয়ার দিকে আক্রমণকারী জার্ম্মানদের কামান প্রথম অগ্নিবর্ষণ ক'রলে। সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণীর সৈন্যদল সীমান্ত দিয়ে এসে, দুধারের নগর গ্রাম পোড়াতে পোড়াতে অগ্রসর হ'লো। এমন কি, শস্যক্ষেত্রগুলিকেও তারা বাদ দিলে না। কৃষি-প্রধান দেশে কৃষকদের অবস্থা হ'য়ে প'ড়লো অত্যন্ত শোচনীয়! প্রায় চার লক্ষ গোলাবাড়ী পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। হাজার-হাজার পরিবার গৃহহারা হ'লো। ধ্বংসের স্তূপে নগর গ্রাম যেন শ্মশানের দৃশ্যে পরিণত হ'লো। ১৯১৫ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসে সমস্ত লিথুয়েনিয়াকে বিধ্বস্ত ক'রে, সেখানকার পূর্ব্ব সীমান্তে জার্ম্মাণ সৈন্যদল তাদের তাঁবু ফেললে। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তারা সেখান থেকে এক পা-ও ন'ড়লো না। জার্ম্মাণ আক্রমণের সময়ে লিথুয়েনিয়ার অনেক লোক প্রাণ বাঁচাবার জন্য পেট্রোগ্রাড ও মস্কোর দিকে পালিয়ে যায়। অনেকে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেয়। কিন্তু কোনো স্থানেই তাদের দুঃখ অভাবের অর্দ্ধেকও দূর হ'লো না। তাদের মধ্যে অনেকেই অনাহারে ও রোগে মারা গেল।···প্রায় আড়াই লক্ষ লোক জন্মভূমির মাটী ত্যাগ ক'রতে বাধ্য হয়।

কিন্তু লিথুয়েনিয়ান্‌দের উৎসাহ অদম্য! তাদের সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য অসাধারণ! দেশের স্বাভাবিক অবস্থা

দোকানদার ও ক্রেতা

TIGHT BINDING.

ফিরে আসতেই, দেশত্যাগী অনেক সন্তান আবার দেশে ফিরে এল। এসেই, সংস্কারের কাজ আরম্ভ ক'রলে। তাদের বুদ্ধি ও একাগ্রতা সত্যই প্রশংসনীয়। এর দ্বারাই তারা, হাজার নির্জীব হ'য়ে প'ড়লেও, দ্বিগুণ তেজে দেশ

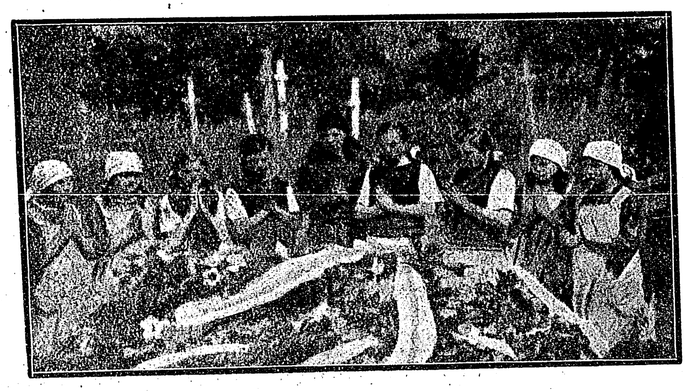

সমাধি-ক্ষেত্রে প্রার্থনা

সংস্কারের মহান দায়িত্ব নিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ ক'রলে না। তারা এক-প্রাণ এক-আত্মা হ'য়ে এক-সঙ্গে যে-কোনো স্বাধীন জাতির মতো, আশায় উদ্দীপ্ত প্রেরণা ও দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজে লেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক

"এরোড্রোমের" একধারে খ-পোত-কর্ম্মচারীরা দূরবীক্ষণের সাহায্যে উড়ো জাহাজের গতি লক্ষ্য ক'রছেন

ফ্যাক্টরী, স্কুল, সঙ্কট-ত্রাণ-কমিটি ও অন্যান্য সমিতি খোলা হ'লো। শত বাধা সত্ত্বেও বিজ্ঞান, কলা, কৃষি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত অনেক জাতীয় প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠলো। এক কথায়, লিথুয়েনিয়ান্‌রা আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য সমস্ত রক্ম ব্যবস্থা ক'রলে। শেষে, মৌখিকভাবে ১৯১৮ সালে তাদের স্বাধীনতা ঘোষিত হ'লো। পরে, ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিথুয়েনিয়া "জাতি-সঙ্ঘের" (League of Nations এর) সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়।

বিগত মহাসমরের আগে সেখানকার লোকদের সমস্ত অধিকারই যে কেড়ে নেওয়া হ'য়েছিল, সে কথা আগেই বলা হ'য়েছে। তখন কি রাজনৈতিক, কি অর্থ-নৈতিক—সমস্ত ব্যাপারেই লিথুয়েনিয়ানদের ঠিক টুঁটি টিপেই রাখা হ'য়েছিল। কাজেই, তাদের মধ্যে অনেকে একান্ত বাধ্য হ'য়েই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে যায়। ওই সব স্থানে তারা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ইত্যাদি বিষয়ে স্বাধীন অধিকার উপভোগ ক'রতে থাকে। আজও গ্রেট্‌ব্রিটেনে, বিশেষভাবে গ্ল্যাস্‌গো ও স্কটল্যাণ্ডে বিভিন্ন স্থানে প্রায় পনেরো হাজার লিথুয়েনিয়ান্ বাস করে। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই তাদের সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী। সেখানে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ লিথুয়েনিয়ান অধিবাসী আছে। এর মধ্যে চিকাগোর ভিতরে, কিম্বা, তার কাছাকাছি জায়গায় বাস করে ৮০ হাজার, এবং নিউইয়র্কে বাস করে ৪০ হাজার।

লিথুয়েনিয়া স্বাধীনতা পাবার পর অনেক প্রবাসী লিথুয়েনিয়ান্ তাদের স্বদেশে ফিরে আসতে আরম্ভ ক'রলে। তারা প্রবাসের আবহাওয়ায় থেকেও মাতৃভাষাকে নির্ব্বাসিত করে নি। তাদের ছেলেমেয়েদের তারা স্বদেশের ভাষাই শিখিয়ে দিয়েছিল। কাজেই, লিথুয়েনিয়ায় ফিরে আসবার পর জাত ভাইদের সঙ্গে আগেকার মতো মিলেমিশে থাকবার বিষয়ে তাদের কোনোই অসুবিধা হয়

না। তারা বিদেশের অভিজ্ঞতায় জাতি-গঠন ও আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষা-প্রণালীর জ্ঞান সঞ্চয় ক'রেছিল যথেষ্ট। দেশভাইদের তারা সেই জ্ঞানের পথ দেখিয়ে দিলে। গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকায় কর্ম্ম-জীবনের যে-সব নূতন নূতন দরকারী পন্থা তারা দেখেছে, তারই সন্ধান তারা স্বজাতির কাছে দিতে লাগলো। তারা বুঝেছিল যে, ইংরেজী শিক্ষাই উন্নতির প্রকৃষ্ট পথ। আজকাল লিথুয়েনিয়ায় তাই ইংরেজী ভাষা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হ'য়েছে।

স্বাধীনতা পাবার পর থেকে লিথুয়েনিয়ার উপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা চ'লে গেছে; কারণ, একটা বিপদ আসতে না আসতেই আর-একটা বিপদ এসে উপস্থিত হ'তো। কাজেই, দেশ-সংস্কারের গুরুতর কার্য্যটীকে আর কিছুতেই শেষ ক'রতে পারা যাচ্ছিল না। ক্রমে সমস্ত বাধা-বিপত্তির ইতি হয়। আজকাল লিথুয়েনিয়া অনেক বিষয়েই প্রশংসা পাবার যোগ্য।

সেখানকার লোকেরা নীলচক্ষু, দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ এবং স্বভাবতই স্বাস্থ্যবান। তারা কঠোর পরিশ্রম ক'রতে পারে। মিতব্যয় এবং সঞ্চয়শীলতা গুণ তাদের আছে প্রচুর। সেখানকার সমবায়-পদ্ধতি খুবই উন্নতি ক'রেছে। ওই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছে—পরস্পরকে অর্থনৈতিক সাহায্য করা। চাষের ব্যাপারেও ওই সমবায়ের একটা কর্ত্তব্য আছে। তাকে বলা হয় "তাল্‌কা"। বছরের মধ্যে মাঝে

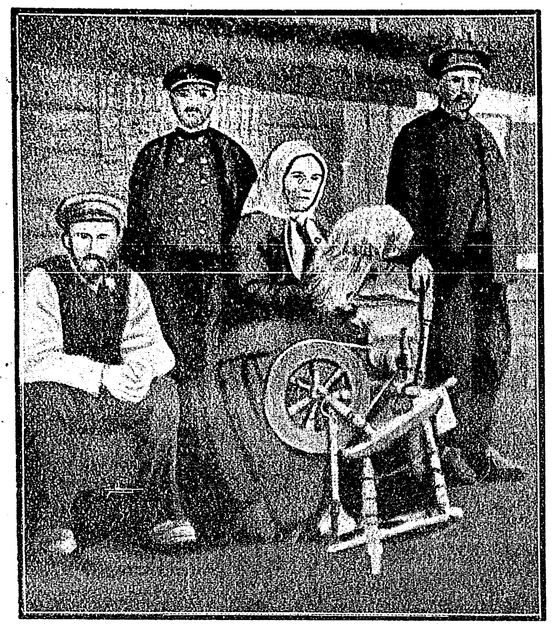

গরীবের ঘরে চরকার পূজা

মাঝে বিভিন্ন পল্লী-প্রদেশে "তাল্‌কা"র দ্বারা অনেক শ্রমিককে কাজে লাগানো হয়। ওই সব শ্রমিক ক্ষেত চাষ করে, বীজ বপন করে এবং কাঠের গুঁড়ি চালান করে। কিন্তু সমবায়-সমিতি তাদের পারিশ্রমিক দেন না। গ্রামের প্রত্যেক লোককেই নৈতিক কৃতজ্ঞতায় চাঁদা তুলে ওই সব শ্রমিককে তাদের পারিশ্রমিক দেওয়াই সেখানকার নিয়ম।

লিথুয়েনিয়ার বীর সন্তান

সেখানকার যে-কোনো জন-সভায় গিয়ে দাঁড়ালেই, যে-জিনিষটী সকলের আগে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রবে, তা হচ্ছে—লোকদের বসনের বৈশিষ্ট্য। আজও কোনো কোনো জেলায় কোনো বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মেয়েরা

তাদের পিতৃপুরুষের আমলের পোষাক ব্যবহার ক'রে থাকেন। মেমেল্‌দেশের চারিপার্শ্বস্থ স্থানে ওই ধরণের পোষাক-পরিহিতাদের বাস্তবিকই সুন্দরী দেখায়, সন্দেহ

অনেকক্ষণ অশ্বারোহণের পর বৃক্ষতলে বিশ্রাম

নেই। কিন্তু আমেরিকান্ প্রভাব ক্রমেই তাদের উপর ছড়িয়ে প'ড়ছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে প্রাচীন পোষাকের আর ইজ্জৎ থাকবে কি না বলা যায় না।

জাতীয় পোষাকে লিথুয়েনিয়ান নারী

সেখানকার পুরুষদের পোষাক কিন্তু আধুনিকতার দাবী রাখে যথেষ্ট।

লিথুয়েনিয়ার আছে সম্পদযুক্ত সাহিত্য। তবে সে সাহিত্যের দান বেশী নয়। প্রত্যেক ছেলে মেয়েকেই সেখানকার গ্রাম্য গল্প, কবিতা এবং গান প'ড়তে ও শিখতে দেওয়া হয়। এইভাবে তাদের মধ্যে কবিতা ও নাটক লেখবার প্রেরণা জাগে।

সেখানকার লোকেরা রোম্যান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মের দকেই বেশী আসক্ত। দেশের চারিদিকেই রাস্তার ধারে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্ত্তি দেখা যায়। প্রত্যেক রবিবারে গীর্জ্জার মধ্যে লোকদের প্রার্থনা ক'রতে আসা চাই-ই! প্রার্থনা শেষ হবার পর লোকেরা আমোদ-আহ্লাদ করে। বলা বাহুল্য, এ-সব তারা করে—শস্য-ক্ষেতের মঙ্গল-কামনায়। এইভাবে লোকদের সামাজিক ও ধার্ম্মিক মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সেখানকার ইহুদীদের হাতেই লিথুয়েনিয়ার সমস্ত কারবার র'য়েছে। তারা প্রধানতঃ দোকানদার। তাদের খুব বড় রকমের কোনো ব্যবসা নেই। কিন্তু তা হ'লেও, তারা ছাড়া দেশবাসীদের গত্যন্তর নেই। এই জন্যই লথুয়েনিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ তাদের কিছু স্বাধীন অধিকার

দিয়েছেন। এই অধিকারেই তারা নিজেদের মধ্যে একটা স্বায়ত্ত-শাসিত ব্যবস্থা-পরিষদ ক'রেছে। এই পরিষদই তাদের ব্যবসার উপদেশ দেয়; তাদের শিক্ষা, ধর্ম্ম ও সমাজ-সংক্রান্ত বিষয়ে কর বসাবার স্বাধীনতা পায়।

গৃহহারাদের প্রান্তর-জীবন

বিগত মহাসমরের সময় নির্ম্মম জার্ম্মাণ আক্রমণে বিব্রত হ'য়ে, অত্যন্ত অসহায়ভাবেই লিথুয়েনিয়ানরা তাদের বাড়ী ত্যাগ ক'রে, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সমেত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে যায়। এই ছবিতে যাবার সময়কার অত্যন্ত করুণ দৃশ্যটী ফুটে উঠেছে।

লিথুয়েনিয়ান্‌রা শান্তির প্রয়াসী। ধর্ম্মই তাদের প্রাণ। কর্ম্মে তারা পশ্চাৎপদ নয়। তাদের সম্বন্ধে ইংরেজ বিশেষজ্ঞের অভিমত হচ্ছে এই যে, "লিথুয়েনিয়ান্‌দের মতো ক্ষুদ্র জাতির মধ্যে মানুষোচিত তেজস্বিতা, সমবায়ের কল্পনা, দৃঢ়তা এবং সঙ্ঘবদ্ধতার গুণ অতিরিক্ত ভাবে প্রশংসনীয়।"

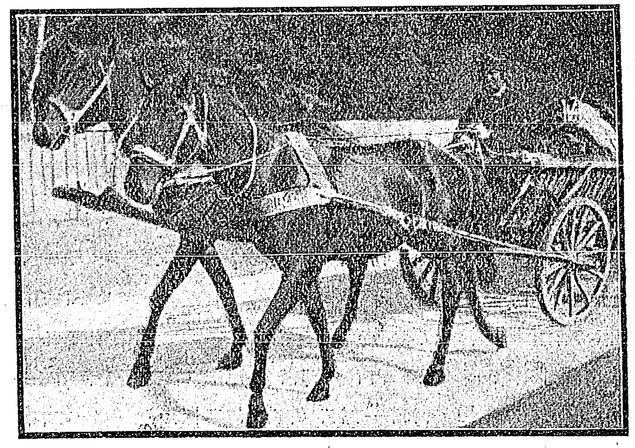

মালগাড়ী

সেখানকার লোকেরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। শতকরা ৯০ জন লোকই ক্ষেতের পূজা করে। ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যগুলি ছাড়া, সেখানকার পশম, মাখন, পনির, ডিম, ইত্যাদি বিক্রী ক'রেও লোকেরা লোকই শিল্প কাজের পক্ষপাতী। সেখানকার মোট জনসংখ্যা প্রায় ৪,৮০০,০০০।

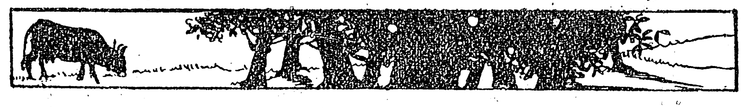

গতিক

শ্রীবিমল মিত্র

মতিচ্ছন্নই বলিতে হইবে!·····

অতদিনকার পুরান ঝি; প্রায় চোদ্দ পনেরো বছর কাজ করিতেছে—কোনও রূপ খারাপ কিছু করে নাই—বেশ নিশ্চিন্তে কাজ করিয়াছে!—

শেষকালে যাবার সময় কি-না এই কাণ্ড বাধাইয়া গেল!

বয়স কত আর?—আসিয়াছিল দশ বছর বয়সে—এখন হইয়াছিল প্রায় চব্বিশ কি পঁচিশ।—তা' হোক্—কিন্তু এমন কুমতি হইল কেন?

ব্যাপারটা প্রকাশ করে ঝি নিজমুখেই ও-পাড়ার মুখুয্যে গিন্নির কাছে;—

হাত মুখ নাড়িয়া না-কি বলিয়াছে—আমি আর থাকি কোন্ মুখে বল মা?—বাবুর মেজ ছেলে—চারিদিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত আস্তে—বুঝলে মা—গিন্নীমারা যখন দার্জ্জিলিঙে গিয়েছিল—বাড়ীতে থাকবার মধ্যে ছিল মেজদাদা আমি, আর ঠাকুর দারোয়ান—এরাই—ওমা লজ্জার কথা বলব কি—আর একবার চারিদিকে চাহিয়া লইল—পরে বলিল—রাত্তির বেলা মেজদাদা আমারই ঘরে—

মুখুয্যে গিন্নী এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই গালে হাত দিলেন—ওমা তুই বলিস্ কি সিন্ধু—আমাদের রামকেষ্ট?—তুই যে অবাক করলি সিন্ধু—ওমা আমার কি হবে!

এমন সোজা ব্যাপারটা কে না বুঝিতে পারে?—

ঝি চলিয়া যাইতেই ক্রমে ক্রমে পাড়ায় কথাটা রটিয়া গেল—ক্রমে উঠিল মা'র কাণে—শেষে একদিন আমাকে ডাকিলেন—হ্যারে রামকেষ্ট—সিন্ধুর কাণ্ড শুনেছিস্!—

পূর্ব্ব-বর্ণিত ব্যাপারটাই শুনিলাম—শুনিয়া হাঁ-না কিছুই না করিয়া চলিয়া আসিলাম;—

মা বলিলেন—এত বড় পাজী ঝি—আমার সোনার ছেলের নামে—

কি করিয়া দাদার কাণে উঠিয়াছিল—দাদা বলিল—আসুক সে বেটী একবার—দেখে নেব তা'র ঘাড়ে ক'টা মাথা।······

মা'র 'সোনার ছেলে' ঘরে বসিয়া শুনিল।

বাড়ীর ভেতরকার ছোট ছোট কাজ ঝি'র দ্বারা হইলেই সুবিধা হয়।

আর একটী ঝি আসিল।—সঙ্গে আনিল একটী দেড় বছরের ছেলে!

এবারকার ঝি'র নাম—নন্দ'র মা।

মা বলিলেন—হ্যাঁ নন্দ'র মা,—খোকার বাপ কতদিন হ'ল নেই?

ঝি'র চোখে ধারা বহিল—আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া ঝি বলিল—দুখের কথা বলব কি মা—সবই ছিল—জানতেও পারিনি কপাল ভাঙবে—সন্ধ্যেবেলা কাজ করে' এসে বললে শরীরটা কি রকম ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে—একটু চা কর ত—ওমা—

চোখের জল আবার ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া বলিল—ওমা চা' করে' এনে দেখি—গা হাত পা ঠাণ্ডা—সব শেষ—আমার কপাল ভাঙলো—

খানিকক্ষণ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ—তার পর আবার সুরু হইল—তা' আমার কিসের অভাব মা—সব ছিল পা'য়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেতে পারতুম মা—বসে' খেতে পারতুম—দেওররা সব ফাঁকি দিয়ে নিলে—আমি মেয়েমানুষ কি বুঝি—

নন্দর মা'র বয়স বাইশ কি তেইশ···একটু রোগা—

ছেলেটি ভাল হাঁটিতে পারে না—নন্দর মা' দেখি দুপুর বেলা তাহাকে লইয়া—হাঁটি হাঁটি পা-পা—সুরু করিয়া দিয়াছে···

ছোট খুকীর খেলনা ঝুমঝুমীগুলা দেখি দিন দিন সংখ্যায় কমিয়া যাইতেছে;—একদিন স্পষ্ট বলিলাম—

হ্যাঁগা নন্দর মা, এ রকম করলে তো তোমাকে আর রাখা যায় না—ছোট খুকীর খেলনাগুলো নন্দর ঘরে যে জমা হচ্ছে—সে তো আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাই!

ওগুলো পয়সা দিয়ে কিনতে হয়—একান্তই নন্দ যদি বায়না ধরে···চাইলেই পারো···চুরী করো কেন?

মা ভাঁড়ার-ঘরে ছিলেন;—নন্দর মা' তাঁ'হাকে শুনাইয়া বলিল—ওমা এও কপালে ছিল মা—শেষকালে চোর বলে' অপবাদ হোল—ওগো কেন তুমি আমায় ফেলে গেলে? কেন আমার এই হাড়ির হাল হোল গো?—ওগো তুমি ওপর থেকে সব ত' দেখতে পাচ্ছ গো।—ওগো আমার আর কেউ নেই যে গো ··

পোঁ-কান্না সুরু হইল—দেখিয়াছি নন্দর মা'কে একটু বকিলেই এই রকম ছিঁচকাদুনী সুরু করিয়া দেয়;—

মা কান্না শুনিয়া বাহিরে আসিয়া আমাকেই ধমক দিলেন—তুই বা রামকেষ্ট বলতে যাস্ কেন? কতই বা দাম খেলনাগুলোর—নিলেই বা—ছোট ছেলে বই ত নয়—অ[illegible] এই অমঙ্গুলে কান্না শুন্‌তে হোল তো?···

চুপ করিলাম;—

আর একদিন!···

খাইতে বসিয়াছি;···দুধ নয় ত চুনগোলা জল যেন!

মা'কে বলিলাম—বেশী দাম দিয়ে খাঁটি দুধ কেনা হয়—অথচ এত জল কেন? এর চাইতে এক গ্লাস খাঁটি জল খাওয়া ভাল।

মা সাদাসিধা মানুষ; বলিলেন—কি জানি বাপু—কে আর জল মিশোবে—নন্দ'র মা'ই তো নিজে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে দুইয়ে নিয়ে আসে—তা কি করে' গয়লারা জল মেশাবে!—

সে একটা কথা বটে!—কিন্তু—একটা সন্দেহ হইল!—

নন্দ'র মা দোকানে খাবার আনিতে গিয়াছিল;—মা'কে বলিলাম—নন্দ'র মা নিজে ছেলের জন্যে চুরী করে না ত?

—কি যে বলিস্,—মা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।—

বচন সিংকে ডাকিয়া নন্দ'র মা'র ঘরটা একবার দেখিয়া আসিতে পাঠাইলাম।—

মা' ত' হতভম্ব!···বচন সিং আসিল হাতে লইয়া এক বাটী ভর্ত্তি খাঁটি দুধ!—বলিল—তাকের উপর লুকান ছিল।

মা'কে বলিলাম—দেখলে তো!······

মা বলিলেন—থাক্ গে বাবা—নন্দ'র মা'কে আর কিছু বলিস্‌নে—আহা ছোট ছেলে—দুধ না হ'লে বাঁচ্‌বে কেন?···

সেইদিন হইতে ব্যবস্থা হইল নন্দ'র মা'র বদলে বচন সিং নিজে গিয়া দুধ লইয়া আসিবে।

এমন যে হইবে আশা করি নাই।

একদিন ভর সন্ধ্যাবেলা সিন্ধু আসিয়া হাজির—কোলে ছয়মাসের একটি সন্তান;·····

সিন্ধুর চেহারা দেখিয়া ভয় পায়;···চোপছুটি ঢুকিয়া গিয়া একেবারে অস্তিত্ব লোপ পাইবার জোগাড়;···চুলগুলা খসখসে হইয়া জট্ বাধিয়া গিয়াছে—নাকটা যেন একটি চণ্ডালের লাঠির মত 'সব শেষ'—এই কথাটাই প্রকাশ করিতেছে!

তবু রাগ হইল—হইবারই কথা!

যাইবার সময় যে কাণ্ড করিয়া গিয়াছে;·····কিন্তু উপায় ছিল না বলিয়া শেষকালে কি আমার নামেই বদনাম রটাইতে হয়?

দাদা খবর পাইয়া একটি লাঠি দিয়া মারিতে উদ্যত হইয়া বলিল—বেরো হারামজাদী—বেরো!—এখুনি বেরো!

মা বাহিরে চীৎকার শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন।

বকিলেন—ও কি কর্চ্ছিসরে নিধিরাম—বাড়ীতে এসে আশ্রয় চাইছে—তুই সন্ধ্যেবেলা তাড়িয়ে দিচ্চিস্—ওতে যে অকল্যাণ হয়!—না না মারিস নি—আহা—কি চেহারা হয়েছে দেখছিস্ না—অমন একটু আধটু দোষ সকলেই করে—নে নে—যা এখান থেকে—বচন যা,' এর একটা ঘর দেখিয়ে দে—কোথাও জায়গা পায়নি—শেষকালে এখানেই আসতে হয়েছে—যা' সিন্ধু বচনের সঙ্গে যা'!·····

মা'র কল্যাণে সব শান্ত হইল;···সিন্ধু আবার আমাদেরই বাড়ীতে আশ্রয় পাইল···মা'র বিরুদ্ধে এতটুকু উচ্চবাচ্য করিবার সাহস কাহারো নাই।

নন্দর মা' দেখি সিন্ধুকে দেখিয়া গজ গজ করিতেছে;

বলে—হাঁসপাতালে বিইয়েছে—হাঁসপাতালেই ফেলে দিয়ে আসতে পারেনি?—কোন্ মুখ নিয়ে আবার এখানে এনেছে—মরণ আর কি!···ঘেন্নার কথা···বিধবা হ'য়ে মুখে আগুন—অমন···

ঘরে বসিয়া সমস্ত শুনিতে পাই।

বাগানের পথে সিন্ধুর ঘর।

মাঝে মাঝে অকারণে চোক পড়িয়া যায়।

দেখি প্রায়ই ছোট ছেলেটিকে কোলের কাছে করিয়া শুইয়া আছে! বাহিরে কমই আসে—জীবনের পথে যেন ওইটুকুই সম্বল—হারাইয়া গেলেই বুঝি সব অন্ধকার!

মনে মনে ভাবি কলঙ্কের ওই প্রতিদানটিকে বহিয়া যে লজ্জা সঙ্কোচের সমস্ত আড়ালকে পার হইয়া আসিয়াছে—পাথেয় স্বরূপ তাহার কি মিলিল?

পৃথিবীর এই পঙ্কিল আবহাওয়ার মধ্যে কি যেন মণি কুড়াইয়া পাইয়াছে—আগলাইতেও ব্যস্ত—নিজের সমস্ত অপবাদ ও অপমানের বিনিময়েও!

ওর ওই ঘরের দিকে চাহিয়া অনেক কিছু চিন্তা করি।

মানুষ পঙ্কের গ্লানিতে কি কমল ফুটায়! অসুন্দরের পূজায় অজ্ঞাতে কি চমৎকার সুন্দরের সৃষ্টি করে।—কুৎসা ও লজ্জাস্কর কলহবিবাদের মাঝে কেমন লক্ষ্মীর চরণ-চিহ্ন পড়ে।

করযোড়ে একবার মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া লই!

শুনিলাম সিন্ধুর ছেলেটির অসুখ।

মা দু'বেলা গিয়া দেখিয়া আসেন—ঔষধপত্রাদির কোনও রকম অসুবিধা হয় না বুঝিতে পারিলাম।—ডাক্তারও না-কি একদিন আসিয়া দেখিয়া গেছে!

নন্দর মা গজ গজ করিয়া ওঠে—বলে—আবাগী মরতে আর জায়গা পেলে না—এখানে এল জ্বালাতন করতে।

হিংসা হবারই কথা—ওর ছেলেটি দুধ পায়না—আর সিন্ধুর ছেলের জন্য ডাক্তার!—সিন্ধু কখনও ডাক্তার দেখেছে!—

তিন দিন পরে মা বলিলেন—ছেলেটির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

দেখিতে গেলাম।

ঘরটির ক্লিষ্ট আবহাওয়া যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দেয়। ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর ছায়া যেন চোকের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।—সুন্দরের প্রাণ কলঙ্কে হাঁফাইতে থাকে;

বাহিরে আসিতেই প্রাণ বাঁচিল;—ভাবিলাম কা... প্রভাতেই কিছু সুব্যবস্থা করিব।

হাজার হোক গরীব। আমরাও মানুষ!

ঘুম ভাঙিতেই নন্দর মা'র কান্না শুনিতে পাই।

ব্যাপার কি!—বাহিরে আসিয়া সব শুনিতেই ধার... আরও সাদা হইয়া গেল।

নন্দর মা সকালে নন্দকে খুঁজিয়া পাইতেছে না—আ... ওদিকে সিন্ধু মৃত ছেলেটি ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় চলি... গিয়াছে!

সিন্ধুই যে নন্দকে লইয়া পলাইয়াছে—এ বি... কাহারও দ্বিমত নাই!—

পৃথিবীর রহস্য যেন আরও স্পষ্ট হইল আমা... কাছে।...

তিন দিন পরে নন্দ'র মা মা'র কাছে নিবেদন করিল—আর মা, যা'র জন্যে পরের বাড়ী খাটা সেই যখন নেই—তখন আমার আর কাজ করে' লাভ কী?...আমা... বিদেয় দাও মা—নিজের পেটটা কোনও রকমে চালি... নেবই!—

নন্দ'র মা' চলিয়া গেল।

পরদিন দেখা গেল বাড়ীর উড়ে চাকরটিও অন্তর্ধা... হইয়াছে।

যায়—ক্ষতি নাই—পয়সা দিলে আকাশে ওড়া যায়—আর চাকর পাওয়া যাইবে না?

ভালই হইল—আপদ গেল।

মা বলিলেন—রামকেষ্ট, এবার বুড়ী ঝি রাখব—ও... ঝঞ্ঝাট ভাল নয়। ওদের গতিক খারাপ।

এক বুড়ী ঝি আসিল এবার;—

সিন্ধুও নয় নন্দ'র মাও নয়—এবার যমুনা!

তা' নামে কি আসে যায়!

মা বলিলেন—বাঁচলুম!

ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(চলচ্চিত্রের শিল্পকলার দিক)

পূর্ব্বেই বলেছি যে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক বিভাগে চলচ্চিত্রের যে বিপুল উন্নতি সাধিত হ'য়েছে, শিল্প-কলার দিক দিয়ে এখনও তার সে পরিমাণ ঔৎকর্ষলাভ ঘটেনি। তার প্রধান কারণ প্রথমতঃ চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীরা অনেকেই টাকা-আনা-পাই যতটা বোঝেন,—চারু কারু সম্বন্ধে তাঁরা ঠিক সেই পরিমাণেই অবোধ! দ্বিতীয় কারণ—ক্যামেরার চোখে অবিকল সত্য বস্তুই নির্ব্বিকারভাবে প্রতিফলিত হয়, এই ভুল ধারণাবশতঃ এতকাল পর্য্যন্ত রঙীন তুলি নিয়ে শিল্পীদের স্বপ্ন-কল্পনার মায়া তার পিছনে এসে দাঁড়ায়নি। কাজেই তখন গল্পের ছবিও উঠ্‌ছিল ঠিক এখনকার "টপিক্যাল বাজেট্" বা চল্‌তি খবরের মতই! দেশের বিশেষ বিশেষ ঘটনার ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত নির্ভুল নথী-সংগ্রাহক হিসাবে, শিক্ষার প্রসার ও জ্ঞান প্রচারের দিক দিয়ে—এমন কি, ক্যামেরায় বিজ্ঞানের' নব নব উদ্ভাবন সম্ভাবনার উপায় নিহিত আছে বলে ধ'রে নিলেও ক্যামেরার শক্তি যদি আজ কেবল 'চল্‌তি খবরের' চলচ্ছবি শ্রেণীর-সজীব চিত্র তোলাতেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তা হ'লে আমাদের দেশের সনাতন গরুর গাড়ীর বৈদিক চাকার মতো ক্যামেরা আজও তার আদিম অবস্থাতেই পড়ে থাকতো! কিন্তু সে তার বহুবিধ শক্তির পরিচয় দিয়ে আজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

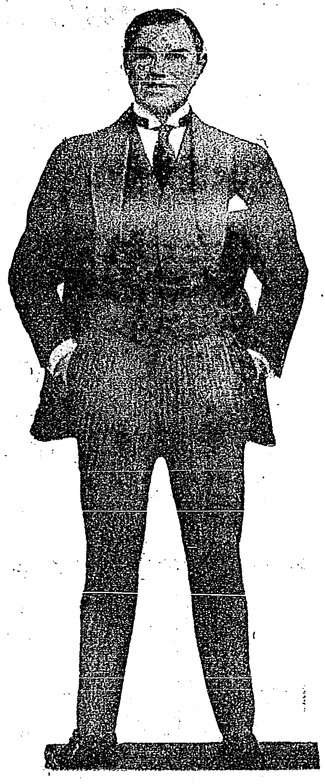

জ্যাক্ ডেম্পসি (Jack Dempsey)
(বিখ্যাত বক্সিং খেলোয়াড়)

বিড়াল-তপস্বী (Tartuff)
(নায়িকা 'এলমায়ারে'র ভূমিকায় প্রসিদ্ধা জার্ম্মান্ অভিনেত্রী শ্রীমতী লিল্ ডাগোভার্ (Lil Dagover.)

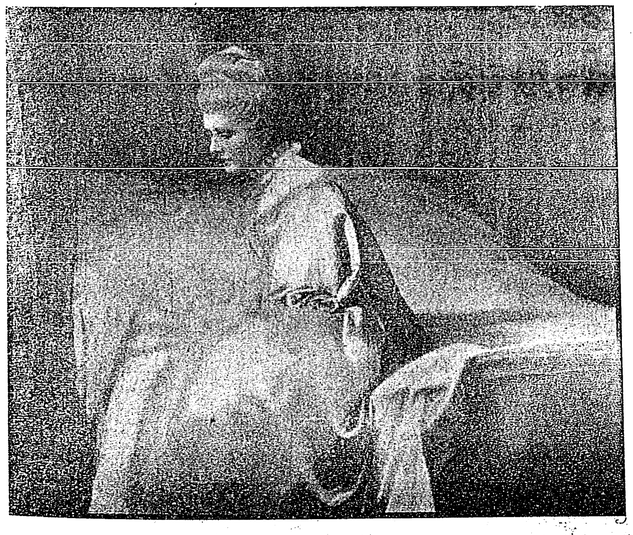

সীনেমা দেখতে গিয়ে প্রধান ছবি সুরু হবার আগে এখনো "চলতি খবরে" দেশ-

TIGHT BINDING.

এলিনোর গ্লিন্ (Elinor Glyn.)
(প্রসিদ্ধা উপন্যাস লেখিকা। উপস্থিত আমেরিকান চিত্র-নাট্যের গল্প-রচয়িত্রী)

জ্যাক্ ডেম্প্‌সি
(চলচ্চিত্রে অবতীর্ণ হবার জন্য রূপসজ্জা ক'রছেন)

বিদেশের সচিত্র সমাচারটুকু অনেকেরই ভালো লাগে। কিন্তু, সে ভালো লাগা তাদের ছবির জন্য নয়, খবরেরই জন্য! ঠিক যে আগ্রহে লোকে সকালে উঠেই নিবিষ্ট মনে সংবাদপত্র পড়ে, এও তাই। কিন্তু, একটা কোনো গল্প বা রূপকথার যদি ঠিক ঐ ভাবে ছবি তুলে দেখানো হয় তাহ'লে —সেটা না হবে ছবি—না হবে রূপকথা! কারণ 'চল্‌তি খবরের' ছবিতে যখন আমরা দেখি যে,—বড়লাট দিল্লীতে একটি নূতন হাসপাতালের দ্বারোদ্‌ঘাটন ক'রছেন, কিম্বা বিলাতে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বা হাজুর ব্রাইটনে সমুদ্র-স্নান ক'রছেন, তখন বড়লাট বা মহারাজাধিরাজ বা হাজুরের মনের ভাব কি রকম, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়না, আমাদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে কেবল তাঁদের কাজটুকু! কিন্তু, ছবিতে রূপকথা দেখবার সময় পাতালপুরীর রাজকন্যাকে দেখে উদয়গড়ের যুবরাজের মনে কী ভাবের উদয় হ'চ্ছে, সেইটে জানবার আগ্রহই হ'য়ে ওঠে আমাদের প্রধান আকর্ষণ। রাজকুমারীর সঙ্গে কুমারের চোখের দেখাটুকুর ছবিই শুধু আমাদের নয়ন-মনকে তৃপ্ত ক'রতে পারেনা! কাজেই, চলচ্চিত্রের আদিম যুগে যখন ক্যামেরায় গল্পের ছবি নেওয়া হ'তো—মাত্র কতকগুলি ঘটনার পরের পর ছবি তুলে—অবিকল 'চলতি খবরের' ধরণে, তখন সে ছবি দর্শকদের প্রাণকে স্পর্শ ক'রতে পারতো না, কেবল তাদের—চোখের কৌতূহল কতকটা জাগিয়ে তুলতো মাত্র।

ফুটবল খেলোয়াড় 'ফ্লিন্'
(Flynn)

সেই যে প্রথম দিন থেকেই ভুলপথে এই চলচ্চিত্র-শিল্প তার পা' বাড়িয়েছিল, আজও সেই ভুল পথ ধ'রেই সে চলেছে। অল্প কয়েকজন প্রতিভাবান্ পরিচালক ব্যতিত আর কেউ ক্যামেরাকে শিল্পীর হাতের ক্রীড়নক ক'রে তুলতে পারেননি। ক্যামেরাকে নিজের বশে না এনে ক্যামেরার বশে থেকে যাঁরা ছবি তোলেন, সে ছবিতে তাঁরা কোনো কাল্পনিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ক'রে কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন না। চলচ্চিত্র যে কেবলমাত্র 'ফটোগ্রাফ্' নয়, সে যে ছবি—এবং, সে যে গল্পের ছবি নয়—ছবিতে গল্প—এই সহজ কথাটা যে ডাইরেক্টার্ মনে রাখতে পারেন না, তাঁর তত্ত্বাবধানে তোলা ছবিতে পরিচালকের কৃতিত্ব কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ক্যামেরাকে যিনি ইচ্ছামত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দূরে নিকটে ও কোণাকোণি ক'রে রেখে, ছবি তোলার সময় ও গতির হ্রাস বৃদ্ধি ক'রে এবং পটচ্ছেদ প্রণালী (Masking) ও পটবিপর্য্যয় (Transposition) প্রথা প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে চলচ্চিত্রকে ছবির পর্য্যায়ে টেনে তুলতে পারেন এবং সেই ছবির দ্বারা গল্পটিকে সজীব ও প্রত্যক্ষ ক'রে তুলতে পারেন, তিনিই সুদক্ষ পরিচালক ব'লে খ্যাতি-লাভ ক'রতে পারেন।

দি ক্যাবিনেট্ অফ্ ডক্টর্ ক্যালিগারি
(সিঙ্গারের ভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেতা কন্‌রাদ্ ভীট্ (Conrad Veidt.)

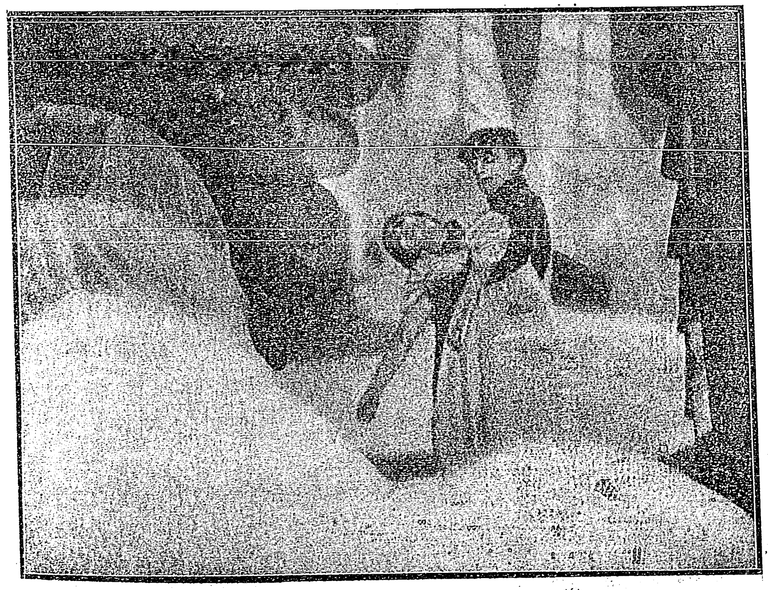

দি ক্যাবিনেট্ অফ্ ডক্টর্ ক্যালিগারি
('জেনের' ভূমিকায় লিল্‌ডাগোভার। সীজার জেনের মৃতদেহ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে)

কোনো বস্তু বা ব্যক্তির অবিকল প্রতিকৃতি অর্থাৎ তার আকৃতির প্রত্যেক অংশ ও তার পরিমাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছবিতে দেখ্‌তে পেলেই আসল জিনিসটি বা ব্যক্তিটিকে দেখার অনুরূপ আনন্দ বা অনুভূতি জাগেনা। কোনো বস্তু বা ব্যক্তির পরিবর্ত্তে যদি আমরা কেবলমাত্র তার ছবিখানি পাই তাতে আমরা খুশী হ'তে পারিনি। টাকার

পরিবর্ত্তে যেমন টাকার ছবি পেলে কারুর মন ওঠেনা, এও অনেকটা সেই রকম। যে পরিচালকের শিল্প-প্রতিভা আপন কল্পনা-শক্তির সাহায্যে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির

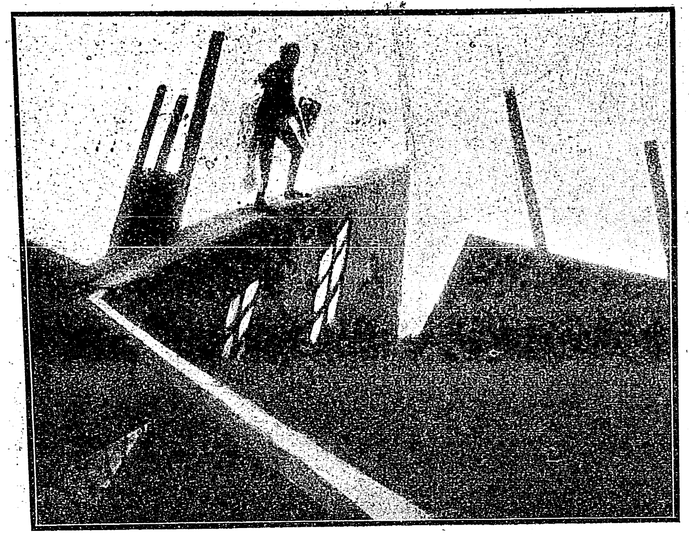

দি ক্যাবিনেট্ অফ্ ডক্টর্ ক্যালিগারি
(জেনের মৃতদেহ নিয়ে সীজারের পলায়নের দৃশ্য)

প্রতিরূপ সৃষ্টি করে—যেটা তার নিজের অনুভূতির ছায়া বা তার অন্তর্দৃষ্টির অবলোকিত কিম্বা মানস-গোচর রূপের অভিব্যক্তি—সেইটাই যথার্থ 'আর্ট' বা কলা-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শিল্পের মর্য্যাদা লাভ ক'রতে পারে। "একজনের ছবি উঠেছে ঠিক যেন তার অবিকল জীবন্ত প্রতিকৃতি" এ কথা ব'ললে—সে ক্যামেরাটি যে খুব ভালো এবং নির্দ্দোষ এটা প্রমাণ হ'তে পারে বটে, কিন্তু, শিল্পীর বাহাদুরী বা গুণপনার পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না তার মধ্যে। শিল্পীর কৃতিত্ব সে ই খা নে—যেখানে শিল্পীর চোখে সে তাকে যেমনটি বা তার যে রূপটি দেখেছে—তার যেটুকু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা প্রধান পরিচয় শিল্পীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে—সেইটুকু বিশেষ ক'রে যে ছবিতে সে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে—সেইখানেই শিল্পীর যথার্থ নৈপুণ্য, এবং দর্শকের মনেও সেই ছবিই একটা আনন্দানুভূতির সাড়া জাগিয়ে তোলে! নইলে, তাদের প্রতিদিনের সহজ দেখা মানুষটিকে ছবিতে হুবহু তেমনি দেখলে তাদের দৃষ্টি বেশীক্ষণ সেদিকে আবদ্ধ থাকে না! অথচ,—দর্শকের দৃষ্টিকে ছবির উপর আবদ্ধ ক'রে রাখাই হ'চ্ছে এই শিল্পের ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভের একটা প্রধান উপায়!

শিল্পীর চোখের বিশেষ-দৃষ্টি আমাদের সহজ-দেখা কোনো মানুষের যে বিশেষ লক্ষ্য ক'রে রূপটি ছবির পটে তাকে ফুটিয়ে তোলে, আমরা সে আলেক্ষ দেখে যদি মুগ্ধ নাও হই, অন্তত, অবাক্ বিস্ময়ে সেদিক পানে চেয়ে দেখে ভাববো যে,—এ মানুষটার এ মূর্ত্তি কবে যেন আমাদেরও

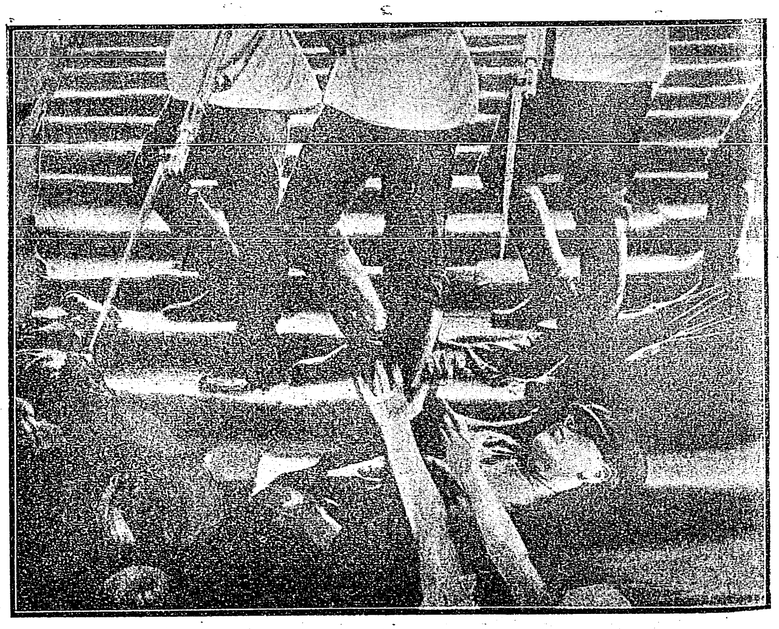

ব্যাট্‌ল্ শিপ—'পোটেমকিন্'—(সেভিয়েট চলচ্চিত্র।)

চোখে একটিবার পড়েছিল! সে কবে—কে জানে? ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু, দেখেছিলুম যে নিশ্চয়,—তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই, কেন না একে ত' একটুও আমার অপরিচিত ঠেকছেনা! আবার, অনেক সময় এমনও হয়—যে, শিল্পীর দেখা সেই মানুষের চা রি ত্রি ক বৈশিষ্ট্যটুকু সর্ব্বপ্রথম দর্শকের চোখে ধরা পড়ে শিল্পীর আঁকা সেই ছবি দেখেই! আবার, হয় ত' আগে অনেকবার আমরা সেই মানুষটিকে দেখেছি, দূর থেকে দেখলেই তাকে চিনতে পারি, তার চলার ভঙ্গী, তার আকৃতির গঠন আমাদের খুব চেনা, কিন্তু, তার মুখের দিকে স্থির হ'য়ে অনেকক্ষণ ভালো করে চেয়ে দেখবার সুযোগ আমাদের কখনো

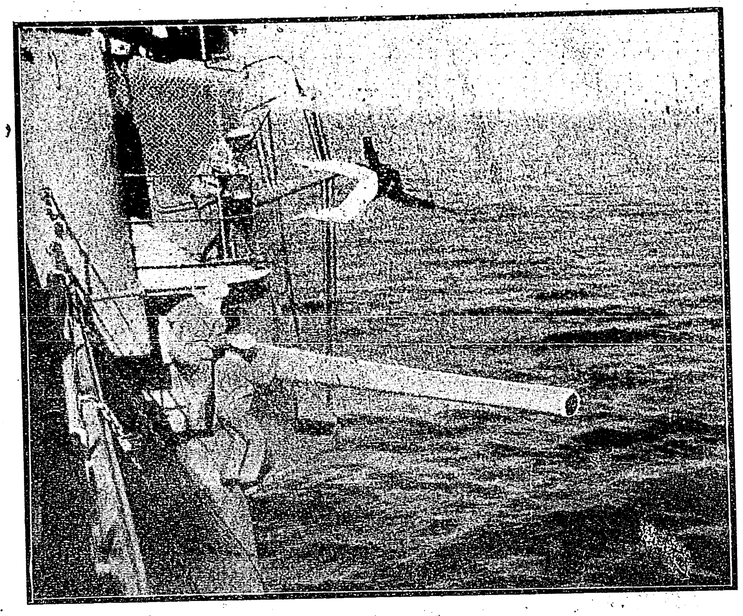

ব্যাট্‌ল্‌শিপ—'পোটেমকিন্'
(নৌ-সেনা নায়কদের জলমগ্ন হওয়ার দৃশ্য)

ব্যাট্‌ল্‌শিপ—'পোটেমকিন্'
(ওডেসার (Odessa) সোপান শ্রেণীর উপর তোলা যুদ্ধের একটি বিরাট দৃশ্য)

হয়নি, কাজেই তার মুখের ঠিক স্বরূপ চেহারাও আমরা ভালো চিনিনা,—এটা বেশ বুঝতে পারি যখন তাকে আমরা—হঠাৎ একদিন একেবারে খুব কাছে পেয়ে তার মুখের দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখবার অবসর পাই!

এই সুযোগটা ফিল্মে খুব' বেশী রকম কাজে লাগে, যখন 'Close-up' ছবি নেওয়া হয়, অর্থাৎ ক্যামেরা খুব কাছে নিয়ে গিয়ে কোনো

বস্তু বা ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষত্বটুকু খুব বড়ো করে ছবিতে তুলে দেখানো হয়। এই উপায়ের দ্বারা ছবির নায়ক নায়িকার সঙ্গে দর্শকদের যেন খুব একটা নৈকট সাযুজ্য স্থাপিত হয়, এবং, এই নৈকট সাযুজ্যর ফলে যে বস্তু বা ব্যক্তি ছিল ইতিপূর্ব্বে আমাদের চোখে

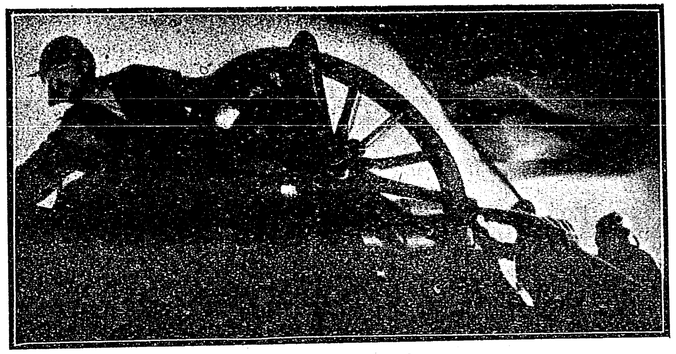

"অক্টোবর"—(সোভিয়েট চলচ্চিত্র। "যে দশদিন পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল!" এই নামে ছবিখানি আমেরিকায় দেখানো হয়েছিল)

সাধারণ ও বৈচিত্র্যহীন—তারই মধ্যে আমরা দেখতে পাই—যেন কী একটা অনাবিষ্কৃত রহস্য—একটা নূতনতর রূপ! চলচ্চিত্র-শিল্পীদের এ কথাও বরাবর মনে রাখা উচিত যে—ছবি—কোনো বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের হুবহু প্রতিকৃতি না হ'য়েও অবিকল তার প্রতিরূপ হ'তে পারে! ফটোগ্রাফ এবং আর্টে এইখানেই প্রভেদ!

কোনো ফিল্‌ম দেখে তার সমালোচনা করবার সময় যদি কেউ বলেন যে—'অমুক ছবিখানি আগাগোড়া অতি সুন্দর হ'য়েছে, নির্দ্দোষ হয়েছে বা নিখুঁত হয়েছে, তাহ'লে তিনি অত্যন্ত ভুল বলবেন, কারণ কোনো ফিল্‌মই সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত আগাগোড়া নিখুঁত বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আজ পর্য্যন্ত হয়নি—এবং কবে যে হবে তা'ও সঠিক বলা যায় না। তবে, অমুক ফিল্‌মখানি এ বৎসরের সব ছবিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এ কথা বলা চলে, কারণ, যে ছবির মধ্যে পরিচালকের শিল্প-প্রতিভা যতো বেশী দিক দিয়ে আত্মপ্রাশ করে, সে ছবি তত বেশী উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে! কাজেই, ছবির প্রধান কর্ণধার হ'চ্ছেন—যিনি সুপটু পরিচালক (Director)। তিনি—ক্যামেরাম্যান আলোকশিল্পী এবং অভিনেতৃবর্গের ভিতর দিয়ে নাট্যকারের স্বপ্নকে আপন কল্পনার রংয়ে ফুটিয়ে তোলেন ছবির পর ছবি সাজিয়ে তোলার নৈপুণ্যে! কবি ও সাহিত্যিক যে কাহিনী রচনা করে সুললিত ভাষায়, চলচ্চিত্র-শিল্পী সজীব ক'রে তোলে সে কাহিনীকে রূপের অপরূপ ঐশ্বর্য্যে!

১৯০৩ সালে প্রথম যে গল্পের চলচ্চিত্র দেখানো হ'ল "The Great Train Robbery" (ভীষণ রেল-ডাকাতী) সেটা দর্শকদের এত বেশী ভালো লেগেছিল যে সেদিন থেকে চলচ্চিত্রে রূপকথা গল্প উপন্যাস নাটক এমন কি কাব্য ও গীতিকবিতা পর্য্যন্ত রূপান্তরিত হ'তে সুরু হয়েছে। সেদিনের পরিচালকদের আদর্শ ছিল রঙ্গমঞ্চ। নাট্যশালার অভিনয়কে তাঁরা ছবির পর্দ্দার উপর টেনে নিয়ে এসে যে ভুল করেছিলেন সে ভুল আজও সম্পূর্ণরূপে ভাঙেনি। ১৯০৮ সালে Comedie

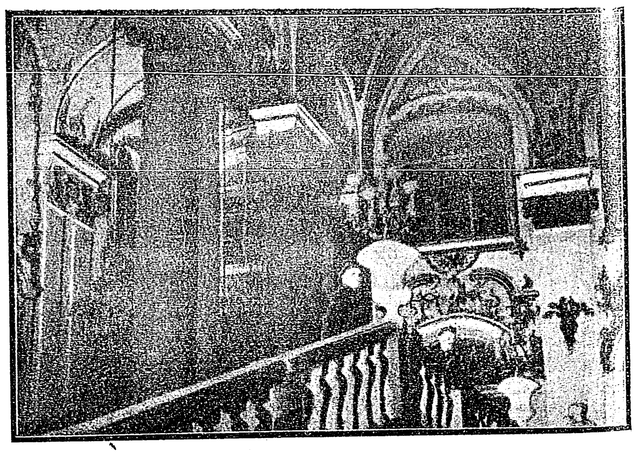

"অক্টোবর"—(সোভিয়েট চলচ্চিত্রে 'জারের' প্রাসাদ দৃশ্য)

Francaiseএর প্রসিদ্ধ অভিনেতৃবর্গকে 'Tartuff,' 'Phedre' প্রভৃতি কয়েকখানি জনপ্রিয় নাটকের নির্ব্বাচিত দৃশ্যাবলী ক্যামেরার সম্মুখে অভিনয় করবার জন্য নিযুক্ত করা হ'য়েছিল। কারণ সে যুগে চলচ্চিত্র

ব্যবসায়ীদের ধারণা ছিল যে,—প্রসিদ্ধ নাটক ও বিখ্যাত নট নটীর সমাবেশে রঙ্গালয়ের মতো চলচ্চিত্রেও দর্শকদের আকৃষ্ট হ'তেই হবে। যশস্বী পরিচালক এডলফ্ জুকর (Adolf Zukor) এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়েই 'ফেমাস্ প্লেয়ার্স' নাম দিয়ে একটি চলচ্চিত্র-সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন। এই কোম্পানী সাফল্য-মণ্ডিত হ'য়ে উঠে এখন জগতের বৃহত্তম চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এর নাম হয়েছে এখন "The Famous Players-Lasky film Corporotion."

Comedie Francaiseএর অভিনেতৃদের নিয়ে চলচ্চিত্রে নামানোর দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত য়ুরোপ ও আমেরিকায় এই প্রথাই চলে আসছে। যে নাটক যে প্রহসন যে গীতিনাট্য রঙ্গালয়ে অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন ক'রে সর্ব্বজন প্রিয় হ'য়ে উঠছে, চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা অমনি তৎপর হ'য়ে বহু মূল্য দিয়ে তার 'ছায়াছবি' তোলবার অধিকার ক্রয় করে নিচ্ছেন। যে উপন্যাসখানি যখনি বিশ্বসাহিত্যে সমাদর লাভ ক'রছে, অমনি তৎক্ষণাৎ সেখানি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করা হ'চ্ছে; তা' সে উপন্যাস বা গল্প ছবিতে তোলবার ও পর্দ্দায় ফেলে দেখাবার উপযোগী হোক্ বা নাই হোক্। রঙ্গমঞ্চে যে নটনটী একটু খ্যাতিলাভ ক'রছে, তা সে অভিনয়েই হোক্ বা নৃত্যেই হোক্ বা সঙ্গীতেই হোক্—অমনি তাকে চতুর্গুণ পারিশ্রমিক দিয়ে চলচ্চিত্রের 'চিত্র-গড়ে' (Studio) টেনে নিয়ে আসা হ'চ্ছে। বিশেষ ক'রে আজকালকার সবাক্ ছবির 'চিত্র-গড়ে,' তাদেরই একাধিপত্য চ'লেছে! এমন কি নাট্যশালার বাইরেও যারা অন্যান্য নানা বিভাগে সর্ব্বসাধারণে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বিখ্যাত হ'য়ে প'ড়ছেন, চলচ্চিত্রওয়ালারা তাদেরও ছবির মধ্যে টেনে নিয়ে আসবার লোভ সম্বরণ ক'রতে পারছে না। তাদের মধ্যে শ্রীমতী এলিনোর গ্লিন্ (Elinor Glyn) এমী ম্যাক্‌ফার্সন্‌ও (Aimee Macpherson) আছেন, আবার বক্সিংয়ের ওস্তাদ্ জ্যাক্ ডেম্প্‌সী (Jack Dempsey) ও জর্জ্জ কারপেন্তিয়ারও (George Carpentier) আছেন! এমন কি ফুটবল খেলোয়াড়্ 'ফ্লিন্' (Flynn) এবং ঘোড়-দৌড়ের শ্রেষ্ঠ সোওয়ার্ ষ্টীভ্ ডনোঘুও (Steve Donoghue) বাদ যাচ্ছেন না! সে যুগে রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকগুলিই হ'য়ে উঠেছিল চলচ্চিত্রের' প্রধান সম্বল! অভিনয়-ভঙ্গীও ছিল হুবহু নাট্যশালার অনুকরণে, কারণ নাট্যমঞ্চ থেকেই চলচ্চিত্রের জন্য অভিনেতা অভিনেত্রী বেছে নেওয়া হ'ত তখন, ঠিক যেমন আমাদের এখানেও চলেছে এখনো! যে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেনি, চলচ্চিত্রে তেমন লোককে নেওয়া হ'ত না! Acting বা অভিনয় কৌশল ভালোরকম জানা থাকলে তবেই সে হতে পারতো তখন 'ম্যুভিং-ষ্টার'!—অর্থাৎ, চলচ্চিত্রাকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র!

আমেরিকা এই 'ষ্টার' গুলিকে আগে অনেক অর্থ দিয়ে নিয়ে যেতো নিজেদের চিত্র-গড়ে। আজকাল তাদের সেখানে রীতিমত 'ষ্টারের' 'চাষ' চলেছে! নিত্য নূতন 'ষ্টার' গজিয়ে উঠ্‌ছে তাদের হোলিউড্ আর লস্ এঞ্জেল্‌সের বুকে। ক্যামেরার পছন্দসই যে কোনো সুপুরুষ ও সুন্দরী মেয়ে, অর্থাৎ যাদের নাক চোখ মুখ এবং দেহের গঠন ছবিতে বেশ সুন্দর দেখায়—একটু আধটু নাটকীয় হাবভাব—অর্থাৎ 'থিয়েটারী ঢঙ্'ও আছে যাদের চলাফেরার মধ্যে এবং বিশেষ ভাবে যারা তাদের হাসিতে চাহনিতে ও লীলায়িত অঙ্গভঙ্গীতে যৌন-লালসা উদ্দীপিত ক'রে তুলতে পারে—তারাই হ'য়ে উঠ্‌ছে চলচ্চিত্র-গগনের সুগণ্য গ্রহ-তারা!

সেদিন দর্শক আকর্ষণের জন্য ছবিতে এমন সব আজগুবী গল্প তাঁরা বেছে নিতেন, যাতে ক্যামেরার কারচুপিতে অসম্ভবও সম্ভব ক'রে তোলা যেতো! যেমন প্রকাণ্ড 'এক ষ্টীম রোলার' রাস্তার এক পুলিশ সার্জ্জেণ্ট্‌কে চাপা দিয়ে চলে গেলো, সেই প্রকাণ্ড ষ্টীম রোলারের প্রচণ্ড চাপে পুলিশ সার্জ্জেণ্ট একেবারে জিবে-গজার মতো চ্যাপ্টা হ'য়ে গেলো—কিন্তু তবুও মোলোনা! চ্যাপ্টা সার্জ্জেণ্ট তার চ্যাপ্টা রুল নিয়ে তখনি ধূলো ঝেড়ে আবার উঠে দাঁড়ালো! কিম্বা, বীর রাজকুমার অসি-চালনার সুকৌশলে ভীষণ দৈত্যকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়ে ঘুমন্ত রাজকুমারীকে দৈত্যপুরী থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেলো, কিন্তু, সেই মায়াবী দৈত্যের ছিন্ন-ভিন্ন দেহাংশ একে একে আবার পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লেগে সেই ভীষণ দৈত্য আবার বেঁচে উঠ্‌লো এবং প্রতিহিংসা নেবার জন্য রাজপুত্রের পিছু নিলে—! ১৯০০ সালের আগে থেকেই

ক্যামেরার কারচুপির গোড়াপত্তন হ'য়েছিল এই সব ছবিতে, আজও তার বিরাম হয়নি। যেমন (Mickey Mouse Cartoon films) কৌতুকাঙ্কন হিসাবে আজও মুখর চলচ্চিত্রের দর্শকদের পর্য্যন্ত আকৃষ্ট ও মুগ্ধ ক'রছে। কিছুদিন আগে Eisensteinএর রুষগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ ছবি 'October'এ ক্যামেরার এই কারচুপি কাজে লাগানো হয়েছিল। রুষসম্রাট Czarএর গভর্ণমেণ্ট ধ্বংশ হওয়ার প্রতীক্ স্বরূপ তাঁর বিরাট মর্ম্মর-মূর্ত্তি মাটিতে পড়ে গিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো, কিন্তু, তৎপরিবর্ত্তে রুষিয়ায় কার্ণেস্কীর Ka neskey অস্থায়ী শাসন-পরিষদ গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভগ্ন মূর্ত্তির প্রত্যেক চূর্ণখণ্ড পরস্পর জোড়া লেগে আবার খাড়া হ'য়ে উঠ্‌লো, যেন কার্ণেস্কীর গভর্ণ-মেণ্টকে উপহাস করবার জন্য! ডগলস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কসের ছবি "The Thief of Bogdad" (বোগ্দাদের চোর) ফিল্মখানিতে এই ক্যামেরার কারচুপি খুব বেশী মাত্রায় দেখানো হয়েছে।

এই ধরণের সব ক্যামেরা-কৌশল দর্শকের মনে একটা বিশেষ কৌতূহল জাগিয়ে তোলে এইজন্য যে, তারা নিশ্চিত জানে যে এটা অসম্ভব, এ রকমটা বস্তুতঃ কখনো হ'তেই পারে না, তবু—সেই ব্যাপারই তাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ ঘটছে দেখে তারা বেশ আমোদ অনুভব করে। মানুষের মনকে এই অবস্থায় নিয়ে এসে অর্থাৎ এমনি ভাবে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়ে ভোলানো চলচ্চিত্র সৃষ্টি হবার আগে অন্যবিধ প্রমোদ ব্যবসায়ীদের মধ্যেও ছিল, যেমন ম্যাজিক্—ইন্দ্রজাল—ঈজীপ্সিয়ান ব্ল্যাক-আর্ট প্রভৃতি।

চলচ্চিত্রে দর্শকদের মনকে মাতিয়ে তোলবার আর একটা প্রধান উপায় হ'চ্ছে গতির প্রতিযোগিতা; অর্থাৎ পলায়ন, পশ্চাদ্ধাবন, ছুটে গিয়ে পলাতককে বন্দী করা বা আততায়ীকে উদ্ধার করা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোথাও গিয়ে পৌছানো, ইত্যাদি! এ সব ব্যাপারে পায়ে হেঁটে ছোটা থেকে সুরু ক'রে ঘোড়ার পিঠে, সাইকেলে, মোটরকারে, মোটর বাইকে, ট্রেনে, ষ্টীমারে, উড়ো জাহাজে, সবরকম যানবাহনেই ছোটাছুটী দেখানো হয়! এই ছোটাছুটীর উত্তেজনা দর্শকদের মনকেও উত্তেজিত করে' তোলে; গল্পের কথা ভুলে গিয়ে দর্শকের মন এই গতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তন্ময় হয়ে ওঠে। কাজেই Scenario বা 'চিত্রনাট্য' লেখকেরা প্রায়ই তাঁদের গল্পে এই সুযোগটুকু নেবার লোভ সম্বরণ ক'রতে পারেন না। এ সব ছবিতে যত রকম সস্তার উত্তেজনা, খেলো বিস্ময় ও নিম্নশ্রেণীর হাস্যরসের অবতারণা করা হ'ত। এ সব ছবিতে না-ছিল 'টেম্পো', না ছিল নট-নটীর উচ্চ অঙ্গের অভিনয়! পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির দিকেও লক্ষ্য ছিলনা; বিশেষ, এমন কি ফিল্ম্ editing অর্থাৎ চিত্রের সম্পাদন কার্য্য, যা' যোগ্য লোকের হাতে ভার পড়লে ছবিখানিকে সকল দিক দিয়ে সুন্দর ক'রে ও নূতন ক'রে সৃষ্টি ক'রতে পারে—তারও বিশেষ কোনো সুব্যবস্থা ছিলনা।

১৯২০ সালে প্রথম একখানি ছবি ও-পারের পর্দ্দার উপর দেখতে পাওয়া গেছলো যা' চলচ্চিত্ররাজ্যের গতানুগতিক পথ ছেড়ে এক নূতন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হ'য়েছিল। সে ছবিতে ছিল কল্পনার ঐশ্বর্য্য, ভাবের মাধুর্য্য ও সৃষ্টির বৈচিত্র্য! সে ছবি সঙ্গে এনেছিল শিল্প-জগতের এক অভিনব সম্পদ, কলা-নৈপুণ্যের এক নবীন পরিচয়, যা গ্রিফিথ্ প্রভৃতি বড় বড় চলচ্চিত্র-পরিচালকেরা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারতোনা! ফিল্মের রাজ্যে গ্রিফিথের দান অবশ্য ছোট নয়; যদি শিল্পের দিক দিয়ে ফিল্ম আজ কিছুমাত্র উন্নতির পথে এগিয়ে থাকে তবে সেটুকুর জন্য তাকে চিরদিন গ্রিফিথের কাছেই ঋণ স্বীকার ক'রতেই হবে, কারণ গ্রিফিথই সেই প্রথম চলচ্চিত্র-পরিচালক যিনি তাঁর নিজের চোখের সঙ্গে ক্যামেরার দৃষ্টিকেও মেলাতে পেরেছিলেন এবং নিজের ধ্যানের ছবিকে রূপায়িত ক'রে তুলতে পেরেছিলেন। 'সাযুজ্য' 'বিলয়' 'ক্রমবিনাশ' ও 'ক্রমবিকাশ' প্রভৃতি কলা-কৌশল চিত্রজগতে তিনিই প্রথম আমদানী ক'রেছিলেন; কিন্তু এ সব সত্ত্বেও গ্রিফিথের কোনো ছবিই শিল্পের দিক দিয়ে সে আভিজাত্য দাবী ক'রতে পারেনা যা ডাঃ রবার্ট হ্বীয়েনের (Dr. Robert wiene) জার্ম্মাণ ফিলম্—"The Cabinet of Doctor Caligari" শীর্ষক ছবিখানি পেতে পারে। তারপর পাঁচবৎসর আর কোনো ছবি এর সমকক্ষ হ'তে পারেনি; পাঁচবৎসর পরে অর্থাৎ ১৯২৫ সালে সোভিয়েট্ ফিল্ম "The Battleship Potemkin" এসে এই ছবিখানির সঙ্গে সমান আসন দাবী ক'রতে পেরেছিল।

বার্লিন থিয়েটারের Decla প্রোডিউসিং কোম্পানীর

পক্ষ থেকে ১৯১৯ সালে ডাঃ হ্বীয়েনে "The Cabinet of Doctor Caligari" ছবিখানির পরিচালন-ভার গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় য়ুরোপের শিল্পরাজ্যে কিউবিজম্ (Cubism) 'ত্রিকোণাঙ্কন পদ্ধতি। (Impressionism) 'মুদ্রাঙ্কণ পদ্ধতি (Expressionism) 'ভাবাঙ্কণ পদ্ধতি' প্রভৃতি অতি আধুনিক কলাবিধির প্রচলন সুরু হ'য়েছিল। ১৯২০ সালের মার্চ্চমাসে "The Cabinet of Doc or Caligari) চিত্রখানি শেষ হ'য়ে পর্দ্দার উপর এসে পড়েছিল। Dr. Wiene নিজে তখন Expressionism-এর একান্ত অনুরাগী ছিলেন। চলচ্চিত্র পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁর কোনো অভিজ্ঞতাই ছিলনা। এই ছবিখানি তোলবার সময় তাঁর যে তিনজন সহকারী ছিলেন—Walther Rohrig, Herman Warm ও Walther Reimann তাঁরা তিনজনেই 'কিউবিজ্‌মের' ভক্তশিল্পী। Abstract Art অর্থাৎ নিছক্ শিল্প বা খাঁটি 'কলা-সৌন্দর্য্যের' অনুরাগী তাঁরা, কাজেই চলচ্চিত্র পরিচালনে নেমে তাঁরা যে গতানুগতিক পথে না গিয়ে নিজেদের শিল্প-প্রতিভার দ্বারা সচল ছবির একটা নূতন রূপ সৃষ্টি করবেন এটা খুবই স্বাভাবিক।

ক্যামেরার চক্ষুতে যে কেবল হুবহু বাস্তবের ছায়াটুকুই ধরা পড়ে না, পরিচালকের ইচ্ছামত এই যন্ত্রের চোখও যে স্বপ্ন-ভাবাতুর হ'য়ে উঠতে পারে, চলচ্চিত্রও যে কঠিন বাস্তবের প্রতিরূপ না হ'য়ে শিল্পীর ধ্যানের মূর্ত্তিও পরিগ্রহ করতে পারে, সে যে কল্পনার বস্তু এবং শিল্পীর সৃষ্টি ব'লেও পরিগণিত হ'তে পারে,—আলোকচিত্র হ'লেও তার নাটকীয়তা যে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় এবং জীবনের বাহ্যিক রূপ ছাড়া মানুষের মনস্তত্ত্বের অভিব্যক্তিও যে চলচ্চিত্রে প্রকাশ করা অসম্ভব নয়, এসব নূতন তত্ত্বের সন্ধান The Cabinet of Doctor Caligari" ছবিখানিই চিত্রজগতে সর্ব্বপ্রথম এনে উপস্থিত ক'রেছিল।

আরও একটু বিশদভাবে এ ছবিখানির সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলে বোধ হয় চলচ্চিত্রের শিল্পের দিক ব'লতে কী বোঝায় তা পাঠকদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হ'তে পারে। "The Cabinet of Dotor Caligari" ছবির চিত্রনাট্য রচনা ক'রেছিলেন—Karl Mayer ও Hans Janowitz দু'জনে মিলে। গল্পটি একটা পাগলা গারদের অধ্যাপককে নিয়ে। গল্পের প্রতিপাদ্য বস্তু এবং তার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অনন্য সাধারণ। গল্প বলার ভঙ্গীটিও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক! এ ফিলম্‌খানির বিশেষত্বই হ'চ্ছে যে, গল্পটি যেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে থাকে, দর্শকদের আগ্রহও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে! অন্য কোনো বাজে ব্যাপার দিয়ে বা সস্তার উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে দর্শকদের ভোলাবার চেষ্টা করা হয়নি। পরিচালক Dr. Wein এ ছবির পট-ভূমিকায় বাস্তব দৃশ্যপটের আমদানি করেন নি। কেবলমাত্র প্লেন ক্যানভাস্ এবং সাধাসিধে স্ক্রীনের সাহায্য নিয়েছেন। সরঞ্জামের মধ্যে তিনি এমন সব জিনিসপত্র ব্যবহার ক'রেছেন যা পাগলের চোখেই ভালো লাগতে পারে! অর্থাৎ, তিনি তাঁর প্রত্যেক দৃশ্যে একজন পাগলের নিবাসের আব-হাওয়া সৃষ্টি করবার চেষ্টা ক'রেছেন এবং তাতে সম্পূর্ণ সফলকামও হ'য়েছেন। প্রকৃত শিল্পীর মত তিনি আর একটা কৌশলও এতে দেখিয়েছেন—বর্ণ-বৈচিত্র্যের লীলা! বিভিন্ন রংয়ের সমাবেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিত্রের সৌন্দর্য্য যে কতখানি বাড়তে পারে, তার পরিচয় পাওয়া যায় এ ছবিখানির প্রত্যেক দৃশ্যে! তিনি এমনভাবে নাটকীয় ঘটনার দিকে লক্ষ্য রেখে দৃশ্যগুলিকে সাজিয়েছেন, যাতে নাটকের ও অভিনয়ের অর্থ সহজেই দর্শকদের হৃদয়ঙ্গম হ'তে পারে। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে ঘরের মেঝেয় তিনি মোটামোটা লম্বা লম্বা কালো সাদা লাইন আঁকিয়ে নিয়েছেন, এর ফলে ঘরের যেখানে যে বস্তু বা যে ব্যক্তি থাকবে দর্শকের পরিপূর্ণ দৃষ্টি সেই দিকেই আকৃষ্ট হ'তে বাধ্য হবে। পাগলা-গারদের ভিতরের দেয়াল কেবল কতকগুলি উঁচু লম্বা সরু ও বিবর্ণ প্রাচীর এমনভাবে সাজিয়ে দেখানো হ'য়েছে যাতে সহজেই মনের উপর একটা অসাড় ঔদাসীন্যের ভাব জেগে ওঠে! অফিসের টাউন-ক্লার্কের জন্য তিনি একেবারে ছ'ফুট উঁচু একখানি টুল ব্যবহার ক'রেছেন, এর ফলে সে দৃশ্য দেখলেই বোঝা যাবে যে এই টাউন ক্লার্ক প্রভৃতি নিজেকে মস্ত একটা লোক ব'লে মনে করেন; সহজে কেউ তাঁর কাছে এগুতে পারেনা, —এবং তিনিও কারুর দিকে চট্ করে দৃক্‌পাত করেন না! এমনিতর নানান খুঁটিনাটির ভিতর দিয়েও Dr. Wiene ছবিখানির অর্থ ও পাত্রপাত্রীর চরিত্র পরিস্ফুট ক'রে তুলতে চেষ্টা করেছেন। একেই বলে যথার্থ Artistic Direction! শিল্পের দিক দিয়ে চলচ্চিত্র সেই দিনই যথার্থ উন্নতি লাভ ক'রতে পারবে যেদিন Dr. Wiene'র মত কলাভিজ্ঞ পরিচালকেরা প্রত্যেক ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে তাঁদের শিল্প-প্রতিভার পূর্ণ ব্যবহার ক'রতে পারবেন।

ক্যামেরার কারচুপির গোড়াপত্তন হ'য়েছিল এই সব ছবিতে, আজও তার বিরাম হয়নি। যেমন (Mickey Mouse Cartoon films) কৌতুকাঙ্কন হিসাবে আজও মুখর চলচ্চিত্রের দর্শকদের পর্য্যন্ত আকৃষ্ট ও মুগ্ধ ক'রছে। কিছুদিন আগে Eisensteinএর রুষগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ ছবি 'October'এ ক্যামেরার এই কারচুপি কাজে লাগানো হয়েছিল। রুষসম্রাট Czarএর গভর্ণমেণ্ট ধ্বংশ হওয়ার প্রতীক্ স্বরূপ তাঁর বিরাট মর্ম্মর-মূর্ত্তি মাটিতে পড়ে গিয়ে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেলো, কিন্তু, তৎপরিবর্ত্তে রুষিয়ায় কার্ণেস্কীর Ka neskey অস্থায়ী শাসন-পরিষদ গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভগ্ন মূর্ত্তির প্রত্যেক চূর্ণখণ্ড পরস্পর জোড়া লেগে আবার খাড়া হ'য়ে উঠ্‌লো, যেন কার্ণেস্কীর গভর্ণমেণ্টকে উপহাস করবার জন্য! ডগলস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কসের ছবি "The Thief of Bogdad" (বোগ্দাদের চোর) ফিল্‌মখানিতে এই ক্যামেরার কারচুপি খুব বেশী মাত্রায় দেখানো হয়েছে।

এই ধরণের সব ক্যামেরা-কৌশল দর্শকের মনে একটা বিশেষ কৌতূহল জাগিয়ে তোলে এইজন্য যে, তারা নিশ্চিত জানে যে এটা অসম্ভব, এ রকমটা বস্তুতঃ কখনো হ'তেই পারে না, তবু—সেই ব্যাপারই তাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ ঘটছে দেখে তারা বেশ আমোদ অনুভব করে। মানুষের মনকে এই অবস্থায় নিয়ে এসে অর্থাৎ এমনি ভাবে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়ে ভোলানো চলচ্চিত্র সৃষ্টি হবার আগে অন্যবিধ প্রমোদ ব্যবসায়ীদের মধ্যেও ছিল, যেমন ম্যাজিক্—ইন্দ্রজাল—ঈজীপ্সিয়ান ব্ল্যাক-আর্ট প্রভৃতি।

চলচ্চিত্রে দর্শকদের মনকে মাতিয়ে তোলবার আর একটা প্রধান উপায় হ'চ্ছে গতির প্রতিযোগিতা; অর্থাৎ পলায়ন, পশ্চাদ্ধাবন, ছুটে গিয়ে পলাতককে বন্দী করা বা আততায়ীকে উদ্ধার করা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোথাও গিয়ে পৌছানো, ইত্যাদি! এ সব ব্যাপারে পায়ে হেঁটে ছোটা থেকে সুরু ক'রে ঘোড়ার পিঠে, সাইকেলে, মোটরকারে, মোটর বাঈকে, ট্রেনে, ষ্টীমারে, উড়ো জাহাজে, সবরকম যানবাহনেই ছোটাছুটী দেখানো হয়! এই ছোটাছুটীর উত্তেজনা দর্শকদের মনকেও উত্তেজিত করে' তোলে; গল্পের কথা ভুলে গিয়ে দর্শকের মন এই গতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তন্ময় হয়ে ওঠে। কাজেই Scenario বা 'চিত্রনাট্য' লেখকেরা প্রায়ই তাঁদের গল্পে এই সুযোগটুকু নেবার লোভ সম্বরণ ক'রতে পারেন না। এ সব ছবিতে যত রকম সস্তার উত্তেজনা, খেলো বিস্ময় ও নিম্নশ্রেণীর হাস্যরসের অবতারণা করা হ'ত। এ সব ছবিতে না-ছিল 'টেম্পো', না ছিল নট-নটীর উচ্চ অঙ্গের অভিনয়! পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির দিকেও লক্ষ্য ছিলনা; বিশেষ, এমন কি ফিল্‌ম্ editing অর্থাৎ চিত্রের সম্পাদন কার্য্য, যা' যোগ্য লোকের হাতে ভার পড়লে ছবিখানিকে সকল দিক দিয়ে সুন্দর ক'রে ও নূতন ক'রে সৃষ্টি ক'রতে পারে—তারও বিশেষ কোনো সুব্যবস্থা ছিলনা।

১৯২০ সালে প্রথম একখানি ছবি ও-পারের পর্দ্দার উপর দেখতে পাওয়া গেছলো যা' চলচ্চিত্ররাজ্যের গতানুগতিক পথ ছেড়ে এক নূতন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হ'য়েছিল। সে ছবিতে ছিল কল্পনার ঐশ্বর্য্য, ভাবের মাধুর্য্য ও সৃষ্টির বৈচিত্র্য! সে ছবি সঙ্গে এনেছিল শিল্প-জগতের এক অভিনব সম্পদ, কলা-নৈপুণ্যের এক নবীন পরিচয়, যা গ্রিফিথ্ প্রভৃতি বড় বড় চলচ্চিত্র-পরিচালকেরা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারতোনা! ফিল্‌মের রাজ্যে গ্রিফিথের দান অবশ্য ছোট নয়; যদি শিল্পের দিক দিয়ে ফিল্‌ম আজ কিছুমাত্র উন্নতির পথে এগিয়ে থাকে তবে সেটুকুর জন্য তাকে চিরদিন গ্রিফিথের কাছেই ঋণ স্বীকার ক'রতেই হবে, কারণ গ্রিফিথই সেই প্রথম চলচ্চিত্র-পরিচালক যিনি তাঁর নিজের চোখের সঙ্গে ক্যামেরার দৃষ্টিকেও মেলাতে পেরেছিলেন এবং নিজের ধ্যানের ছবিকে রূপায়িত ক'রে তুলতে পেরেছিলেন। 'সাযুজ্য' 'বিলয়' 'ক্রমবিনাশ' ও 'ক্রমবিকাশ' প্রভৃতি কলা-কৌশল চিত্রজগতে তিনিই প্রথম আমদানী ক'রেছিলেন; কিন্তু এ সব সত্ত্বেও গ্রিফিথের কোনো ছবিই শিল্পের দিক দিয়ে সে আভিজাত্য দাবী ক'রতে পারেনা যা ডাঃ রবার্ট হ্বীয়েনের (Dr. Robert wiene) জার্ম্মাণ ফিলম্—"The Cabinet of Doc or Caligari" শীর্ষক ছবিখানি পেতে পারে। তারপর পাঁচবৎসর আর কোনো ছবি এর সমকক্ষ হ'তে পারেনি; পাঁচবৎসর পরে অর্থাৎ ১৯২৫ সালে সোভিয়েট্ ফিল্‌ম "The Battleship Potemkin" এসে এই ছবিখানির সঙ্গে সমান আসন দাবী ক'রতে পেরেছিল।

বার্লিন থিয়েটারের Decla প্রোডিউসিং কোম্পানীর

পক্ষ থেকে ১৯১৯ সালে ডাঃ হবীয়েনে "The Cabinet of Doctor Caligari" ছবিখানির পরিচালন-ভার গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় য়ুরোপের শিল্পরাজ্যে কিউবিজম্ (Cubism) 'ত্রিকোণাঙ্কন পদ্ধতি। (Impressionism) 'মুদ্রাঙ্কণ পদ্ধতি (Expressionism) 'ভাবাঙ্কণ পদ্ধতি' প্রভৃতি অতি আধুনিক কলাবিধির প্রচলন সুরু হ'য়েছিল। ১৯২০ সালের মার্চ্চমাসে "The Cabinet of Doc or Caligari) চিত্রখানি শেষ হ'য়ে পর্দ্দার উপর এসে পড়েছিল। Dr. Wiene নিজে তখন Expressionism-এর একান্ত অনুরাগী ছিলেন। চলচ্চিত্র পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁর কোনো অভিজ্ঞতাই ছিলনা। এই ছবিখানি তোলবার সময় তাঁর যে তিনজন সহকারী ছিলেন—Walther Rohrig, Herman Warm ও Walther Reimann তাঁরা তিনজনেই 'কিউবিজ্‌মের' ভক্তশিল্পী। Abstract Art অর্থাৎ নিছক্ শিল্প বা খাঁটি 'কলা-সৌন্দর্য্যের' অনুরাগী তাঁরা, কাজেই চলচ্চিত্র পরিচালনে নেমে তাঁরা যে গতানুগতিক পথে না গিয়ে নিজেদের শিল্প-প্রতিভার দ্বারা সচল ছবির একটা নূতন রূপ সৃষ্টি করবেন এটা খুবই স্বাভাবিক।

ক্যামেরার চক্ষুতে যে কেবল হুবহু বাস্তবের ছায়াটুকুই ধরা পড়ে না, পরিচালকের ইচ্ছামত এই যন্ত্রের চোখও যে স্বপ্ন-ভাবাতুর হ'য়ে উঠতে পারে, চলচ্চিত্রও যে কঠিন বাস্তবের প্রতিরূপ না হ'য়ে শিল্পীর ধ্যানের মূর্ত্তিও পরিগ্রহ করতে পারে, সে যে কল্পনার বস্তু এবং শিল্পীর সৃষ্টি ব'লেও পরিগণিত হ'তে পারে,—আলোকচিত্র হ'লেও তার নাটকীয়তা যে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় এবং জীবনের বাহ্যিক রূপ ছাড়া মানুষের মনস্তত্ত্বের অভিব্যক্তিও যে চলচ্চিত্রে প্রকাশ করা অসম্ভব নয়, এসব নূতন তত্ত্বের সন্ধান The Cabinet of Doctor Caligari" ছবিখানিই চিত্রজগতে সর্ব্বপ্রথম এনে উপস্থিত ক'রেছিল।

আরও একটু বিশদভাবে এ ছবিখানির সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলে বোধ হয় চলচ্চিত্রের শিল্পের দিক ব'লতে কী বোঝায় তা পাঠকদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হ'তে পারে। "The Cabinet of Dotor Caligari" ছবির চিত্রনাট্য রচনা ক'রেছিলেন—Karl Mayer ও Hans Janowitz দু'জনে মিলে। গল্পটি একটা পাগলা গারদের অধ্যাপককে নিয়ে। গল্পের প্রতিপাদ্য বস্তু এবং তার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অনন্য সাধারণ। গল্প বলার ভঙ্গীটিও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক! এ ফিলম্‌খানির বিশেষত্বই হ'চ্ছে যে, গল্পটি যেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে থাকে, দর্শকদের আগ্রহও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে! অন্য কোনো বাজে ব্যাপার দিয়ে বা সস্তার উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে দর্শকদের ভোলাবার চেষ্টা করা হয়নি। পরিচালক Dr. Wein এ ছবির পট-ভূমিকায় বাস্তব দৃশ্যপটের আমদানি করেন নি। কেবলমাত্র প্লেন ক্যানভাস্ এবং সাধাসিধে স্ক্রীনের সাহায্য নিয়েছেন। সরঞ্জামের মধ্যে তিনি এমন সব জিনিসপত্র ব্যবহার ক'রেছেন যা পাগলের চোখেই ভালো লাগতে পারে! অর্থাৎ, তিনি তাঁর প্রত্যেক দৃশ্যে একজন পাগলের নিবাসের আব-হাওয়া সৃষ্টি করবার চেষ্টা ক'রেছেন এবং তাতে সম্পূর্ণ সফলকামও হ'য়েছেন। প্রকৃত শিল্পীর মত তিনি আর একটা কৌশলও এতে দেখিয়েছেন—বর্ণ-বৈচিত্র্যের লীলা! বিভিন্ন রংয়ের সমাবেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিত্রের সৌন্দর্য্য যে কতখানি বাড়তে পারে, তার পরিচয় পাওয়া যায় এ ছবিখানির প্রত্যেক দৃশ্যে! তিনি এমনভাবে নাটকীয় ঘটনার দিকে লক্ষ্য রেখে দৃশ্যগুলিকে সাজিয়েছেন, যাতে নাটকের ও অভিনয়ের অর্থ সহজেই দর্শকদের হৃদয়ঙ্গম হ'তে পারে। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে ঘরের মেঝেয় তিনি মোটামোটা লম্বা লম্বা কালো সাদা লাইন আঁকিয়ে নিয়েছেন, এর ফলে ঘরের যেখানে যে বস্তু বা যে ব্যক্তি থাকবে দর্শকের পরিপূর্ণ দৃষ্টি সেই দিকেই আকৃষ্ট হ'তে বাধ্য হবে। পাগলা-গারদের ভিতরের দেয়াল কেবল কতকগুলি উঁচু লম্বা সরু ও বিবর্ণ প্রাচীর এমনভাবে সাজিয়ে দেখানো হ'য়েছে যাতে সহজেই মনের উপর একটা অসাড় ঔদাসীন্যের ভাব জেগে ওঠে! অফিসের টাউন-ক্লার্কের জন্য তিনি একেবারে ছ'ফুট উঁচু একখানি টুল ব্যবহার ক'রেছেন, এর ফলে সে দৃশ্য দেখলেই বোঝা যাবে যে এই টাউন ক্লার্ক প্রভৃতি নিজেকে মস্ত একটা লোক ব'লে মনে করেন; সহজে কেউ তাঁর কাছে এগুতে পারেনা, —এবং তিনিও কারুর দিকে চট্ করে দৃক্‌পাত করেন না! এমনিতর নানান খুঁটিনাটির ভিতর দিয়েও Dr. Wiene ছবিখানির অর্থ ও পাত্রপাত্রীর চরিত্র পরিস্ফুট ক'রে তুলতে চেষ্টা করেছেন। একেই বলে যথার্থ Artistic Direction! শিল্পের দিক দিয়ে চলচ্চিত্র সেই দিনই যথার্থ উন্নতি লাভ ক'রতে পারবে যেদিন Dr. Wiener মত কলাভিজ্ঞ পরিচালকেরা প্রত্যেক ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে তাঁদের শিল্প-প্রতিভার পূর্ণ ব্যবহার ক'রতে পারবেন।

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

শৈশবে আত্মীয়-পরিজনের মুখে রাণী ভবানীর নাম শ্রদ্ধা সহকারে উচ্চারিত হইতে শুনিতাম, শৈশবসহচরদিগের সহিত রাণী ভবানীর প্রসঙ্গের আলোচনা করিতাম। আলোচনার বিষয় কি তাহা মনে নাই; কিন্তু রাণী ভবানীর প্রসঙ্গ মাত্রেই শিশু-হৃদয় যে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে দ্রবীভূত হইয়া যাইত (এখনও যায়) তাহা বেশ মনে আছে।

তাহার পর বিদ্যালয়ে বাঙ্গলার ইতিহাসে রাণী ভবানীর কীর্ত্তিকাহিনী পাঠ করিলাম। অবশেষে পলাশীর যুদ্ধ-কাব্যে "রাণীর কি মত, শুনি সুপ্তোত্থিত-প্রায়" পাঠ করিয়া সেই শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সেই হইতে রাণী ভবানী ও নাটোর নাম উচ্চারিত হইতে শুনিলেই শৈশব কালের ন্যায় এখনও হৃদয় শ্রদ্ধায় দ্রবীভূত হইয়া যায়।

অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে রাণী ভবানীর বংশধর মহারাজ রামকৃষ্ণের সাধনার কথা জানিতে পারিলাম। অর্দ্ধবঙ্গের অধীশ্বর বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠতম জমিদারবংশীয়, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা মহারাজ রামকৃষ্ণ বিপুল সম্পত্তি তুচ্ছ করিয়া অপার্থিব ধন লাভের জন্য সাধনা করিয়াছিলেন; তাহা রাণী ভবানীরই বংশধরের উপযুক্ত বটে। সেই রাণী ভবানীর অন্যতম বংশধর মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের—ইনিও অদ্বিতীয় সাধক—জীবন-কথার আলোচনার সুযোগ পাইয়া আজ "ভারতবর্ষ" (এবং সঙ্গে সঙ্গে এ অধমও) ধন্য হইল।

নাটোর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রঘুনন্দন মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ানী করিয়া বিপুল সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন এই বংশের প্রথম রাজা। তাঁহার পুত্র কালিকাপ্রসাদ এবং রাজা রঘুনন্দনের পুত্র ভবানীপ্রসাদ। কালিকাপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ উভয়েরই মৃত্যু হইলে রামজীবন রামকান্তকে দত্তক গ্রহণ করেন। রাণী ভবানী রামকান্তের পত্নী। তাঁহার পোষ্যপুত্র রাজা রামকৃষ্ণ। রাজ-সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণের দুই পুত্র রাজা বিশ্বনাথ (বড় তরফ) ও রাজা শিবনাথ। বিশ্বনাথের পোষ্যপুত্র গোবিন্দচন্দ্র গোবিন্দনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। রাজা গোবিন্দনাথ অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তর গমন করে পত্নী ব্রজসুন্দরীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়া যান। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ সেই পোষ্যপুত্র।

নাটোরের নিকটবর্ত্তী হরিশপুরনিবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীনাথ রায়ের পুত্র ব্রজনাথ দত্তক গৃহীত হইয়া মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ হইয়াছিলেন। দেড় বৎসর বয়স্ক শিশু ব্রজনাথকে রাণী ব্রজসুন্দরী নিজ গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় লালন পালন করিয়াছিলেন। জগদিন্দ্রনাথও তাঁহাকে জননী বলিয়াই জানিতেন।

সন ১২৭৫ সালের ৪ঠা কার্ত্তিক সোমবার (২৬শে অক্টোবর, ১৮৬৮) নাটোরের এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী হরিশপুর —সংক্ষেপে হরিপুরে—দরিদ্র কিন্তু সৎকুলজাত শ্রীনাথ রায়ের ঔরসে ব্রজনাথের জন্ম হয়। আঠারো মাস বয়সে দত্তক গৃহীত হইয়া তিনি রাজধানী নাটোরে আনীত হইলেন। সেই দিন হইতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান ব্রজনাথ হইলেন মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ। নাটোর রাজবংশের রাজোপাধি বাদশাহের প্রদত্ত। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম দিল্লী দরবারে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের মহারাজা উপাধির অনুমোদন করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নাটোরের নিকটবর্ত্তী জদ্দনী নামক স্থানে ক্যাম্পে একটি দরবার করিয়া মহারাজকে উপাধির সনন্দ ও খেলাৎ প্রদান করা হয়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জগদিন্দ্রনাথ শিক্ষালাভার্থ রাজসাহীতে আগমন করিয়া রাজসাহী কলিজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। ঐ স্কুলের অন্যতম শিক্ষক শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার গৃহশিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ স্বীয় বংশ, আভিজাত্য ও পদমর্য্যাদার উপযোগী সুশিক্ষাও লাভ করেন। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী লিখিয়াছেন, তিনি যখন একবার তাঁহার জননীর সহিত মহারাজার কলিকাতার

বাড়ীতে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ অনুরূপা দেবীর জননীকে প্রণাম করিতে আসেন। সেই সময়ে মহারাজ অনুরূপা দেবীর জননীকে বলিয়াছিলেন, "মা, আমি আপনার শ্বশুরের (স্বর্গীয় ভূদেব বাবুর) একজন মস্ত ভক্ত।" এই ভক্তির কারণ তিনি এইরূপ বিবৃত করিয়াছিলেন যে, মহারাজের বয়স যখন আট বৎসর তখন ভূদেব বাবু একবার নাটোরে আসিয়াছিলেন। মহারাণী ব্রজসুন্দরী ভূদেব বাবুকে রাজবাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করাইলেন। আহারাদির পর তিনি ভূদেব বাবুকে বলিয়া পাঠাইলেন যে কুমারের পড়াশুনা ভাল হচ্ছে না। আপনি যদি দয়া করে একবার তাকে পরীক্ষা করে দেখেন ও কি ভাবে শিক্ষা দিলে মানুষ হতে পারে বলে দেন, তবে বড়ই উপকৃত হই। পরীক্ষান্তে ভূদেব বাবু কুমারকে কাছে নিয়ে খুব আদর করে বলেছিলেন, "মস্ত বড় বংশের সম্মানরক্ষা করতে হবে তোমায়। রাণী ভবানী, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি যে রাজবংশকে চরিত্র-মাহাত্ম্যে, দান ও ত্যাগের দ্বারা প্রাতঃস্মরণীয় করে গেছেন, তোমার দ্বারা সেই সংসারের পবিত্রতা যেন নষ্ট না হয়।" ভূদেব বাবু কুমারের শিক্ষককে এইরূপ উপদেশ দেন যে, কুমারের বংশমর্য্যাদা জ্ঞানটা যাতে বৃদ্ধি পায় তা করবেন। 'আমাদের বংশে এরূপ কাজ করা সম্ভবে না' এই লজ্জা মনে থাকলে অনেক নীচতা হতে লোক রক্ষা পায়; দয়া দাক্ষিণ্য, দেব-অতিথি-সেবা, আর্ত্তত্রাণ ও বিদ্যাদান প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়। ভূদেব-বাবুর উপদেশ ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই পালন করিয়াছিলেন—শৈশবের সেই উপদেশের ফলেই মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের 'অসাধারণ' চরিত্র গঠিত হইয়াছিল—আভিজাত্য ও democracyর অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটিয়াছিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জগদিন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। বিবাহের দুই একদিন পূর্ব্বে ভূমিকম্পে উত্তরবঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং নাটোর রাজধানীর প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি ভূমিসাৎ হয়। মহারাজের বিবাহ উপলক্ষে রাজধানীতে বহু আত্মীয় কুটুম্বের সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অল্পাধিক আহত হইয়াছিলেন। বিবাহের পর বৎসর জগদিন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এই সময়ে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন প্রবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে নাটোরে একটি আন্দোলন-সভা হয়। সুরেন্দ্রনাথের আহ্বানে জগদিন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন। নাটোর রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন বক্তা। উত্তরকালে জগদিন্দ্রনাথ ধনী এবং জমিদার হইয়াও যে অকুতোভয়ে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন, নাটোরের এই রাজনীতিক সভায় তাহার প্রথম সূত্রপাত হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জগদিন্দ্রনাথ শারীরিক অসুস্থতার জন্য এক বৎসর পড়াশুনা করিতে পারেন নাই। পর বৎসর এফ-এ পড়িবার জন্য কলেজে ভর্ত্তি হইলেন বটে, কিন্তু বেশী দিন পড়া চলিল না। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কলেজ ত্যাগ করিয়া তিনি রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই বৎসরই তিনি আইনানুযায়ী সাবালক বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ইহার পর সরিকী গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ নাটোর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। ইতোমধ্যে তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হয়। পরে সন ১৩০০ সালের আশ্বিন মাসে মহারাজকুমারী শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর জন্ম হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ময়মনসিংহস্থিত স্বীয় জমিদারী পরিদর্শনানন্তর ভারত ভ্রমণে বাহির হন; এবং এক বৎসরের অধিক কাল বিদেশে থাকিয়া পাটনা, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, বোম্বাই, পুণা, হায়দরাবাদ, বরোদা, জয়পুর ও দিল্লী পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই বৎসর রাজসাহী বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের পক্ষ হইতে মহারাজ নাটোর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তৎকালে ব্যবস্থাপক সভায় দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ লালমোহন ঘোষ, মিঃ আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী ছিলেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বসন্তরোগ সংক্রামকভাবে দেখা দেয়। সেইজন্য মহারাজ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া নাটোরে গমন করিয়া কিছু দিন বাস করেন। এই বৎসরের

শেষভাগে মহারাজ পুনরায় দেশভ্রমণে বাহির হন এবং কাশ্মীর, জম্মু, অমৃতসর, লাহোর, পেশোয়ার, আলি মসজিদ, খাইবার পাশ, জামরুদ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ৬নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ী ভাড়া লইয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই বৎসর মার্চ্চ মাসে এই বাড়ীতে মহারাজকুমার (বর্ত্তমান মহারাজা) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন। পরে ৮০ হাজার টাকা মূল্যে এই বাটী ক্রয় করা হয়।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী বিভাগের জেলাবোর্ডসমূহের প্রতিনিধিস্বরূপ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই বৎসর নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। দিঘাপতিয়ার স্বর্গীয় রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুরের সহযোগে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় সম্মিলনীকে নাটোরে আহ্বান করিয়াছিলেন। সম্মিলনীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য উভয়ে যত্ন ও অর্থব্যয়ে ত্রুটি করেন নাই এবং তাঁহাদের ব্যয় সার্থক হইয়াছিল, যত্ন সফল হইয়াছিল, অধিবেশন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রথম বাঙ্গালী সিবিলিয়ান, অবসরপ্রাপ্ত জজ স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সম্মিলনীর সভাপতি হইয়াছিলেন। নানা কারণে এই সম্মিলনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গলার ধনী জমিদার ও রাজারাজড়ার মধ্যে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ এই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন। মহারাজ সম্মিলনীর সাফল্যের জন্য এতই পরিশ্রম করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বলিষ্ঠ শরীর ও সুন্দর স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কল্পে তিনি এক বৎসর কাল সিমলা শৈলে বাস করিতে বাধ্য হন।

এ যাবৎ বাঙ্গলার রাজনীতিক আন্দোলন আলোচনা এবং কংগ্রেস কনফারেন্স, সভাসমিতির কার্য্য ইংরেজী ভাষায় নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছিল। বাঙ্গলার মনোভাব যে বাঙ্গলা ভাষাতেই ব্যক্ত হওয়া কর্ত্তব্য, সেকালের রাজনীতিকরা তখনও তাহা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই সময় হইতে নব্য রাজনীতিকরা বাঙ্গলা ভাষাতে রাজনীতিক আন্দোলন পরিচালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহাদের অগ্রণী। কংগ্রেস কনফারেন্সে দেশবাসীর মনোভাব প্রকাশের বাহন কি হইবে, তাহা লইয়া প্রবীণ ও নবীন রাজনীতিকদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। নাটোর কনফারেন্সে এই বিরোধ সর্ব্বপ্রথম মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করে। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ নবীন দলের সহিত সম্পূর্ণ একমত ছিলেন যে, ভাষার স্বাধীনতা না থাকিলে মনের স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নহে। যত দিন রাজনীতিক আন্দোলন ইংরেজী ভাষায় চলিবে, তত দিন আমাদিগের ইংরেজের শেখানো মুখস্থ কথার আবৃত্তি করা ছাড়া প্রকৃত কাজ বিশেষ কিছুই হইবে না। নাটোর কনফারেন্সে বাঙ্গলা ভাষা যাহাতে তাহার যথাযোগ্য আসন লাভ করে রবীন্দ্রনাথ সেই চেষ্টা করিতেছিলেন; এবং সে প্রচেষ্টায় জগদিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায় হন। মহারাজের সহায়তায় দুঃখিনী বঙ্গভাষা কংগ্রেসে রাজাসন লাভ করেন। রাজনীতির আসরে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজিও তাহা সম্ভব হইল না, ইহা যেমন দুঃখের কথা, তেমনি বাঙ্গলার পক্ষে লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। সেই রবীন্দ্রনাথ আছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষার প্রবর্ত্তনে তাঁহার সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ কই ?

বাঙ্গলা ভাষার প্রতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের কতখানি আন্তরিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল, কনফারেন্সের এই ঘটনা হইতেই তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি এই অনুরাগই উত্তর কালে মহারাজকে "মানসী"র সম্পাদকের পদ গ্রহণে প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

নাটোরের প্রাদেশিক কনফারেন্স আরও একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। কনফারেন্সের শেষ দিনে বঙ্গব্যাপী ভীষণ ভূমিকম্প হয়। কনফারেন্সে তৎকালীন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মনস্বীবর্গের সমাবেশ হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে প্রতিনিধিরা অস্থায়ী মণ্ডপে ছিলেন, তাই রক্ষা; নচেৎ বাঙ্গলা বোধ হয় এক দিনে বহু শ্রেষ্ঠ সন্তানে বঞ্চিতা হইতেন। এই ভূমিকম্পই মহারাজের স্বাস্থ্যভঙ্গের একটা কারণ; ইহার ফলে তাঁহার শিরোঘূর্ণন রোগ জন্মিয়াছিল। এক বৎসর সিমলায় বাস করিয়া তিনি পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করেন। ভূমিকম্পের পূর্ব্বে কনফারেন্সের সাফল্যের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম-

নিত ক্লান্তি বশতঃই যে স্বভাবতঃ সুস্থ ও সবল মহারাজ ই রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে ারে। সিমলায় সপরিবারে বাস করিবার সময়ে তিনি তিন মাস আগ্রায় অবস্থিতি করিয়া বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল, থুরা, বৃন্দাবন, সেকন্দরা প্রভৃতি প্রাচীন বাদশাহী কীর্ত্তি কল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ মহারাজ সূর্য্যকান্ত াচার্য্য চৌধুরী, স্যার আশুতোষ চৌধুরী ও দিঘাপতিয়ার াজা স্বর্গীয় প্রমদানাথ রায়ের সহযোগে "বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন" স্থাপন করেন। বাঙ্গলার অভিজাত রাজনীতিক কর্ম্মক্ষেত্রে এই সভা পূর্ব্ববর্ত্তী "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের"র প্রতিযোগী হইয়া াঁড়াইয়াছিল।

এই বৎসর কলিকাতার বিডন উদ্যানে জাতীয় মহাসমিতির ষোড়শ অধিবেশন ও তৎসহ একটি শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। এই কংগ্রেস উপলক্ষে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার অনন্যসাধারণ রাজনীতিজ্ঞতার নিদর্শন পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

ইহার দুই বৎসর পরে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বহরমপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে (এবারেও যেখানে রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন হইয়া গেল) সভাপতির কার্য্য করেন। সেবারকার অভিভাষণও মহারাজেরই উপযুক্ত হইয়াছিল। সম্মেলন অন্তে, প্রত্যাবর্ত্তন কালে, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ নাটোর রাজবংশের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী বড়নগরে থাকিয়া রাণী ভবানীর কীর্ত্তিরাশির ভগ্নাবশেষ প্রাচীন শিবমন্দির, রাজরাজেশ্বরীর মন্দির প্রভৃতি পরিদর্শন করেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পাবনা জামিরতানিবাসী শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ীর সহিত মহারাজকুমারী শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর শুভ বিবাহ হয়। এই বৎসর কলিকাতা টাউন হলে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ কল্পে একটি বিরাট সভা আহূত হয়। টাউন হলের উপর তলায় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় একটি overflow meeting হয়। উপরের সভায় রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং overflow meetingএ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ সভাপতি হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের অনুকূল সকল যুক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দিয়াছিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে মণ্টফোর্ড স্কীম অনুসারে ব্যবস্থাপিত নূতন কাউন্সিলে মহারাজ সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তৎপর-বৎসর নাটোর প্রাসাদে নূতন শাসন ব্যবস্থানুযায়ী বাঙ্গলার প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেলের অভ্যর্থনা করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ পাবনা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির কার্য্য করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ নাটোর রাজপ্রাসাদে বঙ্গের তৎকালীন গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডশের মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই নাটোরবাসীরা স্বয়ং মহারাজের অভ্যর্থনা করেন। ১৯২৫ সালের ইষ্টার পর্ব্বের অবকাশে মহারাজ বিক্রমপুর—মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য-সম্মেলনে মূল সভাপতির কার্য্য করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে ইহাই তাঁহার শেষ সাধারণ কার্য্য। তাঁহার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী দেশবন্ধু সি, আর, দাস মহাশয় এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

মহারাজের জীবনের দুইটি রূপ অতি স্পষ্ট—একটি তাঁহার মহারাজ রূপ; অপরটি তাঁহার সাধারণ ভদ্রলোকের রূপ। জমিদারীর কার্য্য পরিচালনে, প্রজাবর্গের সহিত ব্যবহারে, রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত আলাপ-সম্ভাষণে, রাজদরবারে, মহালে তাঁহার জমিদার বা রাজমূর্ত্তি দেখা যাইত। আর সাহিত্যের আসরে, বন্ধু বান্ধবের বৈঠকে তিনি সাধারণ ভদ্রলোক রূপে প্রতিভাত হইতেন। তাঁহার সকল বন্ধু, সকল পরিচিত ভদ্রলোক একবাক্যে এই কথা বলিয়াছেন যে, আলাপের পূর্ব্বে বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজাতবংশীয়, অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর বংশধর মহারাজ জগদিন্দ্রনাথকে তাঁহারা ভয় ও কুণ্ঠার সহিত নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে সাহস করেন নাই। কিন্তু মহারাজ নিজের ব্যবহারে সে আতঙ্ক, সে কুণ্ঠা জয় করিয়া তাঁহাদিগকে সমাদরে নিজের কোলের কাছে টানিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত একাসনে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া গল্পগুজব, হাসিতামাসা, রঙ্গরস করিয়াছেন। তিনি যে মহারাজ, তিনি যে এতবড় বংশের বংশধর,

তিনি যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের সমাজপতি, তাহা কেহই তাঁহার ব্যবহারে লক্ষ্য করিবার অবসর পান নাই।

আবার যখন তিনি প্রজাদের লইয়া দরবার করিয়াছেন, মহাল পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন, তখন রাজোচিত আড়ম্বরের সীমা-পরিসীমা থাকিত না—হাতী ঘোড়া, লোক-লস্কর, পাইক-বরকন্দাজ প্রভৃতির বিশাল সমারোহ হইত। এই দুই রূপেই তিনি যে-কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কখনই আত্মবিস্মৃত হন নাই,—স্বর্গীয় ভূদেব বাবুর উপদেশ লঙ্ঘন করেন নাই,—বংশগৌরবের অমর্য্যাদা করেন নাই; অথচ, অহঙ্কার, অভিমান, গর্ব্ব, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া কখনও কাহাকেও মনঃপীড়া দেন নাই,—তিনি যে সাধারণ লোকদের হইতে বহু—বহু উর্দ্ধে অবস্থিত, এরূপ মনে করিবার সুযোগ বা অবসর কখনও কাহাকেও দেন নাই। ইহাই মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের চরিত্রের বিশেষত্ব। বাঙ্গলার আর কোন জমিদারবংশীয় ধনী সন্তানের মধ্যে এই বিচিত্র রূপ বা দৃষ্টান্ত কখনও দেখা গিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। বস্তুতঃ মহারাজ—ব্রজনাথ ও জগদিন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব সম্মিলন। মহারাজের পরলোকান্তে স্বর্গীয় অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই মহোদয় মহারাজের স্মৃতি-লিপিতে এই রূপটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় মহারাজের প্রায় সকল বন্ধুই তাঁহার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, মহারাজ সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব অসাধারণ ছিল। তাঁহার ন্যায় অতিথিবৎসল লোক খুব কমই দেখা যায়। তাঁহার আতিথেয়তা সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—সেবারে (নাটোরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী উপলক্ষ্যে সব চেয়ে যাহা আমরা উপভোগ করিয়াছিলাম, সে তাঁহার আতিথ্যের আয়োজন নহে, আতিথ্যের রস। এই আতিথ্যের রসটি কিরূপ উপভোগ্য হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহারও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠানে সকল দলের সম্মিলিত দায়িত্ব যেখানে, সেখানে নিমন্ত্রিত অভ্যাগত ব্যক্তিরা নিজেদের দায়িত্ব ভুলিয়া বরযাত্র-সুলভ মেজাজের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না—নাটোর সম্মিলনীতেও তাহাই ঘটিয়াছিল। মহারাজ কিন্তু প্রসন্ন চিত্তে সকলের সকল আবদার শুনিয়া তাহা পূরণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। তাহার পর ভূমিকম্পে যখন সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল তখন, রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়—"যিনি গৃহস্বামী এই দুর্ব্বিপাকে নিঃসন্দেহই নিজের সংসারের জন্য তাঁহার উদ্বেগের সীমা ছিল না। কিন্তু নিজের ক্ষতি ও বিপত্তির চিন্তা তাঁহার মনের মধ্যে যে আলোড়িত হইতেছিল বাহির হইতে তাহা কে বুঝিবে? বিধাতা তাঁহার আতিথেয়তার যে কি কঠিন পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি, আর সেই পরীক্ষায় তিনি যে কিরূপ সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাও আমাদের মনে পড়ে।" এত বড় বিপদে মহারাজ কিরূপ ধীরভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা, এই সম্মিলনের প্রসঙ্গে দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—প্রবল ভূমিকম্পে উত্তরবঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়া গেল, নাটোর ও দিঘাপতিয়ার রাজবাড়ী চূর্ণ হইয়া গেল—আমার দাদা (রাজা প্রমদানাথ রায়) এই আকস্মিক বিপদে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। মহারাজেরও প্রায় তুল্য বিপদ উপস্থিত হইলেও, তিনি দিঘাপতিয়া আসিয়া আমার দাদাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন।

মহারাজের জ্ঞানস্পৃহা অদম্য ছিল। তিনি ছিলেন চিরদিন—ছাত্র। সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁহার বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার সহিত কথোপকথন কালে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। যে-কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হউক না কেন, সেই বিষয়েই তিনি এমন নূতন তথ্য সকল প্রকাশ করিতে পারিতেন যে, সেই সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণও চমৎকৃত হইয়া যাইতেন। সেই জন্য সকলেই তাঁহাকে "cultured gentleman" বলিয়া স্বীকার করিতেন। মহারাজের একটি সুবৃহৎ লাইব্রেরী ছিল। লাইব্রেরীর বইগুলি কেবল গৃহের শোভা সম্পাদনার্থ সংগৃহীত হয় নাই—মহারাজ তাহার প্রত্যেকখানি তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা সংস্কৃত সাহিত্য তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একবার এক বন্ধু-বৈঠকে কথা প্রসঙ্গে মা দুর্গার কোন্ দিকে লক্ষ্মী-সরস্বতী এবং কার্ত্তিক-গণেশের মূর্ত্তি অবস্থিত এই তর্ক উঠিলে তিনি মধুর কণ্ঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণে নির্ভুলভাবে দশ-পনেরো মিনিট ধরিয়া সমগ্র দুর্গার ধ্যানটি আবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত করিয়া

দিয়াছিলেন। যিনি নিজে জ্ঞানলাভের জন্য এত আগ্রহশীল তিনি যে অপরকে জ্ঞান দান করিবার জন্য সমান আগ্রহান্বিত হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন; বহু ছাত্রকে নিয়মিত ভাবে অর্থ-সাহায্য করিতেন, এবং একটি বিদ্যার্থীকে এককালীন পনেরো হাজার টাকা অগ্রিম প্রদান করিয়া শিক্ষালাভার্থ বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কেবল কি ইহাই? পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানীর স্মৃতির উদ্দেশে কলিকাতায় স্থাপিত রাণী ভবানী স্কুলে দুই বৎসর ধরিয়া সপ্তাহে দুই দিন তিনি উপর ক্লাশের ছাত্রদিগকে ইতিহাস পড়াইয়াছিলেন।

জাতীয়তা, দেশাত্মবোধ তাঁহার আর একটি গুণ। কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সে বাঙ্গলা ভাষার প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি কি করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। সেটা ভাষা ও সাহিত্যের দিক। তদ্ব্যতীত অন্য দিকেও জাতীয়তার উদ্বোধনের জন্য তিনি অনেক কিছুই করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটা—এবং এইটাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান—তাঁহার Natore Eleven। এই জিনিসটি কি তাহা বোধ হয় প্রবীণ পাঠকরা এখনও ভুলিয়া যান নাই; কিন্তু তরুণ সম্প্রদায়ের সকলের বোধ হয় এইটি জানা নাই। শরীর-চর্চ্চা যে আমাদের বিশেষ আবশ্যক, তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি কুস্তি, ডন, মুগুরভাঁজা, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, লাঠি, মুষ্টিযুদ্ধ, ক্রিকেট (ফুটবল তখনও প্রচলিত হয় নাই) প্রভৃতি বলব্যঞ্জক ক্রীড়া-কৌতুকে নিজেও যেমন অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, সমবয়স্ক বয়স্য ও অন্যান্য লোকদিগকেও সেইরূপ অভ্যস্ত করাইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার লাঠিখেলার অদ্ভুত নৈপুণ্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, একদিন রাজসাহী সহরে রাত্রি দশ ঘটিকার সময় শশধর বাবু ও তিন চারিজন বন্ধু মহারাজের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। কথায় কথায় মহারাজ বলিলেন, আমি ছড়ি হাতে করিয়া দাঁড়াই, আপনারা সকলে আমাকে লক্ষ্য করিয়া কাপড়ের বল ছুঁড়ুন। আমার গায়ে বল লাগাইতে পারিলে আমি বাজি হারিব। তৎক্ষণাৎ একগাছি ছড়ি ও পাঁচ-সাতটি কাপড়ের বল একজন ভৃত্য আসিয়া দিয়া গেল। মহারাজ ছড়ি-হস্তে এক দিকে দাঁড়াইলেন, বন্ধুরা অপর দিকে দাঁড়াইয়া বল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহারাজ এমন দক্ষতার সহিত ছড়ি ঘুরাইতে লাগিলেন যে একটি বলও তাঁহার গাত্রে লাগিল না। লাঠি ঘুরাইয়া বল ঠেকাইতে হইলে চিত্তের একাগ্রতা, বিচারবুদ্ধির ক্ষিপ্রতা, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও দ্রুত সঞ্চালনশক্তি প্রভৃতি অনেকগুলি গুণের দরকার হয়। তা ছাড়া অতি লঘু হস্তে অতি দ্রুত দেহের সর্ব্বদিকে হস্ত সঞ্চালন করিতে হয়ই। অপর একদিন কথা-প্রসঙ্গে মহারাজ শশধর বাবুকে বলিয়াছিলেন যে, রেলে কিম্বা পথে-ঘাটে যাতায়াতের সময় সাহেবপুঙ্গবদিগের সহিত ঝগড়া হইবার সম্ভাবনা। সে সময় সাহেবদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকে এই সকল শিখিতে হইয়াছে। একবার, (১৩০১) দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়ের বিবাহোৎসবের সময়, বিবাহ-বাটীতে বাজে লোকের ভীড় নিবারণের জন্য রাজা প্রমদানাথ বিবাহবাটীর ফটকে দুইজন নূতন ভোজপুরী দ্বারবান নিযুক্ত করাইয়াছিলেন। তাহারা কিন্তু তাহাদের মুনিবকে চিনিত না—মফস্বলের এক কাছারী হইতে তাহারা আমদানী হইয়াছিল। বরের তাঞ্জামের পশ্চাতে পদব্রজে বরযাত্রীরা—সর্ব্বাগ্রে মহারাজ, রাজা প্রমদানাথ প্রভৃতি বরযাত্রীদের পরিচালন করিতেছিলেন। বরের তাঞ্জাম বিবাহবাটীতে প্রবেশ করিবার পর দ্বারবানরা পূর্ব্ব আদেশানুযায়ী, বাজে লোক মনে করিয়া মহারাজ, রাজা প্রমদানাথ প্রভৃতিকে আটক করিল। রাজা প্রমদানাথ ও তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা দ্বারবানদের তিরস্কার করিতে এবং তাঁহারাই যে তাহাদের মুনিব এই কথা তাহাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কোঁচার খুঁট গুঁজিয়া, কোমরে চাদর জড়াইয়া ও জামার আস্তিন গুটাইয়া ভোজপুরী দ্বারবানদিগের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পালোয়ান জগদিন্দ্রনাথ ভোজপুরী-দিগের সম্মুখে পিছু হটিতে রাজী হইলেন না। অবশেষে দ্বারবানদিগের নিয়োগকারী ও উপদেষ্টা কাছারীর কর্ম্মচারীরা আসিয়া দ্বারবানদিগকে নিরস্ত করেন। রাজা প্রমদানাথ তাহাদিগকে বরখাস্ত করিতে উদ্যত হইলে জগদিন্দ্রের আর এক মূর্ত্তি দেখা গেল। তিনি তখন

দ্বারবানদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, দ্বারবানরা তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া, প্রমদানাথের ক্রোধশান্তি করিলেন।

শরীরচর্চ্চামূলক অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে Natore Eleven বা নাটোর মহারাজার ক্রিকেট খেলোয়াড়ের দলই সর্ব্বপ্রধান। তৎকালে ভারতবর্ষে যতগুলি দেশীয় ক্রিকেটের দল হইয়াছিল, সাহেবদের সঙ্গে খেলায় তাহারা কিছুতেই পারিয়া উঠিত না। কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, পাতিয়ালার মহারাজা, প্রিন্স রণজিৎ সিংজী প্রভৃতি ক্রিকেটবীরগণের পরিচালিত দুই চারিটি ভাল ক্রিকেটের দল ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের কোনটাই কেবলমাত্র ভারতীয়দিগের দ্বারা গঠিত ছিল না—সব কয়টি দলেই কয়েকজন করিয়া বিদেশী ক্রিকেট খেলোয়াড় থাকিত। মহারাজ জগদিন্দ্রের চক্ষে ইহা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু বলিয়া ঠেকিল। তখন তিনি কেবলমাত্র ভারতীয়দিগের দ্বারা একটি বিশুদ্ধ ভারতীয় ক্রিকেট দল গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। বালীগঞ্জে নাটোর পার্ক নামে তাঁহার যে উদ্যানবাটিকা ছিল, বহু সহস্র মুদ্রাব্যয়ে তাহাকে ক্রিকেট ফীল্ডে পরিণত করিলেন, এবং প্রতি বৎসর আরও সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে বাছা বাছা ক্রিকেট খেলোয়াড়দিগকে একত্র করিয়া Natore Eleven নামে একটি ক্রিকেট টীম গঠন করিলেন। এই দলটি একরূপ অপরাজেয়ই হইয়াছিল। বহু ইয়োরোপীয়ান ক্লাবকে খেলায় পরাজিত করিয়া নাটোরের ক্রিকেট খেলোয়াড় দল ভারতবর্ষের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। যেরূপ মনোভাবের ফলে, যেরূপ জাতীয়তার প্রণোদনে ইহা সম্ভব হইতে পারে, তাহা একমাত্র নাটোর ব্যতীত, ভারতীয় অন্য কোন ধনী, জমিদার, রাজা বা মহারাজার দেখা যায় নাই।

মহারাজের দেশাত্মবুদ্ধি, মহারাজের স্বাজাত্য এতই বেশী ছিল যে, তাহার খাতিরে তিনি অতি দুর্গম স্থানে গমন করিতে বা অতি দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দেশের আহ্বানে, জাতির আহ্বানে, কর্ত্তব্যের আহ্বানে তিনি অনেক অসাধ্যসাধনও করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং যেমন সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন, গুণীর আদর করিতেও তেমনি জানিতেন। তিনি স্বয়ং চিত্রকর ছিলেন না বটে, কিন্তু চিত্রকলা বুঝিতেন ও চিত্রশিল্পীর আদরও করিতেন। তিনি স্বয়ং কবি ছিলেন, তাঁহার কাব্য "সন্ধ্যাতারা" কবিত্বের ঝঙ্কারে সমুজ্জ্বল। তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতবহুল শব্দসম্পদ ও বঙ্কিমের লালিত্য তাঁহার গদ্য রচনায় একত্র হইয়া যে লীলায়িত তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাঁহার "শ্রুতিস্মৃতি"তে তাহার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। তিনি অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক,—"দারার দুরদৃষ্ট" ও "নূরজাহান" তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। তিনি নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক—বহুবর্ষব্যাপী "মানসী" এবং "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র সুসম্পাদনই তাহার নিদর্শন। সঙ্গীতালোচনায় তিনি ভারতের বড় বড় ওস্তাদগণের সমকক্ষতা করিতেন এবং সকলের কাছেই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে "মৃদঙ্গ" "কথা কহিত"; "পাখোয়াজ" বাজনায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। ধনী নির্দ্ধন নির্ব্বিশেষে তাঁহার ন্যায় মজলিসি লোক বঙ্গদেশে বড় বেশী ছিলেন না। সরস কথাবার্ত্তায়, গালগল্পে, রঙ্গ-ব্যঙ্গে, সাহিত্যালোচনায় তিনি সকলকে এমন মাতাইয়া তুলিতে পারিতেন যে সময় কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত, তাহা কেহ জানিতে, বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার বন্ধু-বাৎসল্য, তাঁহার আশ্রিত-বাৎসল্য, তাঁহার বিনয়, তাঁহার অহমিকাশূন্যতা, তাঁহার অভিমানরাহিত্য যে-কোন ভদ্রলোকেরই পক্ষে অলঙ্কার স্বরূপ—রাজা মহারাজার ত কথাই নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির ভিখারী না হইয়াও স্বয়ং অনুশীলন করিয়া তিনি ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, বহু রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেস কনফারেন্সে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈঠকী আলাপের সময় তাঁহার রসিকতা রসজ্ঞ সুধিগণের উপভোগ্য বস্তু ছিল। সামাজিকতায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলে একটুও অত্যুক্তি করা হয় না। তাঁহার অমায়িকতা এবং উদারতা এতই ছিল যে, তিনি নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর বলিয়া, কোন বন্ধু কিম্বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি, তাঁহার পাছে অমর্য্যাদা হয় এই ভয়ে, সামাজিক ব্যাপারে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে কুণ্ঠিত হইলে তিনি নিমন্ত্রণের অপেক্ষামাত্র না রাখিয়া স্বতঃ

প্রণোদিত হইয়া বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত ও কৃতার্থ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কত বড় বিশাল উদার হৃদয় হইলে এইটি সম্ভব হয়, তাহা অনুমান করা কঠিন।

ক্ষমা তাঁহার আর একটি গুণ। তিনি অন্তরে অন্তরে ক্ষমাশীল। মুখে কখনও কখনও তিনি রাগ দেখাইতেন বটে, কিন্তু সে রাগ কখনও তাঁহার আন্তরিক ছিল না। অপরাধীকে দণ্ডবিধানের পদ্ধতিও তাঁহার অতি চমৎকার ছিল। একবার তিনি স্বর্গীয় সারদারঞ্জন রায় প্রমুখ তাঁহার কয়েকজন বন্ধুকে নাটোরে মাছ ধরিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মাছ ধরিতেছেন, এমন সময় বরকন্দাজরা এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার কাছে অভিযোগ করিল যে, এই ব্যক্তি চুরি করিয়া লালদীঘিতে মাছ ধরিতেছিল। লালদীঘিতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ ছিল। রাজাজ্ঞা অমান্য করিয়া মাছ ধরার অপরাধে মহারাজ লোকটির কি শাস্তি বিধান করিলেন, শুনিবেন? মহারাজ তাহার অতি সাধারণ রকমের সরঞ্জাম দেখিয়া তাঁহার নিজের একটি পরিপূর্ণ প্রকাণ্ড হুইল তাহাকে বকসিস দিয়া বলিলেন, "নিষেধ করলেও তুই চুরি করে মাছ ধরবি, তবে না হয় প্রকাশ্যে ভাল হুইল দিয়াই ধর, আমাকেও ভাগ দিস।" ব্যস! চূড়ান্ত বিচার ও চূড়ান্ত দণ্ড!

তিনি কত যে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধারে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। তাঁহার একজন বন্ধু বলিয়াছেন, অন্যান্য দানের কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবল কন্যাদায়গ্রস্তদিগকে দানের পরিমাণ দুই লক্ষ টাকা।

মহারাজ হাসিখুসি করিতেন, আমোদপ্রমোদ করিতেন, সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন, কবিতা, প্রবন্ধ লিখিতেন, গানবাজনা করিতেন, দেশভ্রমণ করিতেন, ঘরকন্না করিতেন, 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' সম্পাদন করিতেন, এক কথায় ধনী ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা সচরাচর যাহা করিয়া থাকেন, তিনিও প্রায় তাহাই করিতেন; কিন্তু তাঁহার মনের গোপন কোণের প্রকৃত "মর্ম্মবাণী"টি কি, তাহা বড় একটা কেহ জানিতে পারিত না। একদিন রাত্রিতে কেবল একজন মাত্র লোকের কাছে তিনি তাঁহার মরমের গোপন কথাটি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই একজন আমাদের দাদা—তখনকার শ্রীজলধর সেন—এখনকার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন। সেই একটি দিন মাত্র মহারাজ জগদিন্দ্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। চৌরঙ্গীর 'মানসী' কার্য্যালয় হইতে রাত্রি দশটার সময় একখানি মোটরে দাদা ও মহারাজ বারাকপুরে বাগানবাড়ীতে যাইতেছিলেন। অন্ধকার নির্জ্জন পথ, উভয়েই চুপচাপ। পথের মাঝখানে সহসা মহারাজ দাদার সাড়া লইয়া বলিলেন, "দেখ দাদা, আমি ভাবি কি জান? আমার মনে হয়, এই রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করে আমার সেই দীনদরিদ্র জনকজননীর কুটীরে অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকলে হয় ত সুখী হতে পারতাম। সেই দরিদ্র পল্লীজীবনের জন্য আমার প্রাণ এক-এক সময় হাহাকার করে ওঠে। সেই বুঝি ভাল ছিল!" এই কথা বলিয়া মহারাজ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৩৩২ সালের ২১এ পৌষ (১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী) মহারাজ লোকান্তরে প্রস্থান করেন। একখানি মোটরের ধাক্কা লাগিয়া তিনি পড়িয়া যান; তাহারই ফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। যে ট্যাক্সি-চালকের অসাবধানতার জন্য তিনি এরূপ সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অনেকেই তাহাকে দণ্ডিত করিবার জন্য মহারাজকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বভাবতঃ ক্ষমাশীল মহারাজ তাঁহার মৃত্যুকালীন শেষ বাণীতে সেই ট্যাক্সি-চালকের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়া যান!

মৌন-প্রশস্তি

শ্রীরাধারাণী দেবী

বন্ধু গো ! এসেছি মোরা 'জয়ন্তী-উৎসবে' আজি তব
এনেছি অঞ্জলি অর্ঘ্যে ভরি'
প্রকৃতির মর্ম্মযামি হে কবি ! মোদের মৌন স্তব
জানি তুমি লবে পাঠ করি।
এ আনন্দ-যজ্ঞতলে আমাদের ডাকে নাই কেহ,
বাতাসে পেয়েছি বার্ত্তা ; শুনি কাঁপে প্রাণ মন দেহ
পুলকের শিহরণে ; জাগে মনে তব মুগ্ধ-স্নেহ ;
আমরা নহি ত' অচেতন—
তুমি ইহা জানো, তাই—আনিয়াছি প্রীতি-অবলেহ—
মূকের নীরব নিবেদন !

তন্দ্রামগ্ন ছিনু কবি, অন্ধকার গিরি-গুহা-তলে
কত যুগ-যুগান্তর ধরি'
তোমার কিরণ-স্পর্শে জাগিয়া উঠেছি কুতূহলে
বিশ্বেরে বিস্ময়-স্তব্ধ করি !
আমার কল্লোল-গীতি তব দিব্য বীণার ঝঙ্কারে
অপূর্ব্ব যৌবনাবেগে উচ্ছ্বসি' উঠেছে শতধারে !
ভাঙিয়াছে স্বপ্ন মোর তোমারি' আহ্বানে বারে-বারে—
খুঁজিয়া পেয়েছি যেন গতি !
নব-ভগীরথ ওগো ! লহ এই আনিয়াছি দ্বারে
'নির্ঝরের' নীরব প্রণতি।

বলো বলো ওগো বন্ধু ! পেরেছো কি চিনিতে আমারে ?—
দেখ তো চাহিয়া মোর পানে,
সপ্ত-সিন্ধু বক্ষে তুলি' তবু তুমি প্রেয়সী 'পদ্মারে'
ভোলোনি—এ কথা সে যে জানে।
উন্মাদ পূর্ণিমা আজো অঙ্গে অঙ্গে মূর্চ্ছি' পড়ে মোর—
বেলাহীন বালুচরে চখা-চখী কাঁদিছে অঝোর,
তেমনি ঘনায় সন্ধ্যা—আসে নেমে স্বপ্ন-শুভ্র ভোর ;
আমি শুধু দিন গুণি' দুখে—
হে পদ্মা-বিহারী কবি ! জীবনের প্রিয়-সঙ্গী মোর !
ফিরে কি পাবোনা আর বুকে ?

ধান্যের মঞ্জরী ভরি' নৈবেদ্য এনেছি পদে প্রিয় !
আমি তব শ্যাম-শস্য-ক্ষেত ;
বন্দিয়াছো ছন্দে গানে যে আনন্দে অনির্ব্বচনীয়,
ভুলি নাই আজো সে সঙ্কেত !
নিদাঘ-দহনে মম শূন্য-বক্ষ যবে ধূ ধূ জ্বলে
উত্তীর্ণ হয়েছো হেথা রুদ্র অগ্নি-তপস্যার ছলে,—
সজল শ্রাবণ দিনে নীল নব মেঘচ্ছায়া তলে
মাতিয়াছো যেন মত্ত কেকা,—
হেমন্তে শরতে শীতে রেখে গেছো আমার অঞ্চলে
রূপ-মুগ্ধ কতো গীত-লেখা !

আমরা এসেছি সখা তোমারে অঞ্জলি দিতে আজ,
নাহি সাজ—নাহি জয়-রোল—।
কম্পিত চরণে এসে দাঁড়ায়েছি কুণ্ঠিত সলাজ,
তব প্রেম বক্ষে দিলো দোল !
'মোরা গ্রাম্য বেণু-কুঞ্জ'—'বরষার আমি নদীতট'
'প্রান্তর-নিবাসী আমি ছায়াঘন সেই বৃদ্ধ বট !'
'আমি স্বচ্ছ পল্লী-দীঘি'—হে কবি, যাদের চিত্রপট
এঁকেছো এমন রমণীয়,
যতনে এনেছি মোরা মরমের প্রীতিপূর্ণ ঘট
সমাদরে নিয়ো বন্ধু,—নিয়ো।

আমারে চিনিতে কবি, বিলম্ব হবেনা তব, জানি,—
বড়ো ভালোবাসো মোর হাসি,

ফেন-শুভ্র ক'রে দিই শরতের উত্তরীয়খানি
যেদিন বাজাও তুমি বাঁশী।
তোমার মুরলী-রবে বাহিরিয়া আসি আমি 'কাশ'
—'আমি দীন দূর্ব্বা তবু আমারেও করেছো প্রকাশ !'
তোমার সম্মানে সখা, বক্ষে আজ উথলে উল্লাস
'—এসেছি গো, মোরা ঝরাপাতা !'
অখ্যাত আছিনু কাব্যে কতো দীর্ঘ যুগ বর্ষ মাস
মরমি ! মোদের তুমি ত্রাতা !

'হে বন-বিলাসী কবি ! এনেছি মুকুলগুচ্ছ মোর
ফাল্গুনের আম্রবন আমি !
মত্ত মৌমাছির মতো গন্ধে যার হ'য়েছো বিভোর
লহো তার সুরভি প্রণামী।'
'—এসেছে খর্জ্জুর শাল, পল্লব-ব্যজনী-করে তাল,
মহুয়া মদির-মত্ত, দেওদার সুদীর্ঘ বিশাল,
হরিতকী, আমলকী, নারিকেল, এসেছে তমাল—
নিবেদিতে আনন্দ-বারতা ;
সমুদ্র সন্তরি' এলো পুষ্পে রচি রংয়ের মশাল
তুষার দেশের তরুলতা !'

দরদী গো ! দীনা আমি, রূপহীনা—কারো যোগ্য নয়,
চাহে নাই কেহ মোর পানে !
একদা নির্জ্জন সাঁঝে—পথমাঝে নিলে পরিচয়
কী গান গাহিলে কাণে কাণে !
অনাদৃতা আকন্দের ছন্দে কভু ছিল না প্রবেশ,
তুমি বন্ধু, বুঝেছিলে দুখিনীর মূক মর্ম্ম-ক্লেশ,
পূর্ণ করি দিলে তাই বঞ্চিতার অন্তর প্রদেশ,
সার্থক করিলে তার প্রাণ ;—
অবজ্ঞাতা আকন্দের সকৃতজ্ঞ আনন্দ-আবেশ
এনেছি চরণে দিতে দান !

জয়ন্তী-উৎসবে তব বন্দনায় এলো সবে মাতি'
—শেফালি বকুল গন্ধরাজ,
কদম্ব কেতকী কুন্দ করবী কাঞ্চন যূথী জাতি
পুলক ধরেনা বুকে আজ !
মালতী মল্লিকা এলো, চামেলি পারুল সন্ধ্যামণি
আসিলো রজনীগন্ধা সুগন্ধের নূপুর নিক্কনি'
নলিনী মেলিলো আঁখি, এলো ছুটে সৌরভের খনি—
কামিনী গোলাপ চম্পা হেনা ;
অনামা অরণ্য-পুষ্প,—অনাঘ্রাতা ইন্দু-নিভাননী
বিদেশিনী এসেছে অচেনা !

সসাগরা বসুন্ধরা চরাচর এ বিশ্ব-প্রকৃতি
অর্চ্চনার সাজাইয়া ডালা
এনেছে কবির দ্বারে প্রাণের নীরব স্তুতি-গীতি
তোমার অমর বর-মালা !
'উর্ব্বশী' অলক্ষ্যে দিলো প্রণামী পাঠায়ে পারিজাতে,
শুভ্র মেঘে মহাশ্বেতা উপহার ভেটিল সভাতে,
আপনি জননী বাণী তোমার ললাটে নিজ হাতে
জয়-টীকা পরালো গৌরবে,
অমূর্ত্ত আনন্দ অর্ঘ্য অজস্র এসেছে আজি প্রাতে
অপরূপ অমৃত-সৌরভে !

আমি মনে ভাবি তাই তব যোগ্য পূজা-উপচার
কী দিয়া রচিব নাহি জানি !
আকাশ বাতাস আলো শ্যাম ধরা যাঁর অর্ঘ্য-ভার
পদ-প্রান্তে বহি দিলো আনি !
মুগ্ধ মূক প্রকৃতির কণ্ঠে শুনি মৌন-জয়গান
অন্তর-নিতলে মোর অনুরণি' ওঠে তারি তান
হে কুহকি কবি ! বলো কী অঞ্জলি দিব আজি দান
ধরাপূজ্য তোমার চরণে,
আমার প্রণতি-অর্ঘ্য—তোমার প্রতিভা-মুগ্ধ প্রাণ
নিবেদিনু উৎসবের ক্ষণে। *

* 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের' জন্য রচিত।

শোক-সংবাদ

পরলোকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরলোক-গমনে ভারতবর্ষ তাহার গৌরবপতাকাবাহী একজন সন্তানকে হারাইল, জগতে একজন প্রকৃত পণ্ডিতের ও জ্ঞানীর আসন শূন্য হইল। মৃত্যু আসিয়া আজ যে শুধু একজন ব্যক্তিকে এই মর্ত্ত্য-জগৎ হইতে সরাইয়া লইয়া গেল তাহা নয়, এই তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, বহু বিলুপ্ত দিনের, বহু বিলুপ্ত যুগের, বহু বিলুপ্ত মানবের নব-জীবন-প্রাপ্তির সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত হইয়া গেল। যে গৌরবের জগৎ শুধু স্মৃতিকথা মাত্র হইয়া এই বিস্মরণশীল জাতির প্রাণ-মহিমার নিদর্শন স্বরূপ কালের তিমিরান্তরালে বিরাজ করিতেছিল—পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আপনার অসামান্য সৃজনময়ী প্রতিভা ও ব্রাহ্মণ্য সাধনার বলে সেই স্মৃতিময়ী ভারতকে বিস্মরণের সমুদ্র-তল হইতে সমুদ্র-মন্থনোত্থিতা কমলাসনা লক্ষ্মীর মত তুলিয়া ধরেন। অন্যান্য বহু পণ্ডিতের সহিত তাঁহার একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল যে, যে বিপুল জ্ঞান তিনি আহরণ করিয়াছিলেন, তা একান্ত সহজ হইয়া তাঁহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত এবং নানা খণ্ড তত্ত্বের ও কালের ব্যবধানের মধ্য হইতে তাঁহার সৃজনময়ী প্রতিভা বিলুপ্ত তত্ত্বের বা বিস্মৃত মূর্ত্তির সত্য প্রকাশ অনায়াসে ধরিয়া ফেলিতে পারিত। পুরাতত্ত্ব বা ঐতিহাসিক আলোচনা এবং অনুসন্ধানের যে নব বৈজ্ঞানিক প্রণালী এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সেই আন্দোলনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার বিপুল জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে দুই একটী মণি-রত্ন লইয়া বহু ব্যক্তি আজ কৃতী ও পণ্ডিত হইয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন ও সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনায় তিনি একটীর পর একটী যে-সব পথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই পথ ধরিয়া বহু অনাগত কাল ব্যাপিয়া সুধিজনদিগকে চলিতে হইবে। নেপাল হইতে তিনি যে-সমস্ত অমূল্য পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনেন—তাহা তিনি না থাকিলে অন্যত্র চলিয়া যাইত। এসিয়াটিক সোসাইটীতে তিনি সংস্কৃত পুস্তকের যে কয়েক খণ্ড তালিকা করিয়া গিয়াছেন, ভারতের অতীত ইতিহাস পুনরুদ্ধারের অন্ধকার দুরূহ পথে, তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়। যে অতীতকে আমরা দেখি নাই, যে অতীতকে আমরা কল্পনা করিতে পারি না, সেই অতীতের অলি-গলিতে, রাজপথে-পথে তিনি অতি পুরাতন নাগরিকের মত বিচরণ করিতেন; সেখানকার পথের প্রত্যেক বাঁকটী, সেখানকার নাগরিকদের প্রত্যেকটীকে যেন তিনি বন্ধুভাবে জানিতেন ও চিনিতেন। তাই পুরাতত্ত্ব বা ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার রচনা বা বক্তৃতায় এমন একটা সহজ প্রকাশ-মহিমা ফুটিয়া উঠিত, যেন তিনি তাঁহার গত জীবনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতার ইউনিভারসিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততি বর্ষ পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে জয়ন্তী-উৎসবের প্রস্তাব করিয়া যে বিরাট সভার অধিবেশন হয়, তাহার সভাপতিরূপে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—"আমি ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি যে, রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন-সভায় সমস্ত লোকের মধ্য হইতে আমাকেই কেন সভাপতি পদে নির্ব্বাচন করা হইল! সম্ভবতঃ সভার উদ্যোক্তৃগণ মনে করিয়াছেন যে, আমি বয়সে কবির অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড় এবং একই সময়ে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলাম ও আমরা উভয়েই বঙ্কিমের প্রতিভার অনতিক্রমনীয় প্রভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলাম এবং আমাদের উভয়কেই বঙ্কিমচন্দ্র নবযুগের উদীয়মান শক্তিরূপে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছিলেন।"

সমগ্র দেশ যখন তাহার কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন জ্যেষ্ঠ হিসাবে আশীর্ব্বাদ করিবার যাঁহার অধিকার ছিল, তিনি পরলোক-গমন করিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্মৃতি-সভায় রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে যে শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বাঙ্গলা রেনাসাঁসের অপূর্ব্ব কাহিনীর সহিত এই শ্রদ্ধাঞ্জলির যে

গভীর নীরব সম্পর্ক আছে, তাহা স্থায়ী কালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হওয়া উচিত।

"আমাদের বাল্যকালে আমরা একটী নূতন যুগের অবতারণ দেখেচি। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় বিচার-পদ্ধতির সম্মিলনে এই যুগের আবির্ভাব। অক্ষয়-কুমার দত্তের মধ্যে তার প্রথম সূত্রপাত দেখা দিয়েছিল। তার পরে তার পরিণতি দেখেছি রাজেন্দ্রলাল মিত্রে। সেদিন এসিয়াটিক সোসাইটির প্রযত্নে প্রাচীন কাল থেকে আহরিত সাহিত্য এবং পুরাবৃত্তের উপকরণ অনেক জমে উঠেছিল। সেই সকল অসংশ্লিষ্ট উপাদানের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সত্যকে উদ্ধার করার কাজে রাজেন্দ্রলাল অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। প্রধানতঃ ইংরেজি ভাষায় ও য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে তাঁর মন মানুষ হয়েছিল; পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর রচনা ইংরেজি ভাষাতেই প্রকাশ হোত। কিন্তু আধুনিক কালের বিদ্যাধারার জন্যে বাংলা ভাষার মধ্যে খাত খনন করার কাজে তিনি প্রধান অগ্রণী ছিলেন, তাঁর দ্বারা প্রকাশিত বিবিধার্থ-সংগ্রহ তার প্রমাণ। তাঁর লিখিত বাংলা ছিল স্বচ্ছ প্রাঞ্জল নিরলঙ্কার।

সে অনেক দিনের কথা।—সেদিন একদা পূজনীয় অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের মাণিকতলার বাড়ীতে কী উপলক্ষ্যে গিয়েছিলুম সেটা উল্লেখযোগ্য। বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বোলে দেবার উদ্দেশ্যে তখনকার জিলার প্রধান লেখকদের নিয়ে একটি সমিতি স্থাপনের সঙ্কল্প মনে ছিল। তাতে বঙ্কিমচন্দ্রকেও টেনেছিলুম। বিদ্যাসাগরের কাছেও সাহস করে যাওয়া গেল। তিনি বল্‌লেন, "তোমাদের উদ্দেশ্য ভালো সন্দেহ নেই; কিন্তু যদি সাধন করতে চাও তা' হ'লে আমাদের মতো "হোম্‌রা চোম্‌রা"দের কখনই নিয়োনা, আমরা কিছুতে নিলতে পারিনে।" তাঁর কথা কতক অংশে খাটল, হোম্‌রা-চোম্‌রার দল কেউ কিছুই করেন নি। যত্নের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেছিলেন একমাত্র রাজেন্দ্রলাল। সমিতির প্রত্যেকের কাছে ফেরি করিয়ে নেবার জন্যে তিনি ভৌগলিক পরিভাষার একটি খসড়া লিখে দিলেন। অনেক চেষ্টা করলুম সকলকে জোট করতে, মিলিয়ে কাজ করতে তখনকার দিনের লোকদের নিয়ে সাহিত্য-পরিষদ খাড়া করে তুল্‌তে;—পারিনি, হয়ত নিজেরই অক্ষমতাবশতঃ। তখন বয়স এত অল্প ছিল যে অনেক চেষ্টায় যাঁদের টেনেওছিলুম তাঁদের কাজে লাগাতে পারলুম না।

আজ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদের মৃত্যু উপলক্ষ্যে শোক-সভায় রাজেন্দ্রলালের উল্লেখ করবার কারণ এই যে, আমার মনে এই দু'জনের চরিতচিত্র মিলিত হয়ে আছে। তিনি রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে একত্রে কাজ করেছিলেন। আমি তাঁদের উভয়েরই মধ্যে একটী গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা,—যে কোনো

স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল গ্রন্থিগুলি অনায়াসেই মোচন করে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচার-শক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধন-প্রণালী সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছিল। অনেক পণ্ডিত আছেন তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না; তাঁরা খনি থেকে তোলা ধাতুশিল্পটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক করতে বলেননি বলেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারী করেন।

হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচার-বুদ্ধির প্রভাবে সংস্কার-মুক্ত চিত্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে শিখেছিল। তাই স্কুল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোন-দিন সম্ভবপর ছিলনা। ভূয়োদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সেই স্বচ্ছ ভাষায় প্রকাশের শক্তি আজো আমাদের দেশে বিরল। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই, এইটেই আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই,—অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশী মার্কা পাবার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ ছিলেন সাধকের দলে এবং তাঁর ছিল দর্শন শক্তি।

"আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য-পরিষদে হরপ্রসাদ অনেক দিন ধরে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতায় এসিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাভাণ্ডারে নিজের বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা করেছিলেন, সাহিত্য পরিষদকে তারই পরিণত ফল দিয়ে এতকাল সতেজ করে রেখেছিলেন। এমন সর্ব্বাঙ্গীন সুযোগ পরিষৎ আর কী কখনো পাবে? যাঁদের কাছ থেকে দুর্লভ দান আমরা পেয়ে থাকি কোনোমতে মনে করতে পারিনে যে, বিধাতার দাক্ষিণ্যবাহী তাঁদের বাহুকে মৃত্যু কোনোদিনই নিশ্চেষ্ট করতে পারে। সেই জন্য যে বয়সেই তাঁদের মৃত্যু হোক, দেশ অকালমৃত্যুর শোক পায়, তার কারণ আলোক নির্ব্বাচনের মুহূর্ত্তে পরবর্ত্তীদের মধ্যে তাঁদের জীবনের অনুবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায় না। তবু বেদনার মধ্যেও মনে আশা রাখতে হবে যে, আজ যাঁর স্থান শূন্য, একদা যে আসন তিনি অধিকার করেছিলেন, সেই আসনেরই মধ্যে তিনি শক্তি সঞ্চার করে গেছেন এবং অতীতকালকে যিনি ধন্য করেছেন ভাবীকালকেও তিনি অলক্ষ্যভাবে চরিতার্থ করবেন।"

৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর

আমরা অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত চিত্তে পাঠকগণকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমাদের প্রিয় সুহৃৎ রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, আই-এস-ও বাহাদুর ১৯৩১ সালের ২৫এ নবেম্বর তাঁহার ৩০নং হ্যারিসন রোডস্থ বাটীতে অবস্থিতি কালে অপস্মার রোগে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২২এ ফেব্রুয়ারী ২৪ পরগণার রোহোরা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি সেই কলেজে প্রথমে শিক্ষক, পরে অধ্যাপক হন। অধ্যাপকতা করিতে করিতে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। ইহার পর কিছুদিন প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারের পার্সনাল এসিষ্ট্যাণ্ট, কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী প্রভৃতি পদে কার্য্য করিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার ইনস্পেক্টর জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেসন পদে উন্নীত হন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিছু কাল তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যও হইয়াছিলেন। এবং আরও কিছুদিন অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জষ্টিস অব দি পীসের কার্য্যও করেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

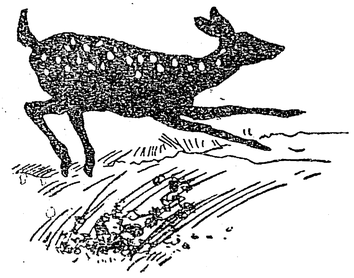

সাময়িকী

বিশ্বকবির সপ্ততিতম জন্মদিন উৎসবে—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিন-স্মরণ-উৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজাইতে, এই কথা শুধু মনে জাগে, আদি-স্রষ্টার মত মহাকালকে যে ব্যাপ্ত করিয়া রহিল, খণ্ডকালের সীমান্ত-রেখাকে চিহ্নিত করিয়া তাহাকে কি সম্মান দিব?

বহুযুগ আগে একদিন এই ভারতের এক পুণ্যক্ষেত্রে এক ভুবন-বিজয়ী বীর আপনার রথের সারথির বিশ্বরূপ দেখিয়া যেমন চরম বিস্ময়ে বলিয়াছিল, কোন্ দিকে তোমায় বন্দনা করিব?—তেমনি আজ অনুভূতির সমুদ্র-তলে অবগাহন করিয়া দেখি, হে কবি, মানসক্ষীরোদসিন্ধুশায়ী, কোন্ অনুভূতি দিয়া তোমার অর্ঘ্য রচনা করিব?

তাই আজ বিস্ময় দিয়া তোমার বন্দনা রচনা করিলাম —যে-বিস্ময় ছিল সৃষ্টির প্রথম দিনে প্রথম রবির উদয়ে এই কুমারী ধরণীর বুকে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন—

জাতির এই সঙ্কটময় অবস্থায় পথ-নির্দ্দেশ করিবার জন্য বহরমপুরে শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে মৌলভী আবদুস্ সমদ সাহেব যে সুচিন্তিত ও প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিয়াছেন—তাহা সত্যই দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ এই জাতির পক্ষে একান্ত কল্যাণকর। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-সমস্যাই ছিল তাঁহার বক্তৃতার প্রধান বিষয় এবং উহা যে বর্ত্তমান সময়ে রাজনীতির অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে উদার ও সহজ মনোবৃত্তি লইয়া মৌলভী সাহেব এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন—আশা করি, বাঙ্গলার অন্যান্য মুসলমান নেতা ও জনসাধারণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। গোলটেবিল বৈঠকে স্বজাতীয় নেতাদের অপকীর্ত্তি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া তিনি স্বার্থান্ধ পৃথক-নীতির মারাত্মক ফলাফলের কথা অভিভাষণে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। অভিভাষণে তিনি বলেন, "আমি আমার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে আমাদের অন্তিমের কাণ্ডারী পয়গম্বর শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদের সেই অমৃতবাণী—"হুব্বল্ ওতন মেনাল ঈমান" (অর্থাৎ স্বদেশ-প্রেম ঈমানের অন্তর্গত) স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন দলে দলে কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। ভারতের সকল জাতির একমাত্র প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস,—কংগ্রেস একমাত্র সভা, যাহার দ্বার সকল জাতির জন্য, সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য সদাই উন্মুক্ত। দেশকে, জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের কবল হইতে মুক্তি দিবার একমাত্র শক্তি আছে কংগ্রেসের। মুসলমান হাজারে হাজারে আসিয়া এই জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করুন—ইহার শক্তি বৃদ্ধি করুন—ইহাই আমার অনুরোধ। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আপনাদের যদি কোন অভিযোগ থাকে, তবে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিলে তাহার প্রতিকার হইবে না। বরং কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়া সেই সকল অভিযোগের প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইবে।"

সভাপতির অভিভাষণ—

বাঙ্গলার চির-তরুণ বৃদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে যে রুদ্র-সতর্ক বাণীর পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হয়ত সরকার না শুনিতে পারেন; কিন্তু সভাপতি মহাশয়ের সঙ্গে এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তরবারি দিয়া শাসনের দিন অনেকদিন হইল অতীত হইয়া গিয়াছে। নাগ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন,

"পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানব-প্রকৃতি বীরদর্পে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, আর ভারতের মানব-প্রকৃতিকে তোমরা স্বার্থান্ধ হইয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছ। এই বিশাল দেশের বিরাট মনুষ্য-প্রকৃতিকে তোমরা তরবারি শাসন দ্বারা চাপিয়া রাখিতেছ। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় নিরপরাধের

উপর যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত কোন ইতিহাসে নাই। হিজলীর বন্দীদের উপর গুলী চালান হইয়াছে। সভ্য-জগতে ঐরূপ লজ্জাকর ঘটনা আর কোথায় ঘটিয়াছে বলিতে পার কি? তোমাদের প্ররোচনায় গবর্ণমেণ্ট নূতন নূতন অনুশাসন, সরাসরি বিচারপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতেছেন, আর তোমরা কাল্পনিক শত্রু দমন হইতেছে বলিয়া উল্লসিত হইতেছ। মস্তিষ্ক হারাইয়া দেশে আগুন জ্বালাইও না। দেশময় আগুন জ্বলিলে দেশ পুড়িয়া মরিতে পারে, কিন্তু তাহাতে তোমাদের কোনই লাভ হইবে না। চট্টগ্রাম, হিজলী ও ঢাকার ঘটনার দ্বারা তোমাদের দমননীতি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে যদি মনে কর, তাহা হইলে তোমাদের মাথা ঠাণ্ডা আছে বলিয়া মনে করা কঠিন হইবে। কালস্রোত তরবারির শাসনের দিন অনেক পিছে লইয়া গিয়াছে। তরবারির সাহায্যে বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয়ের দিন আর ফিরিয়া আসিবে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া সময়স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে না চলিলে সকলকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।"

প্রাদেশিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী—

প্রাদেশিক সম্মেলনে নিম্নলিখিত মূল প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়,

(১) বৃটিশ পণ্য-বর্জ্জন,

(২) যে সমস্ত ব্যাঙ্ক, বীমা-কোম্পানী, ষ্টীমার-কোম্পানী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বৃটিশ দ্বারা পরিচালিত সেইগুলি এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্র বর্জ্জন,

(৩) বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন,

(৪) মাদক-দ্রব্য বর্জ্জন।

প্রস্তাবগুলি কোনটাই নূতন নয়। বহুদিন ধরিয়া জাতি এই পথে অগ্রসর হইতেছে। একান্ত স্বাভাবিক নিয়মে এমন দিন সহজেই আসা উচিত যখন এই সমস্ত বিষয়ের জন্য সভা করিয়া আর প্রস্তাব করিতে হইবে না। যে-জাতির আত্ম-সম্মান-বোধ জাগ্রত হয়, তাহাকে প্রস্তাব করিয়া আর তখন তাহা বলিয়া দিতে হয় না। এখনও যে সভা করিয়া এই সব প্রস্তাব করিতে হইতেছে, ইহাতে জাতির অন্তরের দৈন্য ও জড়তা যে আজও বিদূরিত হয় নাই, তাহাই বুঝায়।

পোষ্টকার্ড ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি—

জনসাধারণের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া নূতন সরকারী আইন অনুসারে ১৯৩১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর হইতে খাম ও পোষ্টকার্ডের দাম চড়িবে এবং টেলিগ্রাফ মণি-অর্ডারের উপর অতিরিক্ত ফী ধার্য্য হইবে। ২৷৷০ তোলার অনধিক ওজনের চিঠির জন্য ৫ পয়সার টিকিট দিতে হইবে, তদতিরিক্ত প্রতি আড়াই তোলা অথবা ঐ ওজনের কোন অংশের জন্যও ৫ পয়সা করিয়া দিতে হইবে। পোষ্টকার্ডের মূল্য তিন পয়সা এবং জোড়া পোষ্টকার্ডের মূল্য ছয় পয়সা হইবে। কোন কার্ডে যদি টিকিট না দিয়া ডাকে দেওয়া হয়, তাহা নষ্ট করিয়া ফেলা হইবে।

প্রত্যেক টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডারের জন্য যথারীতি যে মণিঅর্ডার কমিশন এবং টেলিগ্রাফের ফী দিতে হইবে, তদতিরিক্তও দুই আনা করিয়া দিতে হইবে। বিদেশী টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডারের উপরও ফী ধার্য্য হইবে। টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডার যে ধরণের যত টাকার জন্যই হউক না কেন, প্রত্যেক খানার জন্য ঐ দুই আনা অতিরিক্ত ফী লওয়া হইবে।

যেখানে সরকারী আয়ের শতকরা ৬৬৲ টাকা সেনা বিভাগের জন্য ব্যয় হয়, (অন্যান্য দেশে হয় ৩৲ হইতে ৬৲ টাকা) সে-দেশে এইভাবে দরিদ্র কর-দাতাকে পীড়ন করিয়া অর্থনৈতিক সাম্য কতদিন বজায় রাখা চলে?

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের অবসান—

হাস্য, পরিহাস ও রসিকতার মধ্যে দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকের অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনের বিদায়-পালা উপলক্ষে প্রধান-মন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড গুরুগম্ভীর রাজনৈতিক আব-হাওয়ার মধ্যে একটু রসিকতার অবতারণা করেন। বক্তৃতা দিতে উঠিয়াই প্রধান মন্ত্রী মহাত্মা গান্ধীর আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্যের প্রশংসা করিয়া বলেন—"তবে একটি বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আমার ঝগড়া করিবার আছে,—তিনি কেন আমার তুলনায় নিজেকে বৃদ্ধ বলিলেন? (হাস্য) মহাত্মার অনেক বৎসর এখনও হাতে আছে। গত কল্য রাত্রি ১২টার সময় যিনি বক্তৃতা দিয়াছিলেন তিনি যুবক

(হাস্য)। সভাপতির আসনে যিনি ছিলেন তিনিই বৃদ্ধ। আমি জানি না আমাদের মধ্যে কাহাকে বেশী বৃদ্ধ দেখায়, কিন্তু হিসাবপত্র হইতে বুঝা যায় যে গান্ধীর অপেক্ষা স্বাভাবিক নিয়মে আমার শেষ সময় অনেক নিকটবর্ত্তী এবং দীর্ঘ বৈঠক সম্বন্ধে যদি কাহারও অভিযোগ করার থাকে তাহা হইলে যে যুবক বক্তৃতা দিয়াছেন তাঁহার উহা নাই, যে বৃদ্ধ সভাপতিত্ব করিয়াছে অভিযোগ তাহারই আছে—তাহাকে আপনারা রাত্রি ২৷৷টা পর্য্যন্ত জাগাইয়া রাখিয়াছেন এবং বিরতি লইয়া প্রস্তুত হইয়া এখানে আসিবার জন্য আবার সকাল ৬টার সময়ই শয্যাত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। এইখানেই ত' অভিযোগের কথা, কিন্তু আমার একবিন্দুও অভিযোগ নাই, কারণ ভারতের স্বার্থের জন্যই এই ব্যাপার হইয়াছে।

আমার পুরাতন বন্ধু স্যার আবদুল কায়াম প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া আমি খুব আনন্দিত, গান্ধী এবং তিনি একমত হইয়াছেন, ইহাই ত একটা মস্ত লাভ। ইহা হইতেই ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে—ভবিষ্যতে মুসলমান এবং হিন্দু···(মহাত্মা এই সময় বাধা দিয়া বলেন "হিন্দু নহে") সভাপতি বলেন, "গান্ধী মানুষের সহজ কথার ফাঁক বুঝিয়া ফেলেন। মহাত্মা গান্ধী—"আমি উহা ক্ষমা করিলাম।" সভাপতি—গান্ধী আমার মতন লোকের সহজ কথার ফাঁক বুঝিয়া ফেলেন। মুসল-মান ও অন্যান্য সকলে (হাস্য এবং আনন্দধ্বনি) ভবিষ্যতে এক হইবেন। আমি গান্ধীর চিন্তাগুলি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, কারণ তিনি বরাবরই আমাদের বলিয়াছেন যে, তোমরা বিভিন্ন দলমাত্র এবং আমি তোমাদের সকলকে ধারণ করিয়া আছি। মহাত্মা—"অবশ্যই"। সভাপতি—সহযোগিতার জন্য আপনাদের মিলনে যে ফল হইয়াছে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখুন এবং স্কটস্যানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করুন। প্রিয় মহাত্মা, আসুন আমরা এইরূপেই অগ্রসর হই। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। হয়ত আপনি দেখিতে পাইবেন যে, ইহাই একমাত্র উপায়। এই পথে অগ্রসর হইলেই আমরা উভয়ে নিশ্চয়ই আমাদের কার্য্যের জন্য মহৎ গৌরব বোধ করিতে সমর্থ হইব এবং আমাদের প্রত্যেকের জীবনের উৎসে যে মহৎ আধ্যাত্মিক প্রেরণা আছে তাহার সহিত আমাদের রাজনীতিক কার্য্যাবলীর সংযোগ সাধনে সমর্থ হইব।

গোলটেবিল বৈঠকে হইল কি?—

দুই মাস ধরিয়া নানাবিধ তর্ক-আলোচনার পর গোল-টেবিল বৈঠকের অধিবেশন আপাততঃ শেষ হইয়া গেল। অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে ইহা মাঝপথে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অপূর্ব্ব ধৈর্য্য তাহা ঘটিতে দেয় নাই। এই বৈঠকের ফলে স্পষ্টতঃ কোনও নূতন অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না—মূলতঃ ইহার সিদ্ধান্ত প্রথম বৈঠকের পুনরাবৃত্তি মাত্র। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্রের স্বরূপ এই বৈঠক বসিবার পূর্ব্বে যেরূপ ঝোঁয়াটে ছিল, অধিবেশন শেষ হইবার পরও সেইরূপ রহিয়া গেল। বহুদিনের দেওয়া প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি ব্যতীত এই দুই মাসের আলোচনার কোনও বিশেষ সাক্ষাৎ ফল দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তবে একটী বিষয় যে, আলোচনা বা মীমাংসার পথ বন্ধ হইয়া যায় নাই। লণ্ডনের অধিবেশন শেষ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও এই সম্বন্ধে মীমাংসার সম্ভাবনা রহিল। প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায়,—

(১) বর্ত্তমান বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বিগত ১৯শে জানুয়ারী তারিখের ঘোষণার পুনরুক্তি করিতেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষ লইয়া সংযুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস আছে এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই পথই অনুসরণ করিবেন।

(২) প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণার মধ্যে যে নীতির কথা আছে, তাহা অনুমোদন করিবার জন্য শীঘ্রই পার্লামেণ্টের কমন্স সভাকে অনুরোধ করা হইবে।

(৩) অল্পদিনের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় যদি নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা করিতে না পারেন, তাহা হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং একটা মীমাংসা করিয়া দিবেন।

(৪) সকলের সম্মতিকে ভিত্তি করিয়া নির্দ্ধারিত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সমূহের স্বাভাবিক-দাবী ও অধিকার রক্ষা করা হইবে—এই মর্ম্মে শাসনতন্ত্রের মধ্যে একটি বিধান সংযুক্ত করা হইবে।

(৫) গোলটেবিল বৈঠকের একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হইবে। ভারতের বড়লাটের মারফতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সময় সময় এই কমিটির সহিত পরামর্শ করিবেন।

(৬) শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুতের জন্য যে কমিটি গঠিত হইবে, সেই কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে বিবেচনা করিবার জন্য তৃতীয়বার গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করা হইবে।

(৭) সীমান্তের প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এবং বর্ত্তমান ভারত-শাসন আইনের গণ্ডী অতিক্রম না করিয়া অগৌণে সীমান্ত প্রদেশকে গবর্ণর-শাসিত প্রদেশের সমান করা হইবে।

(৮) অর্থ-সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হইলে সিন্ধুদেশকে পৃথক্ প্রদেশ করা হইবে এবং অর্থ-সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা হইবে।

(৯) তিনটি নূতন কমিটি গঠন করা হইবে ঃ—(ক) বাজেটের ভিত্তিতে সংযুক্ত রাষ্ট্রের রাজস্ব সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি হইবে (খ) ভোটাধিকার ও নির্ব্বাচন কেন্দ্র সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য একটি কমিটি করা হইবে (গ) দেশী রাজ্যের সহিত বর্ত্তমানে যে-সমস্ত সন্ধি আছে, তাহার বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য আর একটি কমিটি হইবে।

(১০) কেন্দ্রীয় আইন সভায় কোন দেশীয় রাজ্য হইতে কতজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন, ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে সাহায্য করিবেন।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর শেষ কথা—

প্রধান মন্ত্রী একান্ত অমায়িক ভাষায় মহাত্মা গান্ধীকে সহযোগিতার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপারটা যদি শুধু মিষ্ট ভাষা ব্যবহারের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া যাইত, তাহা হইল ভাবনার কিছুই ছিল না। তাই গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তাঁহার শেষ বক্তব্য তাঁহার স্বাভাবিক নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে বলেন, "সম্মানজনক সর্ত্তে আমরা সখ্যতার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কংগ্রেস শুধু কথার চালে ভুলিবে না। গান্ধীজী বলেন,—আমাকে কিছু না বলিতে হইলেই ভাল ছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শেষ কথা আমি যদি না বলি, তাহা হইলে আপনাদের প্রতি এবং আমার নিজের নীতির প্রতিও সুবিচার করা হইবে না। আমি কোনরূপ কুহকের রাজ্যে বাস করি না। প্রস্তাবিত রক্ষা-কবচ সমূহ ভারতের স্বার্থের অনুকূল নহে এবং মোটেই সন্তোষজনক নহে। আমরা আপোষ করিতে পারি, তবে সেটা করিতে প্রকৃত স্বাধীনতা ও সম্মান বজায় রাখিতে হইবে। বলিতে গেলে একটা সমগ্র মহাদেশের স্বাধীনতা যে শুধু যুক্তিতর্কের কাটাকাটি বা কসরতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। আলোচনাও যদি কতকগুলি সর্ত্তের মধ্যে হয়, সে আলোচনায় কোন ফল হয় না। বৈঠকের নিকট যে সব রিপোর্ট দাখিল করা হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশের সহিতই আমি মতদ্বৈধ প্রকাশ করিয়াছি, কারণ তাহা না করিলে আমার পক্ষে প্রকৃতরূপে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করা হয় না। নিজের হাতে কোনরূপ সামরিক বল না থাকা সত্ত্বেও—প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও যে প্রতিষ্ঠান প্রতিদ্বন্দ্বী গবর্ণমেণ্ট চালাইতে সক্ষম, আমাদিগকে স্বাধীনতা দানের ইচ্ছাই যদি আপনাদের থাকিত, তাহা হইলে আপনারা সেই প্রতিষ্ঠানকে সাদরে বরণ করিয়া লইতেন। কংগ্রেসকে এই বৈঠকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সমস্ত ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবার কংগ্রেসের যে দাবী, তাহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। আমি জানি, সে দাবী প্রতিপন্ন করা এখানে আমার পক্ষে সম্ভব নহে, তবু জোরের সঙ্গেই আমি সে দাবী করিব; কারণ আমার উপর গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে।

ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে আইন-অমান্যের ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় না ফেলিয়া তিনি সম্মানজনক মীমাংসা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন, কিন্তু যদি ব্যর্থ হন তবে তিনি সানন্দে ঐ অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইবেন।

মহাত্মাজী বলেন, লর্ড আরুইন আমাদিগকে যথেষ্ট পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অর্ডিন্যান্স কিংবা লাঠি কিছুই স্বাধীনতার স্রোতবেগে বাধা দিতে পারিবে না। আমার জীবন আপনাদের হাতে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সকলের জীবন, নিখিলভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সকলের জীবন আপনাদের হাতে; কিন্তু লক্ষ লক্ষ

ক জনসাধারণের জীবনরক্ষা করিবার শক্তি যদি আমার থাকে আমি তাহা উৎসর্গ করিতে চাহি না।

মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, আপোষ মীমাংসায় তাঁহার কোন আপত্তি নেই, তবে সেটা সম্মানজনক হওয়া চাই এবং তাহাতে প্রকৃত স্বাধীনতা চাই, এখন তাহার যে নামই দেওয়া হউক। তিনি প্রকৃত স্বাধীনতা চান। তিনি বন্ধুত্ব স্থাপনই করিতে চান এবং ভারত ও ইংলণ্ডের যোগসূত্র ছিন্ন করিতে চান না—এই বন্ধুতার যোগসূত্র স্বাধীনতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। প্রস্তাবিত রক্ষাকবচ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, আর্থিক ব্যাপার সম্পর্কিত রক্ষাকবচগুলি ভারতের স্বার্থকে সঙ্কুচিতই করিবে। রক্ষাকবচ দেওয়া হইবে বলিয়া কংগ্রেসকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু সেগুলি ভারতের স্বার্থের অনুকূলেই হওয়া উচিত এবং ইংলণ্ডের স্বার্থের প্রতিকূলজনক না হওয়াই উচিত। ভারতের ও ইংলণ্ডের খেয়ালমাফিক এবং অবৈধ স্বার্থ-সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে দূরীভূত করিতে হইবে। আমি আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় প্রবর্ত্তন করিতে চাই না। আমি চাই সাময়িক যুদ্ধবিরতিকে স্থায়ী শান্তিতে পরিণত করিতে। যদি আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন, তবে ইহা কিছুই নহে—কিন্তু কংগ্রেসকে বিশ্বাস করুন—কারণ কংগ্রেস আমার চেয়েও বড়।

আপনারা আপনাদের নিজের সুগঠিত বিভীষিকাপূর্ণ নীতি দ্বারা বিপ্লবীদের বিভীষিকার সহিত সংগ্রাম করিতে পারেন। কিন্তু ভারতকে যতদিন পর্য্যন্ত আপনারা স্বাধীনতা না দিতেছেন, এমন সহস্র সহস্র লোক আজ প্রস্তুত আছে, যাহারা ততদিন নিজেরাও শান্তি কাহাকে বলে জানিবে না, আপনাদিগকেও জানিতে দিবে না।

সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যার সমাধান না করিয়া ভারতে স্বরাজ হইতে পারে না; কিন্তু ইহার সমাধানে আমি নিরাশ হই নাই। যে পর্য্যন্ত বিদেশী শাসন থাকিবে সে পর্য্যন্ত পারিবে না।

ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্ব্বে এই সমস্যা ছিল না এবং এখনও হিন্দু ও মুসলমানেরা গ্রামে শান্তিতেই বাস করে!

আইন অমান্য আন্দোলন ঠেকাইয়া রাখার চেষ্টা করার সময় চলিয়া গিয়াছে। আমি অন্য পথ ধরিবার মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি; তথাপি এখনো একটা আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য আমি কোন ত্যাগকেই অত্যধিক বলিয়া মনে করিব না। কংগ্রেস আন্দোলনের যাহা প্রাণ—অর্থাৎ "ভারতে প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা" এই আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রেরণায় যদি আমি আপনাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে দেখিবেন আমি সর্ব্বদাই আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য উদগ্রীব। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আপনারা আমার স্বাধীনতার দাবী মানিয়া না লইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আপোষ-নিষ্পত্তি অসম্ভব।

আমি বিবেচনা করিতে প্রস্তুত। ধর্ম্মের দোহাই, আপনারা এই বৃদ্ধকে, যাহার মাথার উপর দিয়া ৬২ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহাকে, একটিবার সুযোগ দিন। তাহার প্রতি এবং সে যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি একটু সুবিচার করুন;—বাহ্যতঃ আমাকে আপনারা বিশ্বাস করেন বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু এ কথা ঠিক যে, আমি যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। উক্ত প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আমার ব্যক্তিত্ব নগণ্য—কংগ্রেসের নির্দ্দেশ ব্যতীত কোন কিছু করিবার অধিকার আমার নাই।

বৈঠকের শেষে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা—

বৈঠকের অধিবেশন শেষ হইবার পরও মহাত্মা গান্ধী প্রধান মন্ত্রী ও ভারত-সচিবের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ যে, মহাত্মা গান্ধী সাক্ষাৎভাবে প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা সম্বন্ধে ভারত-সচিবকে জেরা করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে ঐ ঘোষণায় যে সব রক্ষাকবচের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া পরিবর্ত্তন করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে কি না।

প্রকাশ স্যার সেমুয়েল হোর গান্ধীজীকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে যুক্তরাষ্ট্র কমিটীর কোন সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত নহে—কেন না পার্লামেণ্টে যে সব প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ভার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতেই রহিয়াছে। বর্ত্তমানে গোলটেবিল বৈঠকের যে কার্য্যকরী সমিতি গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে এবং যাহার বিষয় প্রধান মন্ত্রী ঘোষণ করিয়াছেন, সেই কমিটি ইচ্ছা করিলে গবর্ণ-

মেণ্টের কাছে কতকগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের রক্ষাকবচের প্রস্তাব করিতে পারেন। তবে অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং রক্ষাকবচগুলির আকৃতি দেখিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ঐগুলি সমর্থন করিবেন কি না তাহা স্থির করিবেন।

এই সব আলোচনার ফলে গান্ধীজীর মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ যে, কতকগুলি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি পাইলে তিনি জাতীয় হিসাবে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিবার জন্য এবং গোলটেবিল বৈঠকের কার্য্যকরী সমিতিতে সদস্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুমতি দিতে তিনি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরোধ করিবেন।

ইংলণ্ড হইতে বিদায়-কালে মহাত্মার বাণী—

মহাত্মা গান্ধী ইংলণ্ডের উপকূল ত্যাগ করিয়া জাহাজে উঠিবার সময় রয়টারের বিশেষ প্রতিনিধির নিকট ইংলণ্ড-বাসীদের প্রতি নিম্নলিখিত শেষ বিদায়বাণী প্রদান করেন :—

"ভারতে ফিরিতেছি, এজন্য আমি আনন্দিত, কিন্তু ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া আমার দুঃখ হইতেছে। এখানে আমি খুব সুখে ছিলাম।"

অতঃপর মহাত্মাজী বলেন—"ভগবানের যদি ইচ্ছা থাকে, আমাকে ইংরাজদের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, এ কথা আমি যখন বলি, তখন ইংরেজেরা যেন আমাকে বিশ্বাস করেন। আমি নিশ্চয়ই বিদ্বেষপরবশ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব না। যাঁহারা আমার অত্যন্ত প্রিয়তম আত্মীয়, তাঁহাদের কাহার কাহারও সঙ্গে আমাকে যেরূপ সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, সেইরূপ প্রেমপ্রবৃত্ত হইয়াই আমি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইব। সুতরাং ভারতের আত্মমর্য্যাদা অব্যাহত রাখিয়া যতদূর সম্ভব সহযোগিতা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করাই আমার সঙ্কল্প।"

য়ুরোপ ও এশিয়ার ঋষির মিলন—

ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া মহাত্মা গান্ধী য়ুরোপের ঋষি রোমাঁ রলাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ফ্রান্সের মধ্য দিয়া সুইজারল্যাণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। দুইজনেই জীবনের প্রথম জাগরণ-ক্ষণে একই গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করেন, সে গুরু রুষিয়ার ঋষি টলষ্টয়। আন্তর্জাতিক কৃষ্টির ইতিহাসে এই মিলন একটী অতি সুন্দর রূপকের মত লাগে। জ্ঞানের পাবক-শিখা ভৌগোলিক সীমান্ত-রেখা অতিক্রম করিয়া দেশে দেশান্তরে জ্বলিতেছে। একদিন সেই পাবক-শিখার আলোকে বিশ্ব-রাষ্ট্র-মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান বসিবে—রাজনৈতিক মিথ্যা কথার চাতুরী সে অগ্নিতে ভস্ম হইয়া যাইবে—রণ-বিলাসীর রক্ত-বুভুক্ষা স্তিমিত হইয়া আসিবে—ইহা যেন তাহারই প্রতীক্।

বাঙ্গলার নূতন আধা-জঙ্গী আইন—

বিলাতে যখন প্রধান-মন্ত্রী একান্ত অমায়িক ভাষায় সহযোগিতার জন্য জাতীয় নেতাদের আহ্বান করিতেছেন, বাঙ্গলায় তখন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে দমন করিবার উপলক্ষে সরকার ব্যাপকভাবে এমন সব দমন-নীতির সৃষ্টি করিতেছেন, যাহাতে মনে হয় যে সমগ্র দেশ যেন সশস্ত্রভাবে বিপ্লবী হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার আর একটী নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। ইহার নাম বেঙ্গল ইমার্জেন্সী পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্স। এই অর্ডিন্যান্সের প্রধান সূত্রগুলি হইতেছে,

(১) কোন লোকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ফেরারী আসামীর সহিত যোগাযোগ রাখিতে অথবা তাহাকে খাদ্য, পানীয়, অস্ত্রশস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ বা অন্য কোন দ্রব্য সরবরাহ করিতে বা অন্য কোন প্রকারে সাহায্য করিতে পারিবে না।

(২) যে কোন সামরিক কর্ম্মচারী এবং এ্যাসিষ্টাণ্ট সাব-ইন্সপেক্টার পর্য্যন্ত যে কোন পুলিশ কর্ম্মচারী বা ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফলস্ ও আসাম রাইফেলসের স্থলে জমাদার পর্য্যন্ত যে কোন কর্ম্মচারী যখনই কোন ফেরারী আসামীর সহিত যোগাযোগ বন্ধ করা বা সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর নিরাপত্তা আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তখনই তাহার তারের সংবাদ, টেলিফোন সংবাদ, খামের চিঠি, পোষ্টকার্ড এবং পার্শেল আটক করার ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি সামরিক বা পুলিশ কর্ম্মচারীর নিরাপত্তার বিঘ্নকর কোন সংবাদ পাইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ উহা নিকটতম ম্যাজিষ্ট্রেট, সামরিক কর্ম্মচারী বা পুলিশ কর্ম্মচারীকে জানাইতে হইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাইতেছে বা ফেরারী আসামী অথবা বিপ্লবীর জন্য কোন সংবাদ লইয়া যাইতেছে বা বে-আইনী অথবা অবৈধভাবে প্রয়োগ করার জন্য কোন দ্রব্য লইয়া যাইতেছে সন্দেহ হইলে, সামরিক বা পুলিশ বাহিনীর যে কোন লোকই তাহাকে থামাইয়া তাহার শরীর তল্লাস করিতে পারিবেন।

(৫) কোন লোকই সামরিক বা পুলিশ বাহিনীর কোন লোকের গতিরোধ বা গতিরোধের চেষ্টা বা গতি-রোধের জন্য কাহাকেও উত্তেজিত করিতে পারিবে না।

(৬) কোন লোক সামরিক, পুলিশ বা জন-সাধারণের সম্পত্তি অনিষ্ট করার উদ্দেশ্য বা প্রচেষ্টার কথা জানিতে পারিলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিকটতম সামরিক বা পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট উহা রিপোর্ট করিতে হইবে।

(৭) কোনও ব্যক্তি সামরিক বা পুলিশবাহিনী সম্পর্কিত কোনরূপ সংবাদ সামরিক বা পুলিশবাহিনীর কোনও লোকের নিকট হইতে অথবা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোনও কর্ম্মচারীর নিকট হইতে জানিবার চেষ্টা করিতে পারিবে না।

(৮) কোনও ব্যক্তি সামরিক বা পুলিশবাহিনী সম্পর্কিত কোনও সংবাদ কোনও সংবাদপত্রে আদান-প্রদান করিতে পারিবে না।

(৯) সামরিক বা পুলিশবাহিনী সম্পর্কিত কোনও সংবাদ কোনও সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে পারিবেন না। সামরিক বা পুলিশবাহিনী সম্পর্কিত কোনও সংবাদ যদি কোনও সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, তবে উক্ত সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, সম্পাদক এবং প্রিণ্টারকে ঐরূপ সংবাদ প্রকাশের জন্য দায়ী করা হইবে।

(১০) কোনও ব্যক্তি বেতার যন্ত্রের গ্রাহক বা প্রেরক কোনরূপ যন্ত্রই ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(১১) কাহারও চালচলনে সন্দেহের উদ্ভব হইলে তাহার নিকট হইতে তাহার বিবৃতি আদায় করিয়া লইবার জন্য বা উহার সত্যতা সপ্রমাণ জন্য তাহাকে ২৪ ঘণ্টাকাল আটক করিয়া রাখা যাইতে পারিবে।

(১২) আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে কোন জমিদার ও যে কোন স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারী বা যে কোন স্কুল কলেজ ও শিক্ষালয়ের যে কোন শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(১৩) স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে, কোন অঞ্চল বিশেষের লোকেরা নির্দ্দিষ্ট অপরাধে লিপ্ত আছে বা উক্তরূপ অপরাধে সহায়তা করিতেছে, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর উক্ত স্থানীয় সরকার জরিমানা ধার্য্য করিতে পারিবেন।

(১৪) বৈপ্লবিক অপরাধ সংশ্লিষ্ট হত্যার প্রচেষ্টাকে ট্রাইব্যুনাল সর্ব্বোচ্চ অপরাধ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিবেন।

(১৫) স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না।

নূতন অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী—

ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া জাহাজে আরোহণ করিবার সময় মহাত্মা গান্ধী বলেন,—

"আমি এ কথা না বলিয়া পারিতেছি না যে, নূতন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের ধারাগুলি আমি যতই পাঠ করিতেছি, ততই আমার মনে আশঙ্কার কারণ প্রবলতর হইতেছে। নরহত্যার উদ্যমকারীকে পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার বিধান হইয়াছে। এরূপ কঠোর বিধান আরও অনেকগুলি আছে। আমার মতে সেগুলি অধিকতর মারাত্মক। প্রয়োজন হইলে আমরা কয়েকজন নিরপরাধ লোকের মস্তক দান করিতে পারি; কিন্তু সমস্ত জাতির মনুষ্যত্ব নাশ করিবার যে ব্যবস্থা, তাহার কথা ভাবিয়া স্থির থাকিতে পারি না। আমি তাই আশা করিতেছি, নূতন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের বিধানগুলি খুব ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়া বৃটিশ জাতি ইহা প্রত্যাহারের জন্য জিদ করিবেন। আমার মতে, এরূপ হুকুমনামা জারী করা রাজনৈতিক ক্ষমতার অমানুষিক প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নহে।"

লয়েড্ জর্জ্জ ও মহাত্মা গান্ধী

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও জগতের রাজনৈতিক ইতিহাসে "ওয়েল্‌স্ দেশের মায়াবী" বলিয়া খ্যাত, ধুরন্ধর রাজনীতিক মিঃ লয়েড্ জর্জ্জ কলম্বো যাইবার পথে

বোম্বেতে আগমন করেন। বোম্বে করপোরেশনের অভিনন্দনের উত্তরে এই কূটবুদ্ধি রাজনীতিক যেভাবে মহাত্মা গান্ধীর প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে এদেশবাসী কোন কোন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ কাগজ এতই মর্ম্মাহত হইয়াছেন যে, সে সংবাদটুকুও ছাপিতে পারেন নাই। লয়েড্ জর্জ্জের সহিত ভারতের তথা প্রাচ্যের নানা দিক দিয়া নানা যোগ আছে এবং এ কথা স্থির যে আমরা কোন দিনই এই মায়াবীর কোনও কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই। কিন্তু আজ যেভাবে লয়েড্ জর্জ্জ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের প্রতি শ্রদ্ধার নিবেদন করিয়াছেন, তাহাতে তিনিই মহৎ হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ইংলণ্ড ছাড়িয়া আসিবার পূর্ব্বে আপনাদের মহান্ নেতা মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎ পাইবার আমি শেষ সুযোগ পাইয়াছিলাম।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ব্যক্তিগত কষ্ট স্বীকার করিয়া এক কুজ্ঝটিকাময় নিশীথে তিনি আমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তিন ঘণ্টারও অধিক কাল, আমার সহিত আলোচনা করেন এবং অভিব্যক্তির অতুলনীয় ক্ষমতাবলে তিনি আমার নিকট তাঁহার দেশের প্রশ্নগুলি উত্থাপিত করেন। আমি একজন রাজনীতিক এবং আমার বলিতে কোন সঙ্কোচ নাই যে, মহাত্মা গান্ধীকেও আমি একজন রাজনীতিক বলিয়া বুঝিয়া লইলাম। আমার রাজনীতিক হৃদয়ে তিনি একটা সুন্দর ছাপ আঁকিয়া দিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় বিচক্ষণ, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। আমিও তিন ঘণ্টা কাল ব্যাপী তাঁহার অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য বাক্‌শক্তির পরিচয় পাইয়া সত্যসত্যই বুঝিলাম, তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক। গ্রেটবৃটেনের অধিবাসীগণ এখনও সম্মিলিতভাবে মিলনের পথ খুঁজিয়া পাইতে ব্যগ্র এবং আমি বিশ্বাস করি তাহা হইবেও। পুরাকাল হইতে পুরুষানুক্রমে আপনাদের সভ্যতার দান, উৎকর্ষের পরিমাণ এবং আপনাদের দেশের মহামনীষিগণের জীবনের আদর্শ ও দর্শনের জ্ঞান শুদ্ধ মাত্র বৃটেনে নহে সমগ্র জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং আমি ভবিষ্যতের আশাপথ লক্ষ্য করিয়া বসিয়া আছি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রণীত "সনাতন হিন্দু"—১।০

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত "স্বদেশী যুগের স্মৃতি"—১॥০

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম-এ প্রণীত "রাজর্ষি রামমোহন"—৸০

সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য কৃত "কর্ম্মতত্ত্ব"; শ্রীমৎ সাংখ্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এসসি কৃত টীকা সমেত—১৲

শ্রীঅঘোরনাথ কাব্যতীর্থ প্রণীত পৌরাণিক নাটক "রণচণ্ডী"—১॥০ ও "যাজ্ঞসেনী"—১।০

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী বিদ্যাবিনোদ প্রণীত পৌরাণিক নাটক "ধুন্ধুমার"—১॥০

শ্রীশৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত উপন্যাস "সেথহাটির নীলকুঠি"—১॥০

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "স্তুতিকুসুমাঞ্জলি"—॥০

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "রহস্য-লহরী" সিরিজ "বোম্বেটে-পল্টন" ও "দস্যুরাজ্যের লাট"; প্রত্যেকখানি—৸০

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি-এ প্রণীত "বড়-মা"—১॥০

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব"—৸০

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম-এ প্রণীত "বাংলার মনীষী"—১৲

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA,
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

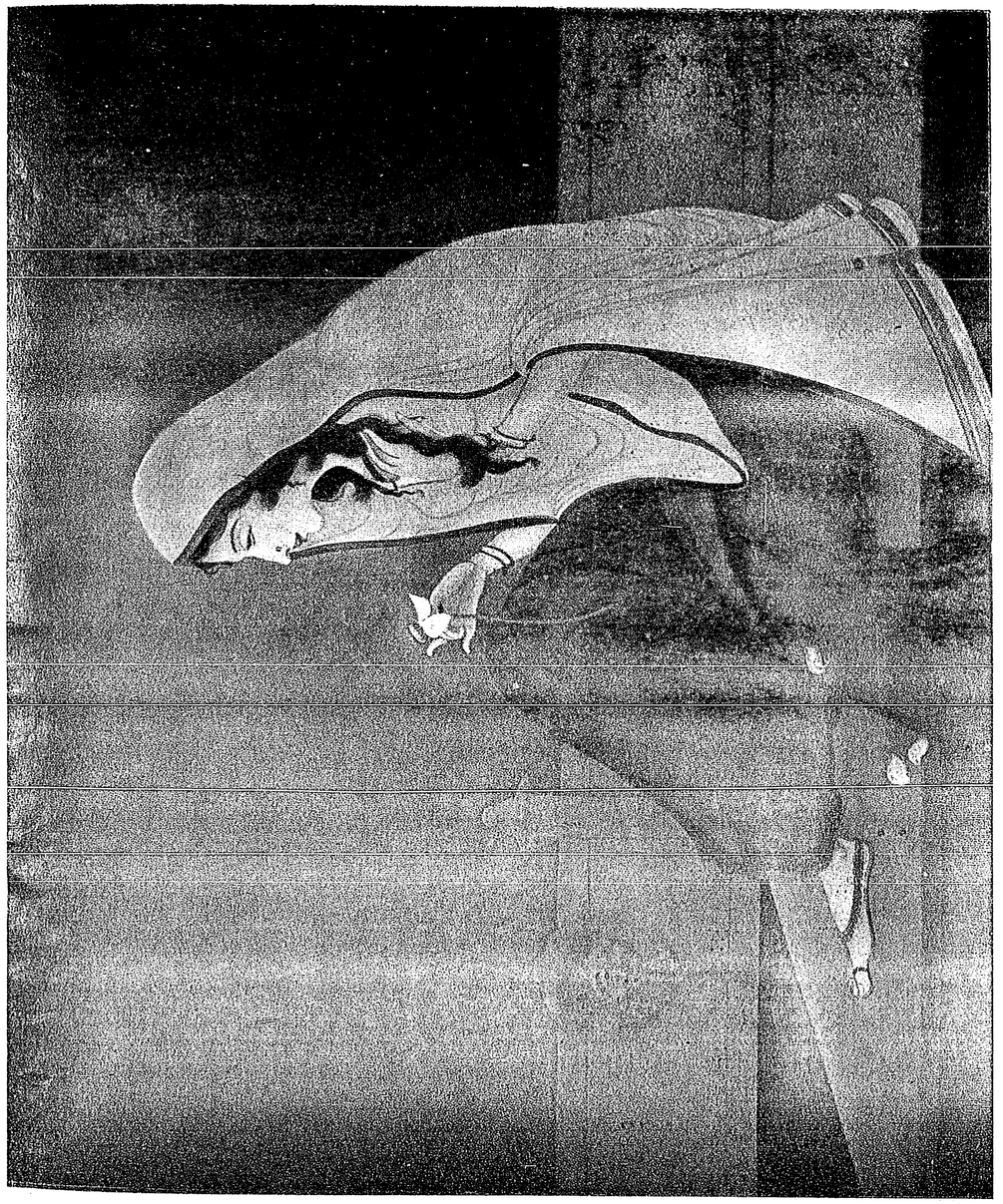

ঝরা ফুলের কাহিনী